Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাজালি: তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

(Imam Gazzali: His contribution to Tasauf)

এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Abstract

গবেষণার শিরোনাম (Title)

ইমাম গাজালি: তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

(Imam Gazzali: His contribution to Tasauf)

গবেষক

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫৩, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ(Abstract of the Thesis)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। এই মর্মে তিনি নিজেই বলেছেন- "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون"অর্থাৎ- "জ্বিন ও মানবজাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" ।আর এ ইবাদত সঠিক ও নির্ভুলভাবে পালন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন ।তাই যুগে যুগে মুসলিম মনীষীরা জ্ঞানের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান আবিষ্কারে যারপর নাই চেষ্টা করেছেন।

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় মুসলিম দর্শন বা ইসলামি চিন্তার জগতে যাঁরা অমর ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা ইমাম গাজালি অন্যতম।তিনি শুধু দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি দার্শনিক সূত্রগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তাইতো তিনি মুসলিম দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জনক বা "Founder of Muslim Philosophy."তিনি মুসলিম দর্শনের যুগস্রষ্টা। অনেক মুসলিম দার্শনিক যখন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে সরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ত্রাণকর্তার ভুমিকা পালন করেন। তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে মুসলিম দর্শনের মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, কবি, সুফিসাধক ও সমাজ সংস্কারক। মেধা ও সাধনা, তত্ত্ব ও অনুশীলন, বিশ্বাস ও যুক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। জগতে অনেক মেধাবী মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা তাঁদের মেধার উপযুক্ত ব্যবহার করেন না, অথবা তাঁদের মেধা পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়না। ইমাম গাজালি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী এবং কঠোর অধ্যবসায়ীএবং তাঁর মেধা ও মননের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করেছিলেন সৎকাজে। এমন অনেক বিখ্যাত মানুষ জগতে আছেন যাঁরা অনেক মূল্যবান কথা বললেও নিজের জীবনে তা তিনি পালন করেন না কিন্তু ইমাম গাজালি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল উপদেশ দেননি; বরং নিজের জীবনে তা তিনি পালনও করেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন সত্য-সুন্দর-আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ইমানি শক্তিতে শক্তিমান একজন কামেল ব্যক্তি কিন্তু দার্শনিক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী এবং সংশয়বাদী। তাঁর মতে, মানবীয় জ্ঞানে সুনিশ্চিত সত্য লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষের রয়েছে সুনিশ্চিত সীমাবদ্ধতা। ইমাম গাজালির মতে,"একমাত্র প্রত্যাদেশই হচ্ছে যথার্থ বা সুনিশ্চিত জ্ঞান"। তাঁর দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান যখন বাইরের ও ভেতরের এক চরম দুর্যোগের সম্মুখীন সেই সময় 'হুজ্জাতুল ইসলাম' ইমাম গাজালির আবির্ভাব। একদিকে সমস্ত মুসলমানরা সমগ্র খ্রিস্টান জগতের সঙ্গে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত অন্যদিকে তারা বিভিন্ন মাজহাব, তরিকা, মতবাদ এবং গ্রিক দর্শনের মোকাবেলায় ব্যাপৃত। বিভিন্ন অভিনব মতবাদে টানাপোড়েনে যখন মুসলমানদের মানসলোক বহুধাবিদীর্ণ তখন ইমাম গাজালি মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের শান্তিচ্ছায়ায় আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাহান তথা সমগ্র দর্শন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ ইমাম গাজালির প্রকৃত নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাজালি। তবে তিনি মুসলিম দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ মহাত্মা ইমাম গাজালি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুফিবাদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিক্ষা যে কতখানি আবশ্যক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "احياء علوم الدين" (ইহ্ইয়াউ উলুম আদ্-দীন) গ্রন্থখানি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

তাসাউফ বা সুফিবাদ, তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং মুসলিম দর্শনে তিনি ছিলেন জ্ঞানের অতুল সমুদ্র। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করতেন। আর এ জন্যই তাঁকে "حجة الاسلام" (হুজ্জাতুল ইসলাম) বা ইসলামের অকাট্য দলিল বা প্রমাণ নামে অভিহিত করা হয়। এ মহামনীষী ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করলেও তাঁর আদর্শ আজও বিশ্বময় অনুস্মরণীয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন করে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করতে চান ইমাম গাজালি তাদের জন্য আদর্শ। সুস্থ ও সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সূফিতত্ত্বকে তিনি জটিলতার কঠিন আবরণ হতে এমন মুক্ত করেছেন যে, অতঃপর তাতে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও স্খলনের কারণ অনুসন্ধান করে তিনি সকলকে সততার পথে আহবান করেছেন। অন্ধ অনুকরণকে কখনো তিনি স্বীকৃতি দেননি। মোদ্দাকথা, মুসলমানদের নিদ্রিত অনুভূতিকে জাগ্রত করার মানসে তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন।বর্তমান যুগটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। সভ্যতার উন্নতি ও প্রাচুর্য একটি জাতিকে অনেক উঁচুতে স্থাপন করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও মুনলমানদের ক্রমবর্ধমান অনগ্রসরতার একটি মৌলিক কারণ এই যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সফল বিকাশ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে এ দেশের আলেম সমাজ ও শিক্ষিত জনেরাও সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামের প্রকৃত জীবন-দর্শন না জানার কারণে শিরক ও বিদ্আতে লিপ্ত আর ইমাম গাজালি অশিক্ষা, কু-শিক্ষা, কুফর, শিরক, বিদ্আত ও কু-সংস্কার মুক্তসমাজ গঠনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এ উদ্দেশ্যে তাসাউফ বা সূফিবাদে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। তাই এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে তাদেরকে শিরক ও বিদ্আত মুক্ত জীবনগঠন করে একজন আদর্শ মুমিনে পরিণত করার লক্ষ্যেই আলোচ্য শিরোনামে গবেষণাকর্মকরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।মহান আল্লাহ পাক আমাদের এ গবেষণাকর্মটি কবুল করুন,আমিন।

বিনীত,

গবেষক- মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র			ii
ঘোষণা পত্র			iii
শব্দ সংকেত			iv
আরবি প্রতি বর্ণায়ন			v
কৃতজ্ঞতা স্বীকার			vi-vii
ভূমিকা			viii-xi
চিত্রে ইমাম গাজালি			xii
প্রথম অধ্যায়	:	**ইমাম গাজালির পরিচয়**	
অনুচ্ছেদ-১	:	জন্ম ও বংশ পরিচয়	২
অনুচ্ছেদ-২	:	শিক্ষা-দীক্ষা	৩
অনুচ্ছেদ-৩	:	উচ্চ শিক্ষা	৫
অনুচ্ছেদ-৪	:	শিক্ষকতায় যোগদান	৭
অনুচ্ছেদ-৫	:	কর্মজীবন ও ওফাত	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**ইমাম গাজালির রচনা সম্ভার**	
অনুচ্ছেদ-১	:	ইমাম গাজালির রচনাবলি	১৪
অনুচ্ছেদ-২	:	বির্তকিত গ্রন্থাবলি	১৭
অনুচ্ছেদ-৩	:	গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন দিক	২০
অনুচ্ছেদ-৪	:	নীতি-দর্শনে এহয়াউল উলুম	২২
অনুচ্ছেদ-৫	:	এহয়াউল উলুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	২৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	**ইমাম গাজালির দার্শনিক মতবাদ**	
অনুচ্ছেদ-১	:	আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ	৪০
অনুচ্ছেদ-২	:	আল্লাহর একত্ব সম্পর্কিত মতবাদ	৪২
অনুচ্ছেদ-৩	:	আল্লাহর গুণ সম্পর্কিত মতবাদ	৪৫
অনুচ্ছেদ-৪	:	আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ	৫০
অনুচ্ছেদ-৫	:	জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদ	৭৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	**ইমাম গাজালির চিঠি-পত্র**	
অনুচ্ছেদ-১	:	রাজা-বাদশাহগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলি	৮০
অনুচ্ছেদ-২	:	উজির বা মন্ত্রিগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলি	৯৯
অনুচ্ছেদ-৩	:	সরকারি কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলি	১৩৩
অনুচ্ছেদ-৪	:	ইমামগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলি	১৪৭
অনুচ্ছেদ-৫	:	আলেমগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলি	১৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	**তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান**	
অনুচ্ছেদ-১	:	তাসাউফের পরিচয়	১৬১
অনুচ্ছেদ-২	:	তাসাউফের স্বরূপ ও প্রকৃতি	১৬৩
অনুচ্ছেদ-৩	:	তাসাউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৭০
অনুচ্ছেদ-৪	:	তাসাউফের প্রমাণ/দলিল	১৮৫
অনুচ্ছেদ-৫	:	তাসাউফ শাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান	১৮৮
উপসংহার	:		২০৪
গ্রন্থপঞ্জী	:		২০৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম. ফিল. গবেষক মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১৫৩, শিক্ষাবর্ষঃ (২০১৬-১৭) কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"ইমাম গাজালিঃ তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান"** (Imam Gazzali: His contribution to Tasauf) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, এতে কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোনো ভাষাতেই এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

.....

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ
তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ইমাম গাজালিঃ তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান"** (Imam Gazzali: His contribution to Tasauf) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। এতে কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম. ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য প্রদান করা হয়নি।

.....

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫৩
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	আলাইহিস সালাম
রা.	=	রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু
র.	=	রহমতুল্লাহি আলাইহি
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
হি.	=	হিজরি
ড.	=	ডক্টর
মু.	=	মুহাম্মদ
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
অনূ.	=	অনূদিত
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
ই.ফা.বা.	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বি. দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য
N.D.	=	No Dated
Ed.	=	Edited/Editor
N.B.	=	Note Bene
P.	=	Page
Pp.	=	Double Page
Chap.	=	Chapter
Ibid.	=	Ibidem
Op.cit.	=	Open cito
PT.	=	Part
Vol.	=	Volume
Trans.	=	Translated
Dr.	=	Doctor

Dhaka University Institutional Repository

আরবি প্রতিবর্ণায়ন

ا – অ	ش – শ	و – ও, ব	اي – ঈ, য়ী	ي – য়ু
ب – ব	ص – স	ه – হ	ا – উ	يو – ইউ
ت – ত	ض – দ, য	ء – -,	او – ঊ	ع – ‘আ
ث – স/ছ	ط– ত	ي – য়	و – ওয়া	عا – ‘আ
ج – জ	ظ– য	ا – া, আ	وا – ওয়া	ع – ‘ই
ح – হ	ع– -‘	ا – ি, ই	و – বি, ভি	عي – ‘ঈ
خ – খ	غ– গ	او – ু, উ	وي – বী, ভী	ع – ‘উ
د – দ	ف – ফ	اي – ূ, ঊ	و – উ	عو – ‘ঊ
ذ – য	ق – ক	ا – ী, ঈ	وو – ঊ	
ر – র	ل – ল	ا – অ	ي – য়্যা	
ز – য	م – ম	ا – আ	يا – ইয়্যা	
س – স	ن – ন	ا – ই	بي – য়ী	

উপরিউক্ত পদ্ধতি অনূসৃত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর ع(আইন) হলে সেখানে আ’ স্থলে আ, উ’ স্থলে উ, ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব আরবি শব্দ দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে সে গুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহে **"ইমাম গাজালিঃ তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁর অবদান** "শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর করুণাপূর্ণ দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অসংখ্য সালাত ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর। রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ এবং আসহাবের প্রতি।

এ মুহূর্তে শ্রদ্ধাভরা হৃদয়ে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং আমার এ গবেষণাকর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারকে। তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান আমার এ গবেষণাকর্মটি সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য তাঁর কাছে আমি আজীবন ঋণী। আমার এ গবেষণাকর্মটি সফলভবে সুসম্পন্ন করতে তিনি আমাকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বিন্যস্তকরণ এবং গবেষণাকর্মটির সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সরাসরি নিরলস সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আরও স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারকে যিনি এ অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙখরূপে সংশোধন করে দিয়েছেন এবং সার্বিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার প্রাণ প্রিয় শাইখ ও মুর্শিদ, পীরে কামেল আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেব প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা তথা শ্রদ্ধেয় বড় হুজুরকে, জনাব মাওলানা আব্দুস সোবহান ও জনাব নজরুল ইসলামসহ সকল শিক্ষক ও বড় ভাইদেরকে যাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সহযোগিতায় জীবনে এতদূর আসতে পেরেছি।

এ মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ঢাকার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন, উপাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সকল শিক্ষক এবং বড় ভাইদের কথা যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে উচ্চশিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে এ পর্যন্ত আসার সুযোগ করে দিয়েছে। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতি। বিশেষভাবে যাঁরা আমাকে এ গবেষণা কর্মে মূল্যবান পরামর্শ তথ্য দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঐ সকল সম্মানিত স্যারদের প্রতি যাঁরা আমাকে এম.ফিল. কোর্সে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে কোর্স ও বিষয় নির্ধারণসহ বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমার চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন।

আমার শিক্ষা, গবেষণা ও আমার জীবনের সকল কল্যাণের মূল উৎস আমার মা-বাবা। তাঁদের নেক দু'আ ও অনুপ্রেরণা এবং আমার জীবন গঠনে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। আমার জীবনের সবটুকু কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য। সাথে সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার মুহতারাম নানা শ্বশুর বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি। তাঁদের দু'আ আমার চলার পথের সাথী ছিল। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি তাঁদের সকলকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষকবৃন্দ ও সকল শাখার সকল শিক্ষকগণের প্রতি যাঁরা বিভিন্ন সময় নানাভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ করে ইংলিশ ভার্সনের জনাব আতাউর রহমান সায়েম ও বনশ্রী শাখার জনাব বিল্লাল হোসেন স্যারকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি যাঁদের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত ও বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে নানানভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তা'লা তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

Dhaka University Institutional Repository

আমি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাদেক, তামান্না ও নেয়ামত উল্লার প্রতি। যারা বিভিন্ন উৎস থেকে বই-পুস্তক, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দেয়া থেকে শুরু করে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং সাহস ও উৎসাহ যোগিয়েছে। বিশেষ করে আমার শ্যালিকা তামান্নার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে আমার গবেষণা সম্পৃক্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে দেয়াতে আমার এ গবেষণা কর্মটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকেও উত্তম পুরস্কার দান করুন ।

আমি এ পর্যায়ে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার চাচাত ভাই সৃজন, মেহেদি হাসান সঞ্চয়, বোন আছিয়া আক্তার লিপ্তা ও তার স্বামী মাযহারুল ইসলামের প্রতি। যারা এ গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অনেক পরামর্শ ও বই-পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে আমার চাচাত বোন আছিয়া আক্তার লিপ্তার অবদানের কথা এ মুহূর্তে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। যে আমার এম. ফিল. কোর্সে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত নানানভাবে শুধু উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং সংসারের নানা ব্যস্ততা কাটিয়ে আমার সাথে তত্ত্বাবধায়ক স্যারের বাসায় গিয়ে, রেজিস্টার বিল্ডিংয়ে যোগাযোগ করে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও কলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ থেকে থিসিসের নমুনা কপি সংগ্রহ করে দিয়ে যার পর নাই উপকার করেছে। তার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমি হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-ভালভাসা জ্ঞাপন করছি আমার বড়ছেলে তাশাহুদ সিদ্দিক সাদ, মেয়ে সাদিয়া সিদ্দিকা ও সাবিহা সিদ্দিকার প্রতি যারা অনেক ছোট ছোট কাজ করে দিয়ে, গবেষণাকর্ম লেখার সময় আমাকে বিরক্ত না করে বরং নানানভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আল্লাহ তাদের সকলকে নেক হায়াত দান করুন। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমার একান্ত সহধর্মিনী প্রিয়তমা উম্মে সালমাকে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে সে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে। একাজ করতে যেয়ে সে আমাকে শুধু সাংসারিক দায়ভার থেকেই মুক্ত রাখেনি বরং বিভিন্ন সোর্স থেকে বই-পুস্তক সংগ্রহ করাসহ নেটজগৎ থেকে তথ্য-উপাত্ত এনে নিজে তা টাইপ করে দিয়ে এ গবেষণাকর্মটিকে নানানভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আমি তার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমি আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরির সহযোগিতা পেয়েছি এবং ব্যবহার করেছি। বিশেষ করে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাইতুল মোকাররমের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এসবই ইলমে তাসাউফ তথা ইমাম গাজালি সংক্রান্ত বই-পুস্তকে সমৃদ্ধ যা এ গবেষণায় বেশ কাজে এসেছে। এসব লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সকল অগ্রজ, অনুজ বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী বিশেষ করে জনাব খালেকুজ্জামান, আতাউর রহমান সায়েম, বেলাল আহমেদ খান, পান্না মিয়া, হাসান ও উম্মে সালমা (যারা আমার এ গবেষনাকর্মে কম্পিউটারের কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন) সহ সকল সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন, স্নেহাস্পদ এবং সুধীজনের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিনীত–
মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা:-

الحمد لله رب العالمين- الذي علم الانسان ما لم يعلم باليقين –والصلاة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين- الذي حرثنا بقوله المباركة" العلماء ورثة الانبياء"و"من يريدالله به خيرايتفقه في الدين"- وعلي اله واصحابه اجمعين- الذين وقفوا حياتهم لحصول علوم الدين –اما بعد :

মহান আল্লাহ তা'য়ালা জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। এই মর্মে তিনি নিজেই বলেছেন- "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" অর্থাৎ- "জ্বিন ও মানব জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য"। আর এ ইবাদত সঠিক ও নির্ভুলভাবে পালন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে মুসলিম মণীষীরা জ্ঞানের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান আবিষ্কারে যারপর নাই চেষ্টা করেছেন।

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় মুসলিম দর্শন বা ইসলামি চিন্তার জগতে যাঁরা অমর ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা ইমাম গাজালি অন্যতম। তিনি শুধু দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি দার্শনিক সূত্রগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি মুসলিম দর্শনের যুগ স্রষ্টা। অনেক মুসলিম দার্শনিক যখন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে সরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি ত্রাণকর্তার ভুমিকা পালন করেন। তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে মুসলিম দর্শনের মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

"তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, কবি, সুফিসাধক ও সমাজ সংস্কারক। মেধা ও সাধনা, তত্ত্ব ও অনুশীলন, বিশ্বাস ও যুক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। জগতে অনেক মেধাবী মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁরা তাঁদের মেধার উপযুক্ত ব্যবহার করেন না, অথবা তাঁদের মেধা পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় না। ইমাম গাজালি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী এবং কঠোর অধ্যবসায়ী এবং তাঁর মেধা ও মননের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করেছিলেন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কারে। এমন অনেক বিখ্যাত মানুষ জগতে আছেন যাঁরা অনেক মূল্যবান কথা বললেও ব্যক্তিগত জীবনে তা পালন করেন না। কিন্তু ইমাম গাজালি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল উপদেশ দেননি; বরং নিজের জীবনে তা পালনও করেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন সত্য-সুন্দর-আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ইমানি শক্তিতে শক্তিমান একজন কামেল ব্যক্তি কিন্তু দার্শনিক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী এবং সংশয়বাদী। তাঁর মতে, মানবীয় জ্ঞানে সুনিশ্চিত সত্য লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষের রয়েছে নিশ্চিত সীমাবদ্ধতা। ইমাম গাজালির মতে, "একমাত্র প্রত্যাদেশই হচ্ছে যথার্থ বা নিশ্চিত জ্ঞান।" তাঁর দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহান যখন বাইরের ও ভেতরের এক চরম দুর্যোগের সম্মুখীন সেই সময় 'হুজ্জাতুল ইসলাম' ইমাম গাজালির আবির্ভাব। একদিকে সমস্ত মুসলিমরা সমগ্র খ্রিস্টান জগতের সঙ্গে ক্রুসেড তথা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত অন্যদিকে তারা বিভিন্ন মাজহাব, তরিকা, মতবাদ এবং গ্রিক দর্শনের মোকাবেলায় ব্যাপৃত। বিভিন্ন অভিনব মতবাদে টানাপোড়েনে যখন মুসলমানদের মানসলোক বহুধাবিভক্ত তখন ইমাম গাজালি মুসলমানদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের শান্তিচ্ছায়ায় আহবান জানান।

মুসলিম জাহান তথা সমগ্র দর্শন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ ইমাম গাজালির প্রকৃত নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাজালি। তবে তিনি মুসলিম দার্শনিক ও ইসলামি চিন্তাবিদ মহাত্মা ইমাম গাজালি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুফিবাদের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিক্ষা যে কতখানি আবশ্যক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "احياء علوم الدين" (ইহ্ইয়াউ উলুম আদ্-দীন) গ্রন্থখানি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

তাসাউফ তথা সুফিবাদ, তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা এবং মুসলিম দর্শনে তিনি ছিলেন জ্ঞানের অতুল সমুদ্র। প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করতেন। আর এ জন্যই তাঁকে - "حجة الاسلام" (হুজ্জাতুল ইসলাম) বা ইসলামের অকাট্য দলিল বা প্রমাণ নামে অভিহিত করা হয়। এ মহামনীষী ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করলেও তাঁর আদর্শ আজও বিশ্বময় অনুস্মরণীয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন করে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করতে চান ইমাম গাজালি তাদের জন্য আদর্শ।

সুস্থ ও সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সূফিতত্ত্বকে তিনি জটিলতার কঠিন আবরণ হতে এমন মুক্ত করেছেন যে, অতঃপর তাতে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও স্খলনের কারণ অনুসন্ধান করে তিনি সকলকে সততার পথে আহবান করেছেন। অন্ধ অনুকরণকে কখনো তিনি স্বীকৃতি দেননি। মোদ্দাকথা, মুসলমানদের নিদ্রিত অনুভূতিকে জাগ্রত করার মানসে তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন।

বর্তমান যুগটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। সভ্যতার উন্নতি ও প্রাচুর্য একটি জাতিকে অনেক উঁচুতে স্থাপন করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ও মুনলমানদের ক্রমবর্ধমান অনগ্রসরতার একটি মৌলিক কারণ এই যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সফল বিকাশ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে এ দেশের আলেম সমাজ ও শিক্ষিত জনেরা ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামের প্রকৃত জীবন-দর্শন না জানার কারণে শিরক ও বিদ্আতে লিপ্ত আর ইমাম গাজালি অশিক্ষা, কু-শিক্ষা, কুফর, শিরক, বিদ্আত ও কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এ উদ্দেশ্যে তাসাউফ বা সূফিবাদে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। তাই এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে তাদেরকে শিরক ও বিদআতমুক্ত জীবন গঠন করে একজন আদর্শ মুমিনে পরিণত করার লক্ষ্যেই আলোচ্য শিরোনামে গবেষণাকর্ম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণাকর্মটিতে একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায়, কয়েকটি অনুচ্ছেদ ও একটি উপসংহার সংযুক্ত করেছি এবং পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে তথ্যসূত্র ও ফুটনোটের উদ্বৃতিতে সংশ্লিষ্ট লেখকের ও বইয়ের বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

থিসিসে আলোচনার পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত দুষণীয়, একথা জানা সত্ত্বেও আলোচনার ধারাবাহিকতা ও যথার্থতা বজায় রাখার স্বার্থে কখনও এমন ধরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন হয়েছে- একথা অকপটে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অযোগ্যতা ও দুর্বলতার ভিতর দিয়ে মহান আল্লাহ এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার তাওফীক দিয়েছেন এজন্য তাঁর মহান দরবারে আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর এ আবেদন পেশ করছি, তিনি যেনো সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এ গবেষণাকর্মটিকে কবুল করে নেন।

-আমীন

বিনীত–
মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রে ইমাম গাজালি

(১০৫৮-১১১১ খ্রিস্টাব্দ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
অনুচ্ছেদ-১

জন্ম ও বংশ পরিচয়

খোরাসান প্রদেশের তুস জেলায় তাহেরান ও তাওকান নামক দুটি শহর রয়েছে।[১] ইমাম গাজালি ৪৫০ হিজরি সনে তাহেরান শহরে জন্মলাভ করেন। তার পিতা পেশায় ছিলেন তাঁত ব্যবসায়ী। ইমাম গাজালি (রহ:)-র প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ। হুজ্জাতুল ইসলাম তাঁর উপাধী। তবে গাজালি নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পেশার সাথে সম্পর্কিত করে তাদের পরিবারকে গাজালি বলা হয়। আরবি ভাষায় গাজাল শব্দের অর্থ তাঁত বুনন করা। আল্লামা সায়মানীর[২] মতে আরবি ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে তাঁকে গাজ্জালি বলাই সংগত ছিল। যেমন আত্তারী ও আল্লামা[৩] শব্দের অনুরূপ।

তিনি তাঁর রচিত 'কিতাবুল আনসাব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তূস অঞ্চলে গাজালা নামক একটি গ্রাম ছিল। ইমাম গাজালি সেই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মতে শব্দটি গাজালি হবে, গাজ্জালি নয়।[৪] ইবনে খাল্লিকান আল্লামা সায়মানীর উক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেন, ঐতিহাসিকদের মতামত সাপেক্ষে আল্লামা সায়মানীর তথ্যটি নির্ভুল বলা যায় না। ইমাম গাজালির সহোদর আহমদ গাজালির জীবিতাবস্থায় ইবনে খাল্লিকান এই মত পোষণ করেন। তখন তার পক্ষ থেকে এর কোনরূপ প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়নি। কয়েকজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদিও আল্লামা সায়মানীর মত অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দিহান যে, শব্দটি গাজালিই হবে, গাজ্জালি নয়। কেননা, খোরাসানের তূস প্রদেশে গাজ্জালা নামক কোন গ্রামের অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ইমাম গাজালির পিতার নাম মোহাম্মদ, প্রপিতার নাম মোহাম্মদ এবং প্রপিতামহের নাম আহমদ। তাঁর বংশীয় পেশার ক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন মুসলিম সমাজে বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জ্ঞানচ্যুত হওয়ার সুযোগ ছিল না। সাধারণ পেশার অধিকারী মানুষের মাঝ থেকে এমন অনেক মহান ও খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন, যাদের একনিষ্ঠ জ্ঞান-চর্চার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ বিপুলভাবে সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইতিহাস তাদের অভিষিক্ত করেছে 'ইমাম' 'আল্লামা' ইত্যাদি উপাধিতে।[৫] ইমাম আবু হানিফা ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। শামছুল আয়িম্মা সারাখসী মিষ্টি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করতেন। সুতরাং, তৎকালে বুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে নিম্ন পেশার প্রতি আলেম-উলামা ও জ্ঞানী সমাজের কোন প্রকার ঘৃণা তো ছিলই না, এ পেশার ব্যক্তিদের শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামিতার ফলে বরং তাদের পেশা লাভ করত ভিন্ন এক সমাদর ও সম্মান। এমনকি, মানুষ তাদের পেশা গ্রহণ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করত। মোদ্দাকথা, এ যুগে ইমাম গাজালির পারিবারিক পেশা যতটা অভিনবত্ব

১. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল: *ইমাম গাযযালী (রহ.) জীবন চরিত*, (ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর-২০০৬),পৃ.৯
২. আল্লামা সায়মানী একজন জীবনীকার যিনি বংশনামা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।
৩. আল্লামা'ইসমে ফায়েল মুবালাগা,যা আধিক্যের অর্থ প্রদান করে অনুরূপ 'গাজ্জালি' শব্দটিও আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
৪. https://www.britannica.com › ... › *Historical Places*
৫. Frank Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, p. 62.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আলোচিত হয়, তা তৎকালীন সময়ে ছিল না। বরং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে খ্যাতিমান অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিত্বের অনুরূপ ধারণাই তার ক্ষেত্রে পোষণ করা হতো।[৬]

গাজালি বলার কারণঃ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তাঁর নাম করণের যে সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

১. আরবি (غزل) গাজাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সূতাকাটা। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন-

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا

অর্থঃ "তোমরা ঐ মহিলার মত হয়োনা,যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে"[৭]। আর ইমাম গাজালির পূর্বপুরুষেরা যেহেতু সুতা বা তাতেঁর ব্যবসায় করতেন তাই তাঁকে গাজালি বলা হতো।

২. তিনি গাজালা নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেন বলে তাকে গাজালি বলা হয়।

৩. আরবি গাজাল(غزال)শব্দের অর্থ হচেছ-হরিণ শাবক। কেউ কেউ মনে করেন ছোট বেলায় তিনি হরিণ শাবকের মত সুন্দর ও ছটফটে ছিলেন বলে তাকে গাজালি বলা হতো।

৪. আরবি غزل(গজল) শব্দের অর্থ হচ্ছে গান বা সংগীত। কথিত আছে, ছোট বেলা থেকেই তিনি সংগীতে বা গানে পারদর্শী ছিলেন বিধায় তাকে গাজালি বলা হতো। মোদ্দাকথা হচ্ছে, গাজালি তাঁর উপাধি ,আসল নাম নয়। কিন্তু এ নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ।

গাজ্জালি না গাজালিঃ তাঁর প্রকৃত নাম গাজালি, গাজ্জালি নয়। যেমন তিনি বলেন- من قال لي غَزَّالِي فقد سَبَّنِي [৮] কিন্তু তাঁর জীবনীকারগণ বর্ণনার বিভিন্ন সূত্রে তাকে গাজালি না বলে বরং গাজ্জালি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অমরা উক্ত থিসিসের রেফারেন্সে বর্ণনার সুবিধার্থে তাঁকে গাজ্জালি না বলে তাঁর বহুল প্রচলিত এবং তাঁর নিজের স্বীকৃত গাজালি নামটিই গ্রহণ করেছি।

অনুচ্ছেদ-২

শিক্ষা দীক্ষা

ইমাম গাজালির আব্বা কোনো কারণ বশতঃ, শাস্ত্রীয় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অশিক্ষার মনোকষ্টে তিনি আজীবন ভুগেছেন। মৃত্যুকালে তার দুই ছেলে মোহাম্মদ গাজালি ও আহমদ গাজালিকে এক ঘনিষ্ট বন্ধুর হাতে সোপর্দ করে দুঃখ ও অনুতাপের সাথে তাকে বলেছিলেন, "শিক্ষা-দীক্ষা ও পড়াশোনার সৌভাগ্য লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এখন ছেলেদের শিক্ষিত করে তোলাই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা। তাদের শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলে আমার অশিক্ষার ক্ষতিপূরণ করতে চাই"- এই বলে তিনি ছেলেদের শিক্ষার ভার বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।[৯]

পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বয় সেই সূফী বন্ধুর একান্ত তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু স্বল্পসময়ে পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ পড়াশোনা বাবদ ফুরিয়ে যায়। পিতার বন্ধু স্ব-উদ্যোগে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের বলে দিলেন, তোমাদের পিতা যে সম্পদ রেখে গেছেন, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের পড়াশোনা

৬. আল্লামা শিবলী নোমানী: *গাজালির জীবন ও দর্শন* (ঢাকা: কোহীনূর লাইব্রেরী ,পরিবর্তিত সংস্করণ-২০১২),পৃ.১২

৭. আল কুরআন: ১৬: ৯২

৮. ইমাম আয-যাহাবি: সিয়ারু আলামিন নুবালা (কাহেরা: দারুল হাদিস, খ. ১৪, পৃ. ২৭৮)

৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত রাখার সংগতি আমার নেই। সুতরাং, তোমরা কোন মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যাও।[১০] ইমাম গাজালি (রহঃ) তাই করলেন। সে সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষালাভ করা ছিল যদিও দুর্লভ; কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিদ্যালয় চালু ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও আলেমগণ নিজ নিজ বাসস্থানে, কিংবা মসজিদে দরস দানের ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষানুরাগীদের ব্যয়ভার বহন করতেন নগরের নেতৃস্থানীয় আমীর ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ। এ ব্যবস্থার ফলে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন কাউকে উচ্চশিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকতে হত না। বর্তমান যুগে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার যদিও ব্যাপক; কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের কারণে সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষে উচ্চশিক্ষা অর্জন সম্ভব হয়ে উঠে না।[১১] ইমাম গাজালি ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ লাভ করেন আহমদ বিন মোহাম্মদ রাকানীর নিকট। একই শহরে ছিল তাদের উভয়ের বসবাস। তার একান্ত সান্নিধ্যে পাঠ সমাপ্ত করার পর তিনি 'জুরজান' নামক প্রসিদ্ধ শহরে গমনের ইচ্ছা করেন এবং তথায় উপস্থিত হয়ে ইমাম আবু নসর ইসমাঈলের নিকট শিক্ষা লাভে ব্যাপৃত হন। তৎকালীন যুগে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল, শিক্ষকগণ ছাত্রদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করতেন, এবং সমবেত ছাত্ররা তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। শিক্ষকদের এ জাতীয় আলোচনার লিখিত সংরক্ষণকে বলা হত তালিকাত'। শিক্ষানবিশ ইমাম গাজালি তার ছাত্র জীবনে তালিকাতের একটি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন।[১২]

ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত ও শিক্ষালাভ

জুরজান শহরে দীর্ঘদিন অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে মনস্থ হলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে ডাকাতের হাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন। লুণ্ঠিত মালপত্রের মাঝে তার বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল সেই তালিকাতগুলোও ছিল। এগুলো হাতছাড়া হওয়ার ফলে তিনি বিচলিত হয়ে তা ফিরে পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পরে ডাকাত সরদারকে তিনি অনুনয় করে বললেন, অন্যান্য আসবাবের প্রয়োজন আমার নেই, কেবল আমার হাতেলেখা পান্ডুলিপিগুলো দয়া করে ফিরিয়ে দিন। এগুলো আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফসল।

ডাকাত সরদার তার আকুতি দেখে অট্টহাস্য করে উঠল, কটাক্ষ করে তাকে বলল, কেমন পড়াশোনা করলে তুমি! তোমার পাণ্ডিত্বের দৌড় দেখছি সব খাতার পাতায়। খাতা নেই তো তোমার ইলমও নেই। তুমি তখন নিরেট মূর্খ। এই বলে সে পাণ্ডুলিপিগুলো ফিরিয়ে দিল। ডাকাত সরদারের মুখে এমন অভিনব মন্তব্য শুনে ইমাম গাজালি লজ্জিত-বিহবল হয়ে পড়লেন। সাধারণ এক অশিক্ষিত লোকের কথা তার ভবিষ্যত জীবনে যাদুমন্ত্রের মত ক্রিয়া করেছিল। তার মনে হল, এটা গায়েব প্রদত্ত এক নির্দেশ। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তালিকাতগুলো আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। এর পিছনে তিনি ব্যয় করেছিলেন ক্রমাগত তিন বছরের অবিশ্রাম শ্রম।[১৩]

---

১০. তাজুদ্দিন ইবন আলী,*তুবাকাতুশ শাফিয়াহ আল-কুবরা*(হাজার,২য় প্রকাশ,১৪১৩হি.)খ:৬,পৃ:১৯৩-১৯৪।

১১. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রাগুক্ত-পৃ.৩০

১২. প্রাগুক্ত

১৩. সাম'আনী.আবদুল করিম বিন মুহাম্মদ, *আল-আনসাব* (বৈরুত: দারুল জিনান,প্রথম প্রকাশ.১১৪০৮হি.) খ:৪, পৃ.২৯০

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৩

উচ্চ শিক্ষা-লাভে নিশাপুর গমন ও ইমামুল হারামাইনের সান্নিধ্য লাভ

জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক স্তরগুলো অতিক্রমের পর ইমাম গাজালি এমন অবস্থানে উপনীত হলেন যে, সাধারণ শিক্ষিত আলেমদের সাহচর্যে তার জ্ঞানের পিপাসা মিটছিল না। সুতরাং, উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় তিনি পুনরায় দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তৎকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে যদিও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, নতুন নতুন উদ্ভাবিত শাস্ত্র ও কলাকৌশল ব্যাপকভাবে চর্চিত ও সমাদৃত হচ্ছিল; শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে পণ্ডিতবর্গ অবস্থান করে জ্ঞান প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন; স্থানে স্থানে যদিও শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠছিল; কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্ররূপে যে দুটি শহর ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তা হল নিশাপুর ও বাগদাদ। খোরাসান, ইরান ও পারস্য- ইত্যাদি বিস্তির্ণ অঞ্চলজুড়ে দুজন স্বনামধন্য ও ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইন ও আল্লামা ইসহাক সিরাজী বিশিষ্ট আলেম সমাজ ও আপামর সাধারণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করে আসছিলেন। বাগদাদের নিশাপুর ছিল তাদের জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রস্থল। নিশাপুর ইমাম গাজালির জন্য ছিল অপেক্ষাকৃত নিকটতর। সুতরাং, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তিনি নিশাপুর গমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। অবশেষে অনেক প্রতিকুলতা অতিক্রম করে ইমামুল হারামাইনের সান্নিধ্যে গমন করে উচ্চতর শিক্ষা লাভে নিমগ্ন হন।[১৪]

নিশাপুর শহরেই ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। মাদরাসায়ে বাইহাকিয়া নামক এই শিক্ষাকেন্দ্রেই ইমামুল হারামাইন শিক্ষালাভ করেন। ইবনে খাল্লিকানসহ অনেক তত্ত্ববিশারদ মনে করেন যে, বাগদাদের মাদরাসায়ে নেযামিয়া ইসলামের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু যথেষ্ট তত্ত্বানুসন্ধানের পর এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, বাগদাদ নয়, নিশাপুরই এই গৌরবের অধিকারী। মাদরাসায়ে নিযামিয়ার যখন অস্তিত্বই হয় নি, তখনো নিশাপুরে বড় বড় প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদরাসার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। উল্লেখিত বাইহাকিয়া মাদরাসা ব্যতীত মাদরাসায়ে সাদিয়া নাসরিয়া- যা সুলতান মাহমুদের ভাই নসর বিন সবুক্তগীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অন্যান্য অসংখ্য মাদরাসার উল্লেখ বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে। এ জাতীয় দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র দ্বারা ইসলামী ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছে নিশাপুর শহর। ইমামুল হারামাইনের প্রকৃত নাম আব্দুল মালেক। উপাধী জিয়াউদ্দীন। শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক অধ্যয়ন নিজ পিতার নিকটই সমাপ্ত করেন তিনি। পিতার ইন্তিকালের পর মাদরাসায়ে বাইহাকিয়ার প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম আসকানীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের তীর্থস্থান বাগদাদ শহরে গমন করেন, এবং বিখ্যাত ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে ইলমের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন সফলতার সাথে। দীর্ঘদিন বাগদাদ অবস্থান করে নিশাপুর ফিরে এসে তিনি দরস দান শুরু করেন।[১৫] তবে, এখানে বেশি দিন অবস্থান তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মন্ত্রী উমীদ কান্দারীর প্ররোচনায় বাদশাহ্ আলেপ আরসালানের পক্ষ থেকে এই ফরমান জারী হল যে, এখন থেকে মসজিদে-মসজিদে ইমাম আবুল হাসান আশআরীর নামে অভিশাপ বর্ষণ করতে হবে। ইমামুল হারামাইন যেহেতু আশআরী মতের অনুসারী ছিলেন, তাই এরূপ হঠকারিতা তার মনঃপুত হল না।[১৬] তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে মক্কা-মদীনায়

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২
১৬. সালেহ আহমেদ শামী,*ইমাম গাজালী*(দামেস্ক:দারুল কলম,প্রথম প্রকাশ,১৪১৩হি.),পৃ.৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চলে এলেন। মক্কা-মদীনার অধিবাসীগণ তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। সবিশেষ মর্যাদায় তিনি সেখানে বরিত হন। তার দরস সাধারণ থেকে বিশিষ্ট সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ, তার প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী মক্কা মদীনার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেওয়া হত। এ কারণেই তিনি ইমামুল হারামাইন[১৭] নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এ দিকে আলেপ আরসালানের রাজদরবারে নেযামুল মুলককে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ দেয়া হয়। নেযামুল মুলক একদিকে যেমন উদারতা, বদান্যতা, ও সহনশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, অপরদিকে তার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজ্ঞা, সাধারণের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসা, এবং চিরায়ত সুশীল চারিত্রিক মনোবৃত্তির কথা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে লাভ করেছিল প্রবাদতুল্য মর্যাদা। ইমামুল হারামাইন এরূপ সদগুণের কথা বিবেচনা করে নিশাপুরে প্রত্যাবর্তনে মনস্থ হলেন। তার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে নেযামুল মুলক নিশাপুরে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাদরাসায়ে নেযামিয়া নামক সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বীন প্রসারের ভূমিকায় ইসলামী ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

রাজ দরবারে ইমামুল হারামাইন ছিলেন বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। ধর্মীয় পদগুলো মূলতঃ তার নির্দেশনায় পরিচালিত হত। ইমাম-খতীব নিয়োগসহ যাবতীয় নিয়োগ ছিল তার তত্ত্বাবধানে। সমকালীন রাজন্যবর্গের নিকট তিনি বিশেষ সমাদরের পাত্র ছিলেন। তার মতের বিরোধিতা করবে, এমন দুঃসাহস তাদের ছিল না। একবার তিনি মালিক শাহ্ সেলজুকীর প্রচারিত বিশেষ ফরমানের কঠোর বিরোধিতা করে "বাদশাহর এমন গর্হিত হুকুম জারির কোন অধিকার নেই"- মর্মে তাকে হুশিয়ার করে দেন। মালিক শাহ সেলজুকী এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে বিরোধিতা করার পরিবর্তে ফরমানটি প্রত্যাহার করে তার মতামত মেনে নেন দ্বিধাহীনভাবে। দ্বীনের মৌলিক বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থ প্রনয়নে তার ভূমিকা গুণী মহলে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল। 'নি'হায়াতুত তালাব' 'শামিলে বারাহীন' 'ইরশাদুল মুগীসিল হক্ব' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১৮]

ইমাম গাজালি তার দরগাহে উপস্থিত হয়ে গভীর অভিনিবেশ ও একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন। প্রখর মেধা ও অতুলনীয় মনোসংযোগের ফলে স্বল্প সময়ের মাঝে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভে সক্ষম হন। উপস্থিত শিক্ষানবিশদের মাঝে বিশেষ ছাত্র হিসেবে ইমামুল হারামাইনের নিকট তার ভিন্ন সমাদর ছিল। ইমামুল হারামাইনের দরগাহে চার শতাধিক ছত্রের বৃহৎ সমাবেশ হত। তন্মধ্যে কায়া হারেসী, আহমদ ইবনে মোহাম্মদ খানী ও ইমাম গাজালি ছিলেন অন্যতম মেধাবী, শ্রেষ্ঠতম ছাত্র। কিন্তু অপর দু'জন ছাত্রাবস্থায়ই তার সমকক্ষতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যথায়, ইমাম গাজালি পরবর্তী জীবনে যেরূপ পান্ডিত্ত ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তা স্বয়ং ইমামুল হারামাইনের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।[১৯]

১৭. দুই পবিত্র মসজিদ,যা মক্কা-মদিনায় অবস্থিত।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

১৯. সাম'আনী.আবদুল করিম বিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত-খ:৪,পৃ.২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৪

সহকারী শিক্ষকরূপে যোগদান ও ইমামুল হারামাইনের ইন্তিকাল

তৎকালে বড় বড় জ্ঞানী ও আলেমদের দরগাহে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, দরসে সম্ভাবনাময় ও মেধাবী একজন ছাত্র নির্বাচন করা হত, যার দায়িত্ব হত শিক্ষকের দরস সমাপ্তির পর পূণরায় দরস দান করা। এ নিয়মের প্রচলন ছিল, যাতে শিক্ষকের বর্ণনা, আলোচনা ও পর্যালোচনা সকলের বোধগম্যরূপে বিশদভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। যিনি ছাত্রদের মাঝে এই স্থান অধিকার করতে সক্ষম হতেন, তাকে বলা হত 'মুঈদ'। তীক্ষ্ণ মেধা ও অতুলনীয় উপস্থাপনা-শৈলীর ফলে ইমাম গাজালি দরসে মুঈদ হিসেবে নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সাথে ইলমে দ্বীনের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পর ইমামুল হারামাইন নামের সেই জগদ্বিখ্যাত মহান মনীষা আল্লামা জিয়াউদ্দীন আব্দুল মালেক ৪৮৭ হিজরী সনে নিশাপুর নগরে ইন্তিকাল করেন। তার মৃত্যুতে নগরের সমস্ত দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং গোটা জনপদ জুড়ে শোকের মাতম ও হাহাকার উঠে। জামে মসজিদের মিম্বর সেদিন ভেঙ্গে ফেলা হয়। ছাত্রগণ দোয়াত-কলম ছুড়ে ফেলে। ইতিহাসে পাওয়া যায়, দীর্ঘ এক বছর তাদের এই বিচ্ছেদ ও শোকের আহাজারি অব্যাহত ছিল। ঐতিহাসিক জীবনীকার ইবনে খাল্লিকান লিখেন, 'ইমাম গাজালি ইমামুল হারামাইনের জীবিতাবস্থায়ই ব্যাপক সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। সকলে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইমামুল হারামাইন তার এই একনিষ্ঠ শিষ্যের সহযোগিতা গ্রহণে দ্বিধা বোধ করতেন না। গর্বভরে বরং তিনি তার কথা উল্লেখ করতেন। তার সাহচর্যে ইমাম গাজালি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেন। ইমামুল হারমাইন যত দিন জীবিত ছিলেন, তিনি তার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন নি। তার মৃত্যুর পর ইমাম গাজালি নিশাপুর ত্যাগ করেন। মাত্র আটাশ বছরের যুবক ইমাম গাজালি তখন মুসলিম বিশ্বের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিসংবাদিত আলেমে পরিণত হন। জ্ঞানে-পান্ডিত্বে তৎকালের সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তার দৃষ্টান্ত ছিল বিরল।[২০]

নিশাপুর ত্যাগের মাধ্যমে তার জীবনের নতুন একটি দিক উম্মোচিত হয়। এই সময়েই তিনি তৃণমূল থেকে সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর জীবন প্রবাহকে কাছ থেকে দেখার, জানার, উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করেন। ক্ষমতার মসনদে আরোহনকারী রাজন্যবর্গের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার জীবনের এই অংশটি যেহেতু রাজদরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই নিম্নে সমকালীন রাজা, রাজ্য, রাজদরবার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।[২১]

নেযামুল মুলকের দরবারে জ্ঞান-বিতর্কে অংশগ্রহণ

নিতান্ত যুবক বয়সেই যেহেতু ইমাম গাজালির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের আনাচে-কানাচে- দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং মানুষ তার জ্ঞান বিস্তৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাই যখন তিনি নেযামুল মুলুকের শাহী দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন নেযামুল মুলুক তাকে অকপট শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নেন। বিভিন্ন জ্ঞান-বিতর্কে প্রতিপক্ষকে শানিত যুক্তির তোড়ে কুপোকাত, এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন তৎকালীন যুগে

২০. প্রাগুক্ত,পৃ.২৯৪
২১. প্রাগুক্ত,পৃ.২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হত। পাণ্ডিত্বের ক্ষেত্রে নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের হাতিয়াররূপে। এ ক্ষেত্রে যে যতটা পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সক্ষম হতেন, তিনিই গৃহীত হতেন সর্বজন স্বীকৃতরূপে। সমাজে তার অবস্থান হত বিশিষ্ট ব্যক্তির আসনে। বিভিন্ন শহর-বন্দরে কেবল জ্ঞান-বিতর্কের উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা হত। এ জাতীয় সভায় প্রচুর লোক সমাগম হত।[২২] দীর্ঘ প্রচলনের ফলে তা ক্রমশঃ এক সামাজিক ও শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করল। তৎকালীন যুগে এই জ্ঞান বিতর্কের প্রচলনের ফলশ্রুতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্বলিত অবিস্মরণীয় বহু গ্রন্থ দ্বারা ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার ব্যাপক সমৃদ্ধি পেয়েছে। নেযামুল মুলকের শাহী মজলিস ইমাম গাজালীকে স্বাগত জানাল। শাহী দরবারে উলামা ও গুণী সমাজের উপস্থিতিতে পর পর কয়েকটি ইলমী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম গাজালির জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বালোচনা ও বিচারবিশ্লেষণ শুনে উপস্থিত আলেম সমাজ ও পণ্ডিতবর্গ সকলে বিমোহিত হলেন। এ সময়ে তিনি সর্বমহলে ব্যাপক খ্যাতি লাভে সক্ষম হন।

অনুচ্ছেদ-৫

মাদরাসায়ে নেযামিয়ার অধ্যক্ষরূপে যোগদান

নেযামুল মুলুক মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে ইমাম গাজালিকে মাদরাসায়ে নেযামিয়ার অধ্যক্ষরূপে নিয়োগ দান করেন। এত অল্প বয়সে মাদরাসায়ে নিযামিয়ার প্রধানশিক্ষকরূপে বরিত হবার সৌভাগ্য ইতিহাসে একমাত্র তিনিই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেযামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করার সুযোগ লাভ করা কীরূপ দুর্লভ ও সম্মানজনক ছিল, সে ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উক্ত মাদরাসায় অধ্যাপনা করার আশায় বহু আলেম প্রতীক্ষার প্রহর গুনে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তথাপি তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি।[২৩]

প্রখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ ফখরুল ইসলাম শাশী মোহাম্মদ ইবনে আহমদ নেযামিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের পর বিহবল হয়ে পড়েন, এবং তার অন্তর এক অভাবনীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। এই সময় অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى بالسوددي

"এদেশ এখন ব্যক্তিত্ব শূন্য; তাই আমার মত নগন্যেরা আজ মসনদে আসীন। হায় দুর্ভাগা দেশ! আমার মত হতভাগার নেতৃত্বের যন্ত্রণা তাকে সইতে হচ্ছে" ।[২৪]

ইমাম গাজালী (রহ:) ৪৮৪ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে বিপুল সম্মান ও মর্যাদার সাথে নেযামিয়ার অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন। তার যোগদানের ফলে মাদরাসা নেযামিয়া দীর্ঘদিন পর অতীতের সেই ঐতিহ্যগত সজীবতা ফিরে পায়নি।[২৫]

রাজদরবারের সাথে যোগাযোগ

ইমাম গাজালির ইলম ও পাণ্ডিত্যের কারণে তার প্রতি রাজদরবারের সদস্যবর্গের আকর্ষণ ছিল বিধায় তাদের সাথে ইমাম সাহেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার প্রভাব ও গাম্ভীর্যে রাজদরবারের আমীর-উমারাগণ বিমোহিত হন। কিছুদিন পর হযরত ইমাম গাজালি সুলতানের পক্ষ থেকে মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্যরূপে বরিত

---

২২. Makdisi, George: "*Madrasa and University in the Middle Ages*", *Studia Islamica*, No. 32 (1970), pp. 255–264

২৩. Al-Ahram Weekly | Baghdad Supplement | They came to Baghdad : Its famous names

২৪. Black, A. *A History of Islamic Political Thought – From the Prophet to the Present*. Cambridge: Edinburgh University Press, 2001.

২৫. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রাগুক্ত-পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

হলেন। সে সময় ইসলামী কৃষ্টি-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল সেলজুকী ও আব্বাসী বংশ। উভয় দরবারেই ইমাম গাজালি সমতুল্য ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এক চিঠিতে ইমাম গাজালি উল্লেখ করেন–

মালিক শাহ সেলজুকীর শাহী দরবারে আমি দীর্ঘ বিশ বছর অবস্থান করেছি। মাঝে কিছুটা সময় ইস্পাহানে অতিবাহিত করার পর বাগদাদের দারুল খেলাফতের বিশেষ দূত হিসেবে কাজ করি। মালিক শাহ সেলজুকী যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন শাহী মহলের তুরকান খাতুন দরবারের আমীর-উমারাদের এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন যে, তার চার বছরের শিশু পুত্র মাহমুদকে সিংহাসনে বসানো হোক। বাগদাদের খলীফার নিকট তিনি এই মর্মে আবেদন করলেন, খোতবায় যেন তার নাম উল্লেখ করা হয়। সব আবেদন মেনে না নিলেও খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহ তার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার দরুন এ ব্যাপারে সম্মত হলেন যে, সালতানাতের যাবতীয় কার্যক্রম তুরকান খাতুনের নামে পরিচালিত হবে, কিন্তু খোতবা পঠিত হবে আব্বাসী বংশের নামে।[২৬]

তুরকান এদিকে বেঁকে বসল। খোতবায় নাম উচ্চারণ ও মুদ্রায় নাম অংকনের ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না। সমস্যা ক্রমাগত প্রকট রূপ ধারণ করে তা পরিণত হচ্ছিল আভ্যন্তরীণ সংঘাতে। ইমাম গাজালি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন বিধায় সকলে বিরোধ নিরসনে তার শরনাপন্ন হলেন। সমস্যা নিরসনে তাকে প্রেরণ করা হল খলীফার দূত হিসেবে। ইমাম গাজালির অনুরোধে তুরকান খাতুন খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহর প্রস্তাব মেনে নিলেন। এভাবে দূর হয়ে গেল রাজদরবারের একটি বড় ধরণের সংকট। ইসলামী বিশ্ব আপাত সমস্যা থেকে মুক্তি পেল। ৪৮৪ হিজরীতে খলীফা মৃত্যবরণ করলে খেলাফতের জন্য মনোনীত করা হয়। মুস্তাজহার বিল্লাহকে। রাজদরবারের অন্যান্য সদস্যের মত ইমাম গাজালি নতুন খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২৭]

খলীফা মুস্তাজহার বিল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইমাম সাহেবের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল হৃদ্যতা ও সম্প্রীতির। রাজ্য জুড়ে যখন বাতেনী (ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্মীয় উপদল) সম্প্রদায়ের তান্ডব শুরু হল, তখন খলীফা তাকে বাতেনী সম্প্রদায়ের মতবাদ খন্ডন করে কিতাব প্রণয়নে অনুরোধ জানালেন। তিনি লিখেন 'আল-মুস্তাযহারী' নামক অকাট্য যুক্তিসম্পন্ন একটি কিতাব। তার অনুরোধে লিখিত ছিল বলে এর নাম করণ করা হয় 'আল-মুস্তাযহারী'। ইমাম গাজালি ঘটনাটি উল্লেখ করেন তাঁর রচিত 'আল-মুনকিজ মিনাদ দালাল' গ্রন্থে।[২৮]

ওয়াজ নসিহত

ইমাম গাজালির দরগাহে উপস্থিত হতেন তিনশত শিক্ষক ও শতাধিক আমীর-উমারার এক জমায়েত। দরস ব্যতীতও তিনি গমন করতেন বিভিন্ন ওয়াজের মজলিসে। তার ওয়াজ সাধারণতঃ পরিপূর্ণ থাকত জ্ঞান-গর্ভ আলোচনায়। বিভিন্ন ওয়াজে তার প্রদত্ত ওয়াজ কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেন সায়্যেদ ইবনে ফারেস। পরবর্তীতে তার ১৮৩ টি ওয়াজের সমন্বয়ে দুই খন্ডের একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়। 'মাজালিসে গাজালিয়া' নামে তার সেই সংকলনটি জ্ঞানী মহলে ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২
২৮. ইমাম গাজালির একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্জন বাস

ইমাম গাজালির নির্জনবাস পৃথিবীর চরিত ইতিহাসের এক আশ্চর্যতম ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকেই সংসার বিরাগী হয়েছেন, অনেকের সাথেই ধ্যানমগ্নতার চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু, যে উদ্দেশ্য, আবেগ, ও প্রেরণা নিয়ে ইমাম গাজালি নির্জনবাস অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন, অভিনব, ও আশ্চর্য রকম উদ্দেশ্যপূর্ণ। আল-মুনকিয' গ্রন্থে ইমাম গাজালি ঘটনাটির পটভূমি সহকারে আদ্যোপান্ত উল্লেখ করেছেন। কিছুটা বিশদ আকারে এখানে আমরা ঘটনাটি প্রেক্ষাপটসহ উল্লেখ করছি।[২৯]

যে শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে ইমাম গাজালির চিন্তা-চেতনা ও মানসলোক গঠিত হয়েছিল, তার দাবী ও অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল, তিনি নিজ অনুসৃত মত ও পথ । ব্যতীত অন্য কোন দলের মত ও দাবীর প্রতি গ্রাহ্য করবেন না। এবং ভ্রুক্ষেপমাত্র করবেন না তার প্রতি। সমকালীন উলামা সমাজ ছিলেন অনুরূপ অবস্থায় আক্রান্ত। কিন্তু, সাময়িকভাবে থাকলেও তার ক্ষেত্রে এই এককেন্দ্রিকতা দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করে নি। কেননা, শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন এক ভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ। ভিন্ন মতবাদি উপদল ও তাদের বক্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ক্ষেত্রে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ ছিল তার একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সেলজুকী বংশের একচ্ছত্র প্রভাবের ফলে নিশাপুর ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ভ্রান্ত মতবাদিদের তেমন উৎপাত লক্ষ্য করা যেত না। বিভিন্ন বাদ-মতবাদের লীলাক্ষেত্ররূপে এ ক্ষেত্রে বাগদাদ নগরের পৃথিবী জোড়া প্রসিদ্ধি ছিল। শিয়া, সুন্নি, মুতাযেলা, নাস্তিক, অগ্নিপূজক- সকলের নিরাপদ আশ্রয় ছিল বাগদাদ। বাগদাদে বসে তাদের মতবাদী প্রপাগান্ডা পুরোদমে পরিচালিত হত এবং তারা অবতীর্ণ হত একে অপরের বিরোধিতায়।[৩০]

চিন্তারাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন

উপরে বর্ণিত চলমান পরিস্থিতিতে ইমাম গাজালি (রহ:) গভীর জ্ঞানঅন্বেষার তাড়নায় স্বদেশ ত্যাগ করে বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদ আগমনে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের নির্যাস উপলব্ধি করা। সত্যের সন্ধানে তিনি বাতেনীপন্থী, গ্রীক দর্শনপূজারী ও প্রচলিত আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী সহ সকলের মতবাদ বিশ্লেষণ করে তার বাস্তবতা উপলব্ধির গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত হন। এই কঠিন গবেষণায় সত্য উপলব্ধির পর তিনি লিখেন-

"আমি একে একে বাতেনী ও জাহেরীপন্থী, দার্শনিক, কালামশাস্ত্রবিদ ও নাস্তিকতায় বিশ্বাসী মিলিত হয়েছি সকলের সাথে এবং তাদের গভীরে প্রবেশ করে অতিবাহিত করেছি নিমগ্ন সময়। প্রথমে আমাকে ব্যর্থ মনোরথে বার বার হোঁচট খেতে হয়েছে। কিন্তু ক্রমাগত অনুসন্ধান ও তত্ত্বপর্যালোচনার পর এক সময় বিভ্রান্তির ঘোর অমানিশা ভেদ করে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি।"[৩১]

এই সত্য উদঘাটনের উল্লেখ করে তার ভাষ্য 'চেতনা বিকাশের প্রারম্ভিক কাল থেকেই যেহেতু বিচার-বিশ্লেষণ ও মতামত শুনে তত্ত্ব উদঘাটনের প্রতি আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল, ধীরে ধীরে আমি তাই সক্ষম হয়েছি অন্ধঅনুকরণের বন্দিদশা হতে মুক্তি লাভের সৌভাগ্য অর্জনে। শৈশব থেকেই আমি আবদ্ধ ছিলাম যে-সব পৌরাণিক বিশ্বাসে, সেই বিভ্রান্তির শৃঙ্খল আমাকে আর সত্য গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি। আমার মনে হল, এ জাতীয় অন্ধ অনুকরণ কেবল ইহুদী-খৃষ্টানদের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত ইলম কেবল তাই, যাতে থাকবে না কোন প্রকার অসঙ্গতি, অসচ্ছতা ও সন্দেহের লেশমাত্র। 'দশ সংখ্যা তিন সংখ্যার অধিক'- এটি একটি নিশ্চিত আপ্ত বিষয়। তিন সংখ্যাকে

---

২৯. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল: *ইমাম গাযযালী (রহ.)জীবন চরিত*,(ঢাকা:সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স,ডিসেম্বর-২০০৬),পৃ.১৬

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৩১. ইমাম গাজালি:এহইয়াউ উলুমিদ্দীন: অনুবাদ-মুহিউদ্দীন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, প্রথম প্রকাশ-রমজান: ১৪০৭ হি.)খ.-১, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

অধিক বলে যদি কেউ দাবী করে, এবং প্রমাণ হিসেবে বলে, আমার দাবীই সঠিক; কেননা, আমি লাঠিকে সাপে পরিণত করতে পারি। এবং বাস্তবেই তা সংঘটিত করে দেখায়। সে ক্ষেত্রেও আমাকে বলতে হবে, লাঠিকে সাপে পরিণত করা বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও দশ সংখ্যা তিন সংখ্যার অধিক এবং তা দিনের আলোর মতই নিশ্চিত। এরপর আমার ভাবনার বিষয় দাঁড়াল, এই মৌলিক ও নিশ্চিত জ্ঞানের সীমারেখাই বা কতটুকু। দেখা গেল, ইন্দ্রিয়লব্ধ ও বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট নিশ্চিত বিষয়গুলোর ব্যাপারেই আমাদের পক্ষে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আমার অর্জনে ইন্দ্রিয় অনুভূত ও প্রামাণিক জ্ঞান ব্যতীত আর তো কিছুই নেই। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় সমূহও সন্দেহ মুক্ত নয়। এমনকি, এক সময় আমার মনে হল, নিশ্চিত বিষয়বস্তুর জ্ঞান বলতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।[৩২]

পানাহার বর্জন ও বাগদাদ ত্যাগ

এই কাতরতা, অস্বস্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার দরুন, আমি বাকহারা হয়ে গেলাম। আমার দরস দানের অবসান ঘটল। এ সময় পরিপাক শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল। চিকিৎসকগণ আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বললেন, - এমন মানসিক ব্যাকুলতায় পথ্যাদি কোন কাজে আসে না।

নফসের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সফরের ব্যাপারে আমি উপনীত হলাম স্থির সিদ্ধান্তে। এ সংবাদ শুনে বাগদাদের আলেম-উলামা ও জ্ঞানী সমাজ ভীষণ মর্মাহত হলেন। স্বভাবতই এ সংবাদ তাদের জন্য ছিল মর্মান্তিক। তাদের বক্তব্য ছিল- "এটা হবে ইসলামের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। দ্বীনী খেদমতের এমন মহোত্তর সুযোগ পরিত্যাগ আপনার জন্য কোন কুফল বৈ সুফল বয়ে আনবে না। আলেমগণ বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অনুভব করছিলাম কেবল আমিই। সুতরাং, সমস্ত সম্পর্ক ও যশ-প্রতিপত্তি ত্যাগ করে আমি সিরিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলাম।"[৩৩]

প্রখ্যাত জীবনীকার ইবনে খাল্লিকানের মতে ইমাম গাজালি ৪৮৮ হিজরি সনের জ্বিলকদ মাসে বাগদাদ ত্যাগ করেন। প্রচন্ড মানসিক উত্তেজনার সাথে তিনি। সফরে যাত্রা করেন। তিনি এ সময় মূল্যবান রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করে স্বল্প মূল্যের মোটা কাপড় পরিধান করেন, এবং সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে সাধারণ শাক-সজি গ্রহণে ব্রতী হন।[৩৪]

কোন কোন বর্ণনা মতে ইমাম গাজালি দীর্ঘ দিন মনে মনে সংসার বর্জনের ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু সম্পর্কের নিগড়বদ্ধতা তাকে এই পথে বাঁধা দিচ্ছিল। ইচ্ছার বাস্তবায়ণ সম্ভব হচ্ছিল না। কোন মজলিসে একদিন তিনি ওয়াজ করছিলেন। ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হলেন তার ছোট ভাই আহমদ গাজালি। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। ইমাম গাজালিকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন-

أصبحت تهدي و لاتهتدي و تسمع وعظا و لاتسمع فيا حجر الشجر حتي مني تسن الحديد ولاتقطع

"অন্যের হেদায়েতের চিন্তায় তুমি বিভোর,
অথচ নিজের হেদায়াতের ব্যাপারে
তোমার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।
হে নির্জীব পাথর!

৩২. ইমাম গাজালি: এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, প্রাগুক্ত. খ.-১, পৃ.৩০
৩৩. প্রাগুক্ত,
৩৪. প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

আর কত দিন লৌহাস্ত্রে কেবল

শান দিয়ে যাবে, অথচ নিজের

আত্মায় বিগলিত হবার চেষ্টা করবে না?"

হয়ত ভাইয়ের এ সম্বোধন তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শক্তি দান করে।[৩৫]

হজ্জ ও জিয়ারত

বায়তুল মুকাদ্দাসের যিয়ারত সমাপনের পর তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ) এর মাজার "মাকামে খলীল" এ উপস্থিত হন। এর পর তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফের পথে রওয়ানা হন এবং দীর্ঘ দিন মদীনায় অবস্থান করেন। এ সফরকালীন অবস্থায়ই তিনি মিশর এবং এসকান্দারিয়া পৌঁছেন। এসকান্দারিয়ায় তিনি বহুদিন অবস্থান করেন।[৩৬]

ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনামতে এসকান্দারিয়া থেকে ইউসুফ ইবনে তাশকীনের সাথে মুলাকাত করার উদ্দেশ্যে মারাকাশ যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু হঠাৎ তার ইনতিকালের সংবাদ পেয়ে ইমাম সাহেব মারাকাশ যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

ভ্রমণাবস্থায় একদিন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে একটি ছোট পানির মশক হাতে জনমানবহীন মরুভূমির মধ্যে সামান্য পাশাক পরিধান অবস্থায় দেখতে পেল। ইতিপূর্বে এ লোকটিই ইমাম সাহেবকে চারশত ছাত্র পরিবেষ্টিত অবস্থায় অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত দেখেছিল। তাই সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করল আপনার পূর্ববর্তী কাজের চেয়ে এটা কি আপনার কাছে উত্তম বোধ হচ্ছে? ইমাম সাহেব তা শুনে অবহেলার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে আপনার মনে চলে গেল। ইমাম সাহেব মাকামে খলীলে পৌঁছে তিনটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- "আর কোন দিন বাদশাহর দরবারে যাব না। তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করব না; কোন প্রকার তর্ক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করে গেছেন।[৩৭]

ঐতিহাসিক ইবনে আসীর বলেন- এ সফরকালীনই ইমাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এহইয়াউল উলুমূ' রচনা আরম্ভ করেন। দামেশকের হাজার হাজার শিক্ষাবিদ এ গ্রন্থখানি তার কাছে অধ্যয়ন করেন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এহেন উদাস এবং অনিয়মতান্ত্রিক বিদেশ ভ্রমণের সময় এমন চিন্তাশীল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ?[৩৮]

এ কথাটা অমূলক নয় একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ তিনি তখন যেরূপ উদাস অবস্থায় সফরে বাহির হয়েছিলেন তার পক্ষে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা সাধারণের বোধগম্যের বাহিরে। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না, এ দীর্ঘ দশ বছর একই অবস্থায় কাটে না। কিছু দিন উদাসীন অবস্থায়, কিছু সময় আধ্যাত্মিক চিন্তায় কাটলেও বাকী সময়টা স্বাভাবিকভাবে কাটিয়েছে এবং এ সময়টা তিনি শিক্ষামূলক কাজে অতিবাহিত করেছেন।

---

৩৫. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল: প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৩৭.প্রাগুক্ত,পৃ.২০

৩৮.প্রাগুক্ত,পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

'কাওয়ায়েদুল আকায়েদ'[৩৯] নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সফররত অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। জামালুল ইসলাম উপাধিধারী ইমাম সাহেবের অন্যতম সাগরিদ আবুল হাসান আলী ইবনে মুসলিম ঐ সফরের সময়ই ইমাম সাহেবের কাছে উক্ত কিতাবখানি পাঠ করেন।ইমাম সাহেব মুনকায মিনাদ দালাল'এ লিখেছেন- হজ্জব্রত সমাধা করার পর পরিবার-পরিজনের আকর্ষণে আমি স্বদেশ ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। অথচ ইতিপূর্বে আমি বাড়ীর নাম শুনলেই চমকিয়ে উঠতাম এবং সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতাম। বাড়ী এসে আমি গভীরভাবে মোরাকাবা এবং মোশাহেদায় আত্মনিয়োগ করি। তথাপি দেশ ও দশের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আমাকে মোরাকাবা ভঙ্গ করতে হতো। অন্যত্র ইমাম সাহেব বলেছেন- অক্লান্ত এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আমার আত্মাকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে আমার মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের অবরোধ প্রাচীর ভেঙ্গে গেল। আমি সন্দেহ মুক্ত হলাম।[৪০]

ওফাত

ইমাম গাজালি (র) ৫০৫ হিজরীর ১৪ই জমাদিউসসানী সোমবার ফজরের নামাযের পর মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তাবরান নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা ইবনে জাওযী ইমাম সাহেবের মৃত্যুর ঘটনা তার ছোট ভাই ইমাম আহমদ গায্যালীর কাছ থেকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :-

ঐ দিন ইমাম সাহেব শয্যা ত্যাগ করে অযু করলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি কাফনের কাপড় আনিয়ে তা চোখে লাগিয়ে বললেন "প্রভুর আদেশ আমার শিরোধার্য।" এ কথা বলে তিনি পা সোজা করে শয়ন করলেন। সকলেই কি হল দেখতে এসে দেখলেন- সব শেষ! ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে মুসলিম জাহান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। বহু কবি শোক গাথা রচনা করে তার জন্য শোক প্রকাশ করল।[৪১]

ইমাম সাহেবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মাত্র কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল সাতুল মনী। বহুদূর পর্যন্ত ইমাম সাহেবের বংশাবলির পরিচয় পাওয়া যায় কাইয়ুমী কিতাবুল মিসবাহ'-তে শায়খ মাযদুদ্দীনের কাছে ইমাম সাহেবের বংশাবলি সম্পর্কে একটি বর্ণনা পেশ করেছিলেন। শায়খ মাজদুদ্দীন সামুল মনীর নিম্নতম সপ্তম পুরুষ। ৭১০ হিজরী পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়।[৪২]

ইমাম সাহেবের শিষ্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের মধ্যে কোন কোন শিষ্য খুব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে তুমরাত যিনি স্পেনের তাশকীন বংশকে উৎখাত করে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনিও ছিলেন ইমাম সাহেবের একজন সাগরিদ। ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট আলেম আল্লামা আবু বকর আরাবীও ইমাম সাহেবের সাগরিদ ছিলেন। তা ছাড়াও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কয়েকজন সাগরিদের নাম দেয়া হল।

কাযী আবু নসর আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল ফাতাহ আহমদ ইবনে আলী, আবু মানসূর মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল, আবু সাঈদ আহমদ ইবনে আসআদ, আবু হামেদ মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালেক; আবু সাঈদ মুহম্মদ ইবনে আলকুরদী, ইমাম আবু সাঈদ মুহম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী, আবু তাহের ইমাম ইব্রাহীম, আবুল ফাতাহ নাসার ইবনে মুহম্মদ আযার বাইযানী, আবুল হাসান সা'দুল খায়র ইবনে মুহম্মদ বুলনাসী, আবু তালেব আবদুল করীম রাযী, আবু মনসুর সাঈদ ইবনে মুহম্মদ, আবুল হাসান আলী ইবনে মুহম্মদ জাওযী, সুফী আবুল হাসান আলী ইবনে মুযহার দানুরী, আবুল হাসান আলী ইবনে মুসলিম জামালুল ইসলাম প্রমুখ।[৪৩]

---

৩৯. ইমাম গাজালির বিখ্যাত গ্রন্থ

৪০. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল: প্রাগুক্ত, পৃ.২০

৪১. মরহুম হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল: প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৪২. Abu Hamid Al-Ghazali, in https://web.archive.org/web/20120415041817/http://www.intellectualencounters.org/

৪৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১

ইমাম গাজালির রচনাবলি

গ্রন্থ রচনার জগতে ইমাম গাজালি (রহঃ) যেই বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন, ইসলামী ইতিহাসে তার অপর দৃষ্টান্ত বিরল। ইমাম গাজালির জীবনের আয়ুস্কাল ছিল মাত্র ৫৫ বছর। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, মাত্র বিশ বছরের তরুণ বয়সেই তিনি লেখালেখির সূচনা করেন। সেই সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন লাগাতার দরস-তাদরীসের কাজ। দেড় শতাধিক ছাত্রের এক বিশাল জামাত অনুক্ষণ তার একান্ত সান্নিধ্যে থাকত। তাছাউফের যাবতীয় কার্যক্রম তো বহাল ছিলই, জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে বিবিধ মাসআলার সমাধান চেয়ে যেসব ফতোয়া আসত, সেগুলোর উত্তরও দিতে হত। মোটকথা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার সরব উপস্থিতির কোনরূপ ব্যত্যয় ছিল না। এসব ব্যস্ততার পরও তিনি কীভাবে গ্রন্থ রচনায় পর্বতসম অবদান রেখে গেলেন, তা আজো বিদগ্ধ সামাজের নিকট এক জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে।[৪৪]

হযরত ইমাম গাজালি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নিম্নে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তার একটি গ্রন্থসূচী দেওয়া হল-

(ا)

১. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন[৪৫]
২. ইমলা আলা মুশকিলিল এহইয়া
৩. আরবাইন
৪. আসমাউল হুসনা
৫. আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ
৬. ইলজামুল আওয়াম
৭. আসরারুল আনওয়ারিল ইলাহিয়্যাহ
৮. আখলাকুল আবরার
৯. আসরারুল ইত্তিবায়িসসুন্নাহ
১০. আসরারুল হুরুফ ওয়াল কালিমাত
১১. আইয়ুহাল ওয়ালাদ

(ب)

১২. বিদায়াতুল হিদায়া
১৩. আল বাসিত।
১৪. বায়ানুল ক্বওলাইনিশশাফেয়ী
১৫. বায়ানু ফাজা ইহিল ইবাহিয়্যাহ।
১৬. বাদায়েউস সানায়ে

৪৪. নূরনবী: *ইমাম গাযালীর জীবন-চিত্র ও র্দশন*,(ঢাকা:বাংলাবাজার প্রকাশনী.মে-২০০৭), পৃ.৩-৫
৪৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(ت)

১৭. তাম্বীহুল গাফেলীন [৪৬]

১৮. তালবীসে ইবলীস

১৯. তাহাফুতুল ফালাসিফা

২০. তা'লিকাত ফী ফুরুইল মাযহাব ।

২১. তাহসীনুল মা'খায় ।

২২. তাফরিকা বাইনাল ইসলাম ওয়ায যানদাকাহ

(ج)

২৩. জাওয়াহিরুল কোরআন

(ح)

২৪. হুজ্জাতুল হক।

২৫. হাকীকাতুর রুহ

(خ)

২৬. খোলাসাতুর রাসাইল ইলা ইলমিল মাসাইল

২৭. ইখতিসারুল মুখতাসার

(ر)

২৮. আর-রিসালাতুল কুদসিয়্যাহ

(س)

২৯. আসসিররুল মাসুন

(ش)

৩০. সারহে দায়েরা আলী ইবনে আবি তালিব

৩১. শিফাউল আলীল আলা মাসআলাতিত তালীল

(ع)

৩২. আকীদাতুল মিসবাহ

৩৩. আজাইবু সুনইল্লাহ ।

৩৪. উনকুদুল মুখতাসার

(غ)

৩৫. গায়াতুল ফাউর ফী মাযেলিত দাওর

৩৬. গাওরুদ দাওর[৪৭]

(ف)

৩৭. ফাতাওয়া

৩৮. আ-ফিকরাহ ওয়াল ইবরাহ

৩৯. ফাওয়াতিহুস সুয়ার

৪০. আল-ফারকু বাইনাস সালেহ ওয়া গাইরিস সালেহ

---

৪৬. নূরনবী:*ইমাম গাযালীর জীবন-চিত্র ও দর্শন*: প্রগুক্ত, পৃ.৩-৫

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

(ق)

৪১. আল-কানুনুল কুল্লী
৪২. কানুনুর রাসূল
৪৩. আল-কুরবাতু ইলাল্লাহ
৪৪. আল-কিসতাসুল মুসতাকীম
৪৫. কাওয়ায়েদুল আকায়েদ
৪৬. আল-কাওলুল জামীল

(ك)

৪৭. কিমিয়ায়ে সাআদাত[৪৮]
৪৮. কিমিয়ায়ে সাআদাত(সংক্ষিপ্ত)
৪৯. কাশফু উলুমিল আখেরাহ
৫০. কানযুল ইদ্দাত

(ل)

৫১. আল-লুবালুল মুনতাহাল

(م)

৫২. আল-মুসতাসফা ফী উসুলিল ফেকাহ
৫৩. আল-মানখুল
৫৪. মাখায।
৫৫. আল মাবাদী ওয়াল গায়া
৫৬. আল-মাজালিসুল গাজালিয়া
৫৭. মাকাসেদুল কলাসিফা।
৫৮. আল-মুনকিয মিনায যালাল
৫৯. মেয়ারুর ন্যর।
৬০. মেয়ারুল উলুম ফীল মানতেক
৬১. মুহিকুন নাযার
৬২. মিশকাতুল আনওয়ার
৬৩. আল-মুস্তাযহারী
৬৪. মীজানুল আমল
৬৫. মাওহেমুল বাতেনিয়্যাহ
৬৬. আল মানহাজুল আ'লা
৬৭. মেরাজুস সালেকীন
৬৮. আল মাকনুন ফিল উসূল,
৬৯. মুসাল্লামুস সালাতীন
৭০. মুফাসসালুল খিলাফ।
৭১. মিনহাজুল আবেদীন(বলা হয়,এটা তার লিখিত সর্বশেষ কিতাব)।
৭২. আল-মাআরেফুল আকলিয়্যাহ

৪৮. নূরনবী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

(ن)

৭৩. নসীহাতুল মুলুক

(و)

৭৪. ওয়াজিব

৭৫. ওয়াসিত

(ي)

৭৬. ইয়াকুতুত তাবীল ফিত তাফসীর (৪০খন্ড)[৪৯]

বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাবলী

(উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী)

১. ইসলামী ফেকাহ ও আইন শাস্ত্র

ওয়াসিত, বাসিত, ওয়াজি, বায়ানুল কাওনাইন, তা'লীকাত ফী ফরুইল মাযহাব, খোলাসাতুর রাসূল, ইখতিসারুল মুখতাসার, গায়াল ফাউর, কাতাওয়া।

২. উসূলে ফেকাহ

তাহসীনুল মাখায, শিফাউল আলীল, মুনতাহাল ফী ইলমিল জাদাল, মানখুল, মুস্তাসফা, মা'খায ফিল খিলাফিয়্যাত, মুফাসসালুল খিলাফ।

৩. মানতেক শাস্ত্র

মিয়ারুল ইলম, মুহিককুন নাজার, মীজানুল আমল।

৪. দর্শন শাস্ত্র

মাকাসেদুল ফালাসিফা।

৫. কালাম শাস্ত্র

তাহাফুতুল ফালাসিফা, আল-মুনকি মিনায যালাল, ইলজামুল আওয়াম, আল-ইকতিসাদ, আল-মুস্তাযহারী, ফাযায়েহে এবাহিয়্যাহ, হাকীকাতুর রূহ, আলকিসতাসুল মুসতাকিম, আল-কাওলুল জামীল, মাওয়াহেমুল বাতেনিয়্যাহ, তাফরিকা বাইনাল ইসলামী ওয়ায যানদাকাহ, আর রেসালাতুল কুদসিয়্যাহ।

৬. সূফীতত্ত্ব ও চরিত্র দর্শন।

এহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিমিয়ায়ে সাআ'দাত, আল-মাকসাদুল আকসা, আখলাকুল আবরার, জাওয়াহিরুল কোরআন, জাওহারুল কুদুস, মেশকাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবেদীন, মেরাজুস সালেকীন, নসীহাতুল মুলুক, আইয়ুহাল ওয়ালাদ, বিদায়াতুল হিদায়া। এগুলো ছাড়াও ইমাম গাজালি আরো কিছু গ্রন্থ লিখেছেন সেগুলোর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। [৫০]

বিতর্কিত গ্রন্থাবলি

ইমাম গাজালির কয়েকটি গ্রন্থের ব্যাপারে তার লিখিত নয় বলে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাদের মতে, বইগুলো অন্যের দ্বারা লিখিত হয়ে পরবর্তীতে তার নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। মূলত:, মানল, মাজনুন বিহী আলা গায়রী আহলিহী, কিতাবুল ফাতহি ওয়াত তাছবিয়া, সিররুল আলামীন এই চারটি গ্রন্থের ব্যাপারেই এরূপ সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। নিম্নে আমরা কিতাবগুলোর ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতামত ও পর্যালোচন তুলে ধরছি।[৫১]

৪৯. নূরনবী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

৫০. নূরনবী: প্রগুক্ত, পৃ. ১০

৫১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মানখুল

কিতাবটি রচিত উসূলে ফেকাহ বিষয়ে। 'কাশফুজ জুনুন' নামক গ্রন্থে কিতাবটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে রদু আবী হানীফা' হিসেবে। কালায়েদ গ্রন্থের লেখকের বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, এটি ইমাম গাজালির নয়; বরং মাহমুদ মুতাযেলীর লিখিত। শামছুল আয়িম্মাহ সারাখসী এরূপ মতামতের বিরোধিতা করে একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছেন। মানখুল কিতাবে ইমাম আযম আবু হানীফার উপর কঠিন বক্তব্য আরোপ করা হয়েছে। তার উদ্ভাবিত মাসআলা ও মাযহাব সম্পর্কে তাতে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফ মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কদাচিৎ সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও; তার অধিকাংশ মতামতই বিভ্রান্তিপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। অপরদিকে, ইমাম গাজালি তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ এহয়াউল উলুমে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে অত্যন্ত স্বচ্ছ, ও সুধারণা পোষণ করে মন্তব্য করেছেন। এবং ইসলামী ফেকাহর ক্ষেত্রে তাকে নতুন যুগপ্রবর্তক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং, মানকূল কিতাবের বক্তব্য সকলের নিকট অভিনব ও বিভ্রান্তিমূলকরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে তারা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন , মানকূল কিতাব কখনো ইমাম গাজালির হতে পারে না। কেননা, ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে মন্তব্যের ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু, আমাদের মতে, কেবল উল্লেখিত যুক্তির সাপেক্ষে বইটি তার লিখিত নয় বলে অভিমত পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, ইতিহাসের সুবিখ্যাত গ্রন্থগুলোর বর্ণনা মতে বইটি তারই লিখিত।

তবে, এক্ষেত্রে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হল, ইমাম গাজালি সমগ্র জীবনব্যাপী অভিন্ন ধ্যান-ধারণার অনুবর্তী ছিলেন না। মানস চেতনায় তিনি বিবর্তন ও পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছেন। যুবক বয়সে যখন তিনি এক মুখর সময় অতিবাহিত করেছেন, তখন তার কথা ও বক্তব্যে বাকচাতুর্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের মনোবৃত্তি ফুটে উঠত। স্থির, শান্ত, সৌম্য ও নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিষয় বিচার করে অতিকথন থেকে মুক্ত থাকা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ।[৫২]

পরবর্তীতে ইমাম গাজালির চরিত্রে এই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এক সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক মোজাহাদার ফলে এ ক্ষেত্রে তিনি এক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হন। প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আব্দুল গাফের ফারেসী তার জীবনের বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে বলেন-

ইমাম গাজালি প্রথম জীবনে ছিলেন জৌলুস-প্রীতিতে নিমগ্ন এবং আত্মগরিমায় বিমুগ্ধ এক মোহাক্রান্ত যুবক। কিন্তু, শেষ জীবনে তার চরিত্রে এসবের ছায়াও খুঁজে পাওয়া যায় নি। বরং জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি প্রবেশ করেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার এক পবিত্র উদ্যানে।[৫৩] মানখূল কিতাবটি লিখিত তার সেই শুরু জীবনের টগবগে সময়গুলোতে। আমি কিতাবটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করে দেখেছি, তার বক্তব্যের উপস্থাপনা আমার অনুমানের প্রমাণই বহন করে।[৫৪]

---

৫২. আল-হুসাইনি:*বিশরহে ইহয়াই উলুমুদ্দীন*(বৈরূত,প্রথম প্রকাশ,১৪১৪হি.) খ.১,পৃ.২৭

৫৩. প্রাগুক্ত,পৃ.২৮

৫৪. ইমাম গাজালি:*মুকাশাফাতুল কুলুব*:(এ.এন.এম. মোস্তাফিজুর রহমান অনূদিত,ঢাকা,সোলেমানিয়া বুক হাউস,প্রথম প্রকাশ,খ.১, পৃ.২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

মাজনুন বিহী আলা গায়রি আহলিহী

এই কিতাবটি প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস ইবনে সালাহ ও আল্লামা ইবনে সুবকীর মন্ত ব্য-এটি ইমাম গাজালির লিখিত হতে পারে না কোনভাবেই। কেননা, কিতাবটি মানতেকের প্রসিদ্ধ বিষয় 'পৃথিবীর প্রাচীনত্ব'বস্তুর বিভক্তি ধারণা'র অসারতা, এবং আল্লাহ তায়ালার সিফাতের পরিপন্থী মতবাদ পোষণ করা হয়েছে, যা সাব্যস্ত করে স্পষ্ট কুফর।[৫৫]

আমরা এখানে বিষয়টির উভয় সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। নীতিশাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রহণযোগ্য কিতাব আমাদের নিকট বিদ্যমান, তাতে কিতাবটি তার লিখিত বলেই সাব্যস্ত। তাছাড়া, ইমাম গাজালি স্বয়ং তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জাওয়াহিরুল কোরআনে কিতাবটির উল্লেখ করেছেন। যারা কিতাবটি তার নয় বলে অভিমত পেশ করেছেন, তাদের প্রমাণ হল, কিতাবটিতে এমন কিছু মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইবনে সালাহ ও ইবনে সুবকীর মতে কুফুর সাব্যস্ত করে। প্রমাণ হিসেবে যদি এই বক্তব্য যথেষ্ট হয়, তাহলে এহয়াউল উলুম গ্রন্থেও এমন কিছু মাসআলার উল্লেখ আছে, যা কারো কারো মতে কুফুর ও ভ্রান্তিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ-বর্তমান পৃথিবী থেকে উন্নততর পৃথিবী সৃষ্টি অসম্ভব'- মাসআলাটিই যথেষ্ট। আল্লামা শে'রানী এই মাসআলটির উপর 'আল-আজয়িবা' নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন। হাদীসের অনেক ইমামের মতে, এরূপ ধারণা পোষণ করা কুফরী। কেবল এই মাসআলার উপর ভিত্তি করে অনেকে ইমাম গাজালিকে কাফের পর্যন্ত বলেছেন।[৫৬]

তবে, এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, কুফর সাব্যস্ত করার বিষয়টি হালকাভাবে দেখা উচিত নয়। বরং কুফুর সাব্যস্ত করার পূর্বে কারণটি যথাযথ কিনা, তা তলিয়ে দেখতে হবে গভীরভাবে। অনুরূপ, কুফরের ক্ষেত্রে মৌলিক বক্তব্যকে মুখ্য হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে। আল্লাহ তায়ালার সিফাত তথা গুণাবলী যারা অস্বীকার করেন, তাদের বক্তব্য এমন নয়, আল্লাহ তায়ালার সাথে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' 'সর্বশ্রোতা' 'সর্বদ্রষ্টা' ইত্যাদি গুণবাচক শব্দের কোন সম্পৃক্ততা নেই, কিংবা তারা অস্বীকার করেছেন আল্লাহ তায়ালার এই সব বৈশিষ্ট্য। বরং তাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ তায়ালা সত্ত্বাগত ভাবেই এ সমস্ত গুণের অধিকারী। ভিন্নভাবে, স্বতন্ত্র শব্দের দ্বারা তার এ জাতীয় গুণাবলীকে চিহ্নিত করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ জাতীয় বিশ্বাস কুফুর সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

সর্বশেষ কথা এই যে, আমাদের নিকট মাজনুন কিতাবের যে কপি আছে, তাতে এ জাতীয় বিতর্কিত বিষয়ের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এ আলোচনা মূলগতভাবেই অবান্তর।[৫৭]

আল ফাতাহ ওয়াত তাছবিয়া

এহয়াউল উলুমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুরতাজা জাবিদী হুসাইনী লিখেন কিতাবটিতে ইমাম গাজালির নাম জালভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নি। অন্য কোন গবেষকের পক্ষ থেকে আমরা এ জাতীয় কোন বক্তব্যের উল্লেখ পাইনি।

---

৫৫. আল-হুসাইনি: প্রগুক্ত, খ.১,পৃ.২৮
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সিররুল আলামীন

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার পর কিতাবটি তার লিখিত নয় বলেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। কিতাবটির বর্ণনা-শৈলী ও উপস্থাপনা ইমাম গাজালির উপস্থাপনা ও বর্ণনার সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। এক্ষেত্রে জালকারীগণ অভিনব চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন বলেই মনে হয়েছে। স্থানে স্থানে ইমামুল হারামাইনের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমামুল হারামাইন ছিলেন ইমাম গাজালির একজন বিশিষ্ট উস্তাদ, বিধায় বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম গাজালি তার রচনা সমূহে খুব কমই উস্তাদদের কথা ও বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে উস্তাদ ও শায়েখের বর্ণনা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন হলেও, তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। আল-মুনকিয' গ্রন্থে তিনি এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, "ইতিপূর্বে শায়েখদের নিকট আমি যেরূপ তালীম-তরবিয়ত লাভ করেছি, সে অনুযায়ী আমি মোরাকাবা-মোজাহাদায় নিরত হই।"[৫৮]

অনুচ্ছেদ-৩

গ্রন্থ রচনার বিভিন্ন দিক

আল্লামা নববী তার বুস্তান' গ্রন্থে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বরাতে উল্লেখ করেন, আমি ইমাম গাজালির লেখা ও জীবনের হিসেব করে দেখেছি, প্রতিদিন গড়ে তিনি ১৬ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন, তার কর্মব্যস্ত সময়ের হিসেবে যা এক কথায় অভিনব ও বিস্ময়কর। এই হিসেব যদিও আল্লামা তাবারী, ইবনুল জাওযী ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর সুবিশাল গ্রন্থসম্ভারের তুলনায় নিতান্ত স্বল্প, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, তাদের অধিকাংশ লেখাই ছিল বর্ণনামূলক এবং অন্যের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, ইমাম গাজালির প্রায় সমস্ত লেখাই উদ্ভাবনমূলক ও গবেষণাধর্মী।[৫৯]

লেখার বিষয়বস্তু

ইমাম গাজালি একাধারে ইসলামী ফেকাহ, কালামশাস্ত্র, নীতিগত উন্নতি বিধান, ও সূফীতত্ত্ব নিয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তার একটি সংক্ষিপ্ত সূচী উল্লেখ করেছি। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতির উপর একটি প্রামাণ্য কিতাব লিখেছেন, যাতে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে অবলম্বন করা হয়েছে প্রচলিত পন্থা ও পদ্ধতি। ইস্তাম্বুলের একটি পাঠাগারে কিতাবটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। উক্ত কিতাব থেকে প্রমাণ হয়, তাওরাত ইঞ্জিলের জ্ঞান সম্পর্কেও ইমাম গাজালির পর্যাপ্ত ধারণা ছিল । ইসলামী ফেকাহ, কালামশাস্ত্র, ও তাছাউফ তত্ত্বে তার লেখা ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ও রচনা ভান্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা পর্যায় ক্রমে সে সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

তাফসীর শাস্ত্রে সম্ভবতঃ তিনি বিশেষ কিছু লিখেননি। ইয়াকুত তাবীল' নামে ইতিহাসে তার যেই তাফসীর গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, আজ পর্যন্ত তার কোন বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৬০]

সর্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা

জীবিত অবস্থায়, এবং পরবর্তীতে তার লেখা যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও বিপুল সমৃদ্ধি পেয়েছে, পুস্তক জগতের ইতিহাসে তা এক বিস্ময়কর ঘটনা। এহয়াউল উলুম সম্পর্কে মন্তব্য করে ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী বলেন,"ইমাম গাজালির এহয়াউল উলুম ইসলামী সুফিবাদের উঁচু স্তরের একটি কিতাব।" ইমাম গাজালির সমসাময়িক আলেম

৫৮. সালেহ আহমাদ,*ইমাম গাজালি :*(দামেস্ক:দারুল কলম,প্রথম প্রকাশ, ১৪১৩হি.),পৃ.৩৪

৫৯. ইমাম আয-যাহাবী,সিয়ারু আলামিন নুবালা: (কায়রো: দারুল হাদিস ,খ.৩৭,পৃ.৩০৬ তা.বি)

৬০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমামুল হারামাইনের একজন বিশিষ্ট শিষ্য আব্দুল গাফের ফারেসী বলেন, এহয়াউল উলুমের পূর্বে এর চেয়ে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ লেখা হয়নি। মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যকার আল্লামা নববী লিখেন-'এহয়াউল উলুম কোরআন শরীফের সার-নির্যাস নিয়েই লিখিত। শায়েখ আবু মোহাম্মদ দাবী করেন, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কেবল এহয়াউল উলুমের মাধ্যমেই তার পূনর্জীবন দান সম্ভব।' তৎকালের সনামধন্য সূফী শায়েখ আব্দুল্লাহ এহয়াউল উলুমের হাফেজ রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শায়েখ আলী পঁচিশ বার কিতাবটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন। প্রতিবার সমাপ্ত করার পর তিনি ছাত্র ও দুস্থ ব্যক্তিদের দাওয়াত করে আপ্যায়ন করতেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুলূক ও সূফীতত্ত্বের ক্ষেত্রে যারা তার সমস্তরের ছিলেন, তারাও কিতাবটিকে মনে করতেন ইলহামী বলে। কুতুব শাহ ওয়ালী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সূফী।[৬১] একদিন তিনি এহয়াউল উলুম হাতে সকলের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, বলতে পার এটি কোন কিতাব? এই বলে তিনি হাতেপায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখালেন। তিনি বললেন, ইতিপূর্বে আমি কিতাবটির বিরোধিতা করতাম। আজ রাতে ইমাম গাজালি আমাকে নিয়ে (স্বপ্নে) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। এবং এই অপরাধে আমাকে শাস্তি দেয়া হল।[৬২]

আলেম সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা

তৎকালীন প্রায় সকল শ্রেণীর আলেম তার লেখার প্রতি ছিলেন অনুরক্ত ও সহানুভূতিশীল। উলামা সমাজে সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে ইমাম গাজালির রচনাসমগ্র যে-বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রে তার অসামান্য চারটি গ্রন্থ-বাসীত' 'ওয়াসিত ও রাসায়েল' শাফেয়ী মাযহাবের উৎস ও রেফারেন্স গ্রন্থ বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত। মিশরে বর্তমান 'ওয়াজিজ' গ্রন্থটি খুবই সুলভ। কিতাবটির সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন আল্লামা ফখরুদ্দীন ইমাম রাযী। অতঃপর একে একে তার ব্যাখ্যা লিখেনকাজী সিরাজুদ্দীন মোহাম্মদ আরমাবী, ইমামুদ্দীন আবু হামেদ মোহাম্মদ বিন ইউনুস, আবুল ফাতাহ সা'আদ বিন মাহমুদ, আবুল কাসেম আবুল করীম বিন মোহাম্মদ কাযভীনী ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। শরহে এহয়া' গ্রন্থে এহয়াউল উলুমের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বলে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবুল মুকলিন আল-বাদরুল মুনীর' নামক সাত খন্ডের বৃহৎ একটি কিতাবে 'ওয়াজীয' গ্রন্থের হাদীস সমূহের তাখরীজ' করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, বদরুদ্দীন জামা'আহ, বদরুদ্দীন জারকাশী, এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার সারসংক্ষেপ লিখেছেন। এছাড়াও আরো অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের কথা কাশফুজ জুনুন' কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৩]

এমনিভাবে 'ওয়াসিত' কিতাবের (যাকে কাশফুজ জুনুন ও রাসায়েল নামে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে) একাধিক ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থ রয়েছে। আল্লামা মুহিউদ্দীন সর্বপ্রথম উক্ত কিতাবের ১৬ খন্ডের বৃহৎ একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন।

অনুরূপ শায়েখ নাজমুদ্দীন আহমদ বিন আলীও ষাট খণ্ডের এক সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থে ওয়াসিত[৬৪] কিতাবের জটিল বিষয়গুলোর সমাধান দিয়েছেন।

---

৬১. সালেহ আহমাদ: প্রগুক্ত,পৃ.৩৩
৬২. সালেহ আহমাদ: প্রগুক্ত,পৃ.৩৪
৬৩. প্রাগুক্ত
৬৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৪

নীতি-দর্শনে এহয়াউল উলুম

নীতি-দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রীক ভাবনার আরবী অনুবাদ ইসলাম নীতির শিক্ষাদান, বিস্তার, এবং উপদেশ প্রদান, উৎসাহ ব্যঞ্জক আনুষঙ্গিকতার মাধ্যমে সচ্চরিত্র অবলম্বনের দাওয়াত দিয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে দার্শনিক ভাবাদর্শের নীতিদর্শন যদিও ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয় নি, কিন্তু পঞ্চম শতকে যখন গ্রীক দর্শনের একচ্ছত্র আধিপত্য মুসলিম বিশ্বকে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করল, তখন ইসলামী চরিত্রাদর্শের দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রতিভাত হয়েছিল সময়ের অলঙ্ঘনীয় দাবী রূপে। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল নীতি দর্শনের উপর দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। পার্ফীস-যিনি আরবদের নিকট فرفوريوس নামে পরিচিত, ব্যাখ্যা লিখেছেন গ্রন্থ দু'টির। পরবর্তীতে আরবী ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করেন হুসাইন ইবনে ইসহাক।[৬৫]

এরিস্টটল এ বিষয়ে 'আত্মার গুণ-বৈশিষ্ট্য' নামে অপর একটি গ্রন্থ লিখেছেন, যা আবু উসমান দামেশকী কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। মুসলিম দার্শনিক ইবনে মিসকাওয়া বইটির অনুবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন- 'আবু উসমান প্রভূত পান্ডিত্ব অর্জন করেছেন একাধারে গ্রীক ও আরবী ভাষায়। তিনি কিতাবটির মূলানুগ অনুবাদে সক্ষম হয়েছেন। কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় না। গ্রীক ভাষায় যে-শব্দ যে-ভাব ধারণ করে, তিনি আরবী প্রতিশব্দ দ্বারা সে ভাব স্বার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে গ্যালন নীতি দর্শনের কয়েকটি সূত্রের উপর দীর্ঘ আলোচনা লিখেছেন। চরিত্রের স্খলন জানার উপায়' নামে পরবর্তীতে সেই আলোচনা আরবীতে প্রকাশিত হয়। এরও আরবী অনুবাদ হয়েছে। ইবনে মিসকাওয়া তার তাহজীবুল আখলাক' গ্রন্থে বইটির অনেক সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

এ সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে মুসলিম দার্শনিকগণ পরবর্তীতে ব্রতী হন বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে। নিম্নে এ জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থের সূচী উল্লেখ করা হলো।

এহয়াউল উলুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এহয়াউল উলুমের সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা পাঠে পাঠকের অন্তরলোকে এক যাদুমন্ত্রের মত ক্রিয়া হতে থাকে। তদুপরি, পাঠকের কথা ও কাজে তাৎক্ষণিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এজাতীয় প্রভাব সৃষ্টির অন্যতম কারণ এই যে, ইমাম গাজালি কিতাবটি এমন এক সময় রচনা করেন, যখন তিনি পার্থিব বিমুখতা ও আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে বিচরণ করছিলেন। ইমাম গাজালি এক সময় চিরন্তন সত্যের অন্বেষায় বাগদাদে ভীষণ মনোপীড়ায় ভুগছিলেন। তিনি সকল ধর্ম ও মতবাদের নির্যাস পর্যালোচনা করে দেখলেন, কিন্তু কোন কিছুই তার ভীষণ পিপাসা মিটাতে সক্ষম হল না। অবশেষে তিনি সূফীতত্ত্ব ও মারেফাতের[৬৬] প্রতি ধাবিত হলেন।

কিন্তু মারেফাত অন্য সকল মতবাদের মত বুলিসর্বস্বতায় বিশ্বাস করে না। তার সকল বিষয় বরং বিভিন্ন কার্যকারণের সাথে সম্পর্কিত। মারেফাতের প্রাথমিক পাঠই হল, মস্তক অবনত রাখা, আত্মশুদ্ধি ও রিপুসমূহের দমন করা। কিন্তু ইমাম গাজালি সময়ের মোহে এবং অবস্থানের বৃত্তে আগাগোড়া বন্দী হয়ে ছিলেন। তাই তিনি

৬৫. ইবনুল জাওযী,*তালবিসু ইবলিস*(বৈরুত: দারুল ফিকার,প্রথমপ্রকাশ,১৪২১হি.),পৃ.১৪৯

৬৬. মারেফাতের গোপন রহস্য

Dhaka University Institutional Repository

তাছাউফের কার্যক্রমে জড়িত হতে পারছিলেন না। একদিকে খ্যাতি ও পার্থিব বিলাসের আকর্ষণ, অপরদিকে তাযকিয়াতুন নফসের সুমহান আদর্শ- এই বিপরীতমুখী অবস্থানের ব্যবধান ছিল এমনই প্রকট, যেন-

فشتان بينهما

"এতদুভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য"।[৬৭]

অবশেষে তিনি একবস্ত্রে বাগদাদ ত্যাগ করেন। কঠিন আত্মানুশীলন ও রিয়াজত সাধনার পর তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেলেন। এই ঐকান্তিক সাধনার পরিণতি হিসেবে তিনি এমন এক স্থানে উপনীত হলেন, যেখানে আল্লাহপ্রেমে বিলীন হয়ে পার্থিব সকল কিছু বিস্মৃত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ইমাম গাজালি আবিস্কার করলেন যে-মহাসত্যের, তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে, এবং মানুষের চারিত্রিক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায়। তৎকালীন সমাজ ও সমাজব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেলেন, রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে, আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই চারিত্রিক অধঃপতনে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। আলেম সমাজ- যারা হবেন মানুষের জন্য সত্যপথের সন্ধানদাতা, তারাই সম্পদ ও ক্ষমতার মোহে লিপ্ত।[৬৮]

মানুষের এরূপ মর্মান্তিক অবস্থা দর্শনে ইমাম গাজালি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারলেন না। এহয়াউল উলুমের ভূমিকায় তিনি লিখেন-'আমি দেখতে পেলাম, পৃথিবী জুড়ে মানুষ চারিত্রিক স্খলনজনিত এক ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে এবং আখেরাতের সৌভাগ্যলাভের পথ তাদের জন্য রুদ্ধ! যারা সঠিক অর্থেই সত্যপথের দিশারী, সেই মহান আলেমগণ ইতিমধ্যে বিগত হয়েছেন। অবশিষ্ট যারা আছেন, তারা মূলতঃ কাজে নয়; নামেই আলেম হিসেবে খ্যাত। - এই শ্রেণীর আলেমগণ ইলমকে তিন প্রকার কর্মের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।[৬৯]

প্রথমতঃ মুনাযারা বা জ্ঞান-বিতর্ক। অর্থাৎ ইলম দ্বারা প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক খন্ডন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস- যা ছিল এক প্রকার অহংকার প্রকাশের মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ ওয়াজ ও উপদেশ প্রদান, যা থাকত চটুল বাক্যে পরিপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ ফতোয়া প্রদান, যা ছিল বিভিন্ন মোকাদ্দামা সমাধানের মাধ্যমে নিজস্ব পান্ডিত্ব জাহিরের সহজ পথ। ইলম দ্বারা এসব কর্ম ছাড়া ও যে আখেরাতের জ্ঞান ও পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে- আলোচ্য আলেমদের কারণে সাধারণ মানুষ তা একেবারেই ভুলে যেতে বসেছিল। এ ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না।

ইমাম গাজালি কিতাবটিতে যে সমস্ত শিরোনাম নির্বাচন করেছেন তা, একেবারে নতুন ও অভিনব নয়। কিতাবের ভূমিকায় তিনি লিখেন-এ বিষয়ে অনেক কিতাব ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে। তবে, আমার কিতাবের যে বৈশিষ্ট্য,তা নিম্নরূপ-

- ইতিপূর্বে লিখিত অস্পষ্ট বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ।
- বিভক্ত বিষয়গুলোর নতুন বিন্যাস।

৬৭. ফারসি প্রবাদ
৬৮. ইবনুল জাওযী: প্রগুক্ত,পৃ.১৫০
৬৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

- দীর্ঘ বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন।
- বক্তব্যের পূণরুক্তি বর্জন।
- সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ব্যবচ্ছেদে, যা ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

ইমাম গাজালি তাঁর অতুলনীয় দিয়ানতদারী ও আত্মবিলোপের কারণে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন যে, কোন্ কোন্ কিতাবের অনুকরণে উক্ত কিতাবটি লেখা হয়েছে। যে কয়টি কিতাবের প্রতি তিনি ইংগিত করেছেন, তা এই-

- রেসালায়ে কুশাইরিয়া।
- আবু তালেব মক্কী রচিত কুতুল কুলুব।
- রাগেব ইস্পাহানী[৭০] রচিত জারিয়া ইলা মাকারিমিশ শারীয়া।

অনুচ্ছেদ-৫

এহয়াউল উলুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

যে-কয়টি বৈশিষ্ট্যের কারণে এইয়াউল উলুম সমকালীন ও সর্বকালীন দর্শন শাস্ত্রের রচনা সমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, নিম্নে আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

প্রথম যে-বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে জ্ঞানী, সাধারণ শ্রেণী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত তথা সমাজের সর্বমহলে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, তাহল, গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন রয়েছে হিকমত ও প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ, অপরদিকে রয়েছে আহবান ও উপদেশমূলক বর্ণনা। লেখা ও বক্তৃতায় দুটি বিপরীতমুখী বিষয়ের সমন্বয়সাধন কঠিন ও জটিল কর্ম সন্দেহ নেই। একজন বক্তা সমবেত শ্রোতামন্ডলীকে অভিভূত করতে পারেন তার যাদুকরী বাকশৈলীর মাধ্যমে, কিন্তু এতে গবেষক শ্রেণী বোধ করেন না বিন্দুমাত্র আকর্ষণ।[৭১]

পক্ষান্তরে, একজন গবেষক যখন তার সূক্ষ্ম গবেষণা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন, তখন সুশীল বিদগ্ধ মহল আত্মতৃপ্তিতে মুগ্ধ হলেও; সাধারণ শ্রেণীর পাঠক মহল তাতে অনুভব করেন না বিন্দুমাত্র অনন্দআকর্ষণ। এ জাতীয় আলোচনায় তারা সর্বদাই নিরাসক্ত। ইমাম গাজালি এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনে সফল হয়েছেন অত্যন্ত স্বার্থকভাবে। এই অতুলনীয় বিষয়টি ঘটেছে এহয়াউল উলুম নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থে। তার রচনায় বিষয় উপস্থাপনা অত্যন্ত সহজ হওয়া সত্ত্বেও, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম-নীতি তাতে লঙ্ঘিত হয়নি কোনভাবেই। এ কারণে দার্শনিক ইমাম রাজীর নিকট তা যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একজন সাধারণ বক্তার জন্য তা সর্বব্যবহারযোগ্য একটি আদর্শ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

ইমাম গাজালির যুগে এই ধারণা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল , দর্শন কিংবা দর্শন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়, তা বর্ণনার দিক থেকে যেমন দুর্বোধ্য; বিষয়-বস্তুর বিচারে তেমনি তা নিরস ও আকর্ষণহীন। আবু আলী ইবনে সীনা তার জটিল উপস্থাপনা ও বর্ণনার মাধ্যমে দর্শনকে মানুষের কাছে পরিণত করে দিয়েছিলেন এক অপার রহস্যে। এ জাতীয় রসশূন্যতার কারণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করতে পারি।[৭২]

---

৭০. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রগুক্ত,পৃ.৭৮
৭১. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রগুক্ত,পৃ.৭৯
৭২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ দর্শনের বিষয়গুলো সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে থাকে। গ্রীক-সভ্যতার যুগ থেকেই এ ধারণা প্রচলিত ছিল, দর্শনকে কখনো সাধারণের বোধগম্য করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষ এ সমস্ত বিষয় বোঝার মত ক্ষমতাই রাখে না।

দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য আরো যে কয়টি শাখা রয়েছে, সে তুলনায় নীতি বিষয়টি অধিক সহজ ও বোধগম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যারা গ্রন্থ লিখেছেন, তারা বিষয়টি মোটেই সহজরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নি। ইমাম গাজালি দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি, যিনি নীতি-দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো অত্যন্ত সাবলীল ও সহজবোধ্যরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তুলনামূলক আলোচনার জন্য আমরা ইবনে মিসকাওয়ার রচিত 'কিতাবুত তাহারাত' এবং ইমাম গাজালির কিতাবের তাহারাত অধ্যায় পর্যালোচনা করতে পারি। কিতাবুত তাহারাতের ক্ষেত্রে পাঠক সর্বোচ্চ মেধা ও মনোযোগ ব্যয়ের মাধ্যমে লেখকের উদ্দেশ্যের সাদামাটা মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হবেন। পক্ষান্তরে এইয়াউল উলুম পাঠে মনে হবে, পাঠক পাঠ করছেন কোন চিত্তাকর্ষক ঘটনা। কেবল উদ্দেশ্য অনুধাবনই নয়, বরং লেখকের বক্তব্য পাঠ করে পাঠকের মনে সুমধুর ঝংকার সৃষ্টি হয়ে তা মনে অঙ্কিত হয়ে থাকবে দীর্ঘ দিন।[৭৩]

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

নীতি শিক্ষায় দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ভুল পন্থা চলে আসছে , তাতে মানুষের স্বভাব ও রুচি বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। যিনি মনুষ্য সংসার বর্জনে বিশ্বাসী, তিনি পৃথিবীর সকলকে সংসারত্যাগী দেখতে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে যিনি সামাজিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও একতাবদ্ধতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত, তিনি সকলকে নিষ্ঠাবান দেখতে পছন্দ করেন এই আদর্শের প্রতি। এই ধরণের একতরফা শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক উন্নতি বিধানে কখনো ফলদায়ক হয় না। মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম দিকটি দর্শন রচনায় ইমাম গাজালিই সর্বপ্রথম স্বার্থকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।[৭৪] ইমাম গাজালির মূলনীতি ছিল, নীতি শিক্ষায় মানুষের রুচি-বৈচিত্র্যের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা। তিনি মনে করতেন, সামাজিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতায় যিনি অনুরাগী, তাকে কখনোই সংসারত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা সঙ্গত হবে না। তাকে বরং সামাজিক জীবনের মূলনীতি ও সহজাত গুণের প্রতিই চালিত হবার উপাদান অবহিত করতে হবে। আত্মীয়তা রক্ষা, মানুষের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা প্রদান এবং সৎপথে হেদায়েত- এগুলিই হবে তার সাথে আলোচনার বিষয়। অপরদিকে সংসারত্যাগ ও সংসার বর্জন যার সহজাত প্রকৃতি, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সে পথেই। আধ্যাত্মিক মোজাহাদার এমন মূলনীতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হবে, যাতে সে জীবন-ধারণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে চালিত হতে পারে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

ইমাম গাজালি সমাজ ও নীতি নির্মাণের ভিত্তি সর্বাংশে ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপরই প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ কারণেই প্রতিটি শিরোনামে তিনি সর্বপ্রথম শরীয়তের বর্ণনা দ্বারা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তার লেখায় দলিল-প্রমাণ হিসেবে শরীয়তই মৌলিক। কিন্তু তিনি শরয়ী হুকুমের ক্ষেত্রে রেসালাত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। রাসূলের কোন আদর্শটি রেসালাতের সাথে সম্পর্কিত, সমাজের ভাবধারার সাথে সম্পর্কিত কোনটি, তা তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

---

৭৩. প্রাগুক্ত

৭৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'পানাহারের শিষ্টাচার' অধ্যায়ে তিনি খাদ্য গ্রহণের নিয়ম উল্লেখ করে বলেছেন, দস্তরখানে আহার গ্রহণ করা উচিত। চেয়ার-টেবিলে বসে আহার করা উচিত নয়। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি হযরত আনাস (রঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চেয়ার-টেবিলে বসে আহার করেন নি। অতঃপর পূর্ববর্তী উলামাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর চারটি নতুন বিষয় বিদআত হিসেবে সমাজে চালু হয়েছে।

- চেয়ার-টেবিলে বসে আহার গ্রহণ
- চালুনী ব্যবহার
- উশনান[৭৫] ঘাস ব্যবহার
- উদরপূর্ণ আহার গ্রহণ

এরপর তিনি লিখেন- দস্তরখানে আহার করা উত্তম। কিন্তু এর মানে এ নয়, উঁচু স্থানে বসে আহার করা মাকরূহ বা হারাম। কেননা, এর স্বপক্ষে শরিয়তের কোন হুকুম নেই।

পক্ষান্তরে, টেবিল নতুন সৃষ্ট বস্তু হিসেবে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত কিনা, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। কেননা, নতুন সষ্ট বস্তুমাত্রই বিদআত হিসেবে নাজায়েজ নয়। বিদআত তখনি নাজায়েজ হবে, যখন তা বিবেচিত হবে সুন্নতের খেলাফ হিসেবে । কিংবা তা পালনে শরীয়তের অন্য কোন হুকুম আদায়ে বেঘাত সৃষ্টি হবে।

অন্যথায়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন সময়ে নতুন সৃষ্ট বিষয়, তথা বিদআত মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় হয়ে থাকে । টেবিল-চেয়ার ব্যবহারে খাদ্যগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সুবিধা হয়ে থাকে। এটা অবৈধ নয় কোনভাবেই। যে চারটি বিষয়কে বিদআত বলা হয়েছে, তা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বসময়ে একই হুকুমের অন্তর্গত নয়।[৭৬]

উশনান এক প্রকার ঘাস, যা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় হাত ধোয়ার কাজে। সন্দেহ নেই, দুর্গন্ধমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে হাত ধোয়া একটি উত্তম কাজ। শরীয়তে খাবারের পর হাত ধোয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে পারে।[৭৭] সুতরাং হাত ধোয়ার কাজে উশনান ব্যবহার করায় কোনরূপ বিধি-নিষেধ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উশনান ব্যবহার হত না। এর কোন প্রচলন ছিল না, কিংবা তখন তা সহজলভ্য ছিল না। অথবা, তৎকালীন সাহাবীগণ দ্বীনের কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, এমনকি তারা হাত ধোয়ার সময় পেতেন না। কাপড়ে হাত মুছে নিতেন। সুতরাং, এ থেকে এই সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না , পরিচ্ছন্নরূপে হাত ধোয়া মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় নয়। ইমাম গাজালি যে-ধরণের আদব বা শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করেছেন, তা এশিয়া অঞ্চলের প্রচলিত শিষ্টাচারের তুলনায় অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭৮]

---

৭৫. ইমাম আয-যাহাবী: প্রগুক্ত, খ. ৩৭, পৃ.৩০১

৭৬. ইমাম আয-যাহাবী: প্রগুক্ত, খ. ৩৭, পৃ.৩০২

৭৭. প্রাগুক্ত

৭৮. ইসলামি বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ: প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৮-৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ স্বরূপ- আহারের শিষ্টাচার বর্ণনায় তিনি বলেছেন, খাবার কোন উঁচু স্থানে রেখে গ্রহণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে খাবার সামনে উপস্থিত করবে। প্রথমে তরল জাতীয় হালকা খাবার আনবে। অধিকাংশ মেহমান উপস্থিত হলে এক দু'জনের জন্য অপেক্ষা করবে না। খাবার শেষে মিষ্টি জাতীয় কিছু পরিবেশন করবে।
একই পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে, কেউ কেউ খাবারের মেনু কাগজে লিখে মেহমানের সামনে উপস্থিত করে থাকে এবং মেহমান তার পছন্দমত খাবার বেছে নেন। তার ভাষায়

ويحكي عن بعض أهل المروات أنه كان يكتب نسخة بما يستحضر من
علي الضيفان- الألوان و يعرض

এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইউরোপের 'কার্ড অব টেবিল' সংস্কৃতি মুসলিম। সভ্যতা থেকে ধার করা। সমাজ আলোচনার পঞ্চম শিষ্টাচারে তিনি লিখেছেন, কারো সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া আরবের প্রথা নয়। তাই সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে দাঁড়াতেন না। হযরত আনাস (রঃ) থেকে এর স্বপক্ষে এ ধরণের রেওয়ায়েত দেখতে পাই। কিন্তু এই প্রথার ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নি। সুতরাং, যে সমস্ত দেশে দাঁড়ানোর প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানে এই প্রথা পালনে কোন বাধা নেই। কেননা, এতে উদ্দেশ্য থাকে সম্মান প্রদর্শন। এ জাতীয় অন্যান্য রেওয়াজ ও প্রথার ক্ষেত্রে একই হুকুম। তবে যে-সমস্ত ক্ষেত্রে শরীয়তের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেখানে দেশীয় প্রথা বর্জণীয়।[৭৯]

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

এশিয়া অঞ্চলের মানুষের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী, একজন আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের ধারণা এই যে, মানুষ নম্র, ভদ্র ও সহনশীল হবে। শত্রুর প্রতিশোধ নেবে না। কটু কথায় রাগান্বিত হবে না। অযথা হট্টগোল পরিহার করবে। লজ্জাবনত, অল্পেতুষ্ট, আল্লাহর উপর ভরসাকারী এবং মানুষের সাথে মিলিত হবে বিনম্র ভাষ্যে। মোটকথা, একজন আদর্শ মানুষের গুণ হবে আত্মগত আভ্যন্তরীন সক্রিয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত।[৮০]
অপরদিকে উন্নত বিশ্বে সভ্য জাতিগুলোর মাঝে আদর্শ মানুষের গুণাবলীর এ ধারণা প্রচলিত মানুষ হবে বেপরোয়া মনোভাবের অধিকারী, মুক্ত-স্বাধীনচেতা ও সাহসী, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও ভবিষ্যতের আশায় উজ্জীবিত। জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বৈধ সকল প্রকার ভোগবিলাস গ্রহণকারী যিনি, তিনিই হতে পারেন মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, জীবনযুদ্ধের সর্বাঙ্গনে আত্মশক্তিতে বলিয়ান ও সক্রিয় প্রতিযোগীই হতে পারেন মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।
উভয় প্রকার গুণাবলীই স্বস্থানে যথার্থ ও প্রশংসার দাবীদার। একটির গতি ও লক্ষ্য, মানুষের আত্মার একান্ত নিজস্ব উন্নতির দিকে এবং অপরটির মুক্ত-স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দুর্জয় শক্তি প্রকাশের দিকে। তবে, কোন জাতির মাঝে যদি কেবল প্রথম গুণাবলীই থাকে, তাহলে তার পক্ষে উত্তরোত্তর উন্নতি ও সফলতা লাভ সম্ভব হবে না কোনভবেই। আমাদের ক্রমশ অধঃপতন ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ, দেশের কবি-সাহিত্যিক, বক্তা তথা জাতির

৭৯. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রগুক্ত,পৃ.৭৮
৮০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভাব নির্মাতারা তাদের নীতির শিক্ষাদানে উজ্জীবিত মনোভাব, দুরন্ত সাহসিকতা, বীরত্ব, প্রতিজ্ঞা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন না। এহয়াউল উলুম উল্লেখিত ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তাতে প্রতিজ্ঞা, অটলতা, শৌর্য-বীর্য, ও স্বাতন্ত্র্যবোধ-এই শিরোনামে কোন পরিচ্ছেদ নেই। তবে, যেখানে চরিত্রের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে এ বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে , মানুষ যেন সংসার-ধর্মে বিরাগী, নিরস, শুস্ক ও হিম্মতহারা না হয়ে পড়ে।[৮১]

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ভ্রমন, শারীরিক ব্যায়াম, ও পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা সম্পর্কে তার মতামত এই যে, খেলাধুলা ও হাস্য-ফুর্তি মানুষকে আনন্দ দেয়, এবং মানসিক অবসাদ দূর করে স্বতঃস্ফুর্ত ও সতেজ রাখে। মানুষের মন অবসাদগ্রস্ত হওয়ার দরুন কখনো তা অচল ও নিস্কর্ম হয়ে পড়ে, এবং কর্তব্যকর্মে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সুতরাং মনকে অবসাদমুক্ত ও প্রফুল্ল রাখা একান্ত আবশ্যক। যে-ব্যক্তি রাত-দিন এবাদতে নিমগ্ন থাকে, তারও উচিত কিছু সময় নিশ্চুপ বসে থাকা এবং কোন কাজে ব্যস্ত না হয়ে নিজেকে প্রফুল্ল রাখা। স্থিরকর্মহীন সময় তাকে নতুনভাবে এবাদত পালনে অনুপ্রাণিত করবে। খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ মানুষকে স্বতঃস্ফুর্ত ও সতেজ রাখে।[৮২]

যে-স্থানে তিনি স্বল্প আহারের ভাল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে। এও লিখেছেন, আমরা স্বল্প আহারের মাধ্যমে অভুক্ত থাকার নানাবিধ উপকারিতা তুলে ধরলাম। এ থেকে কেউ ধারণা করতে পারে , যত বেশি অভুক্ত থাকা যায়, ততই বুঝি কল্যাণকর। এ ধারণা কখনোই সঠিক হতে পারে না।' শরীয়তের একটি মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের প্রবৃত্তি যে বিষয়ের প্রতি অধিক আকৃষ্ট, এবং যার ফলে মানুষের পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী, সেক্ষেত্রে ও শরীয়ত এক ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমাল অনুমোদন করে অতি বাড়াবাড়িকে নিরুৎসাহিত করেছে। অধিক আহারের প্রতি প্রবৃত্তির প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, শরীয়তের পক্ষ থেকে ক্ষুধার্ত থাকার উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন নয়; ভারসাম্য বজায় রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্য।[৮৩]

চরিত্র সংশোধনের অনুকুল আলোচনায় ইমাম গাজালি লিখেন, 'মানুষের স্বভাব চরিত্র থেকে ক্রোধ-শক্তির আমূল উৎপাটন চরিত্র সংস্কারের উদ্দেশ্য নয়।। মানুষকে সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিনম্র আচরণের মাধ্যমে চরিত্রবান করাই বরং তার মূল উদ্দেশ্য। ক্রোধ সমূলে বিনাশ কোনভাবেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। স্বয়ং নবী (আঃ)-গণও ক্রোধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। মানুষের মত আমার মনেও ক্রোধ আসে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে যখন কোন অপ্রীতিকর ও কটু কথা বলা হত, তখন তার পবিত্র মুখমন্ডল রক্তবর্ণ হয়ে যেত। তবে, ক্রোধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ হতে কোন কথাই শোনা যেত না। এ কারণেই কোরআনে আল্লাহ তায়ালা الغيظ و الكاظمين অর্থাৎ- 'ক্রোধ দমনকারীগণ' বলেছেন।والفاقدين الغيظ 'ক্রোধ বিনাশকারীগণ' বলেননি।

---

৮১. Nicholson, Reynold Alleyne. (1966). "*A literary history of the Arabs*." London: Cambridge University Press. p. 382.
৮২. প্রাগুক্ত
৮৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার[৮৪] তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ শরীয়তের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা হুকুম। এই হুকুমের ব্যাপারে উলামাদের রায় ছিল, যে-ব্যক্তি সুলতানের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালনে নিয়োগপ্রাপ্ত, কেবল সেই তা পালন করবে। ইমাম গাজালি কঠিনভাবে এই রায় নাকচ করে দেন। তিনি লিখেন- প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। এই পরিচ্ছেদে ইমাম গাজালি অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি আব্বাসী খেলাফত ও অন্যান্য মুসলিম শাসকের আমলে মুসলমানদের সৎসাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে সম্পর্কের বড়-ছোটর তারতম্য রয়েছে- যেমন, পিতা-পুত্র, গোলাম-মনিব, উস্তাদ-শাগরিদ, বাদশা ও প্রজাসাধারণের সেখানে আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার' জায়েজ হবে কিনা, তিনি আলোকপাত করেছেন এ বিষয়েও ।

এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে তিনি উল্লেখ করেছেন জবাবদিহিতার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন, অনুসন্ধান, ঘোষণা, ওয়াজ, ও উপদেশ প্রদান, কঠোরতা আরোপ, ভৎর্সনা, ভীতি প্রদর্শন ও হস্তক্ষেপ- ইত্যাদি। সাধারণ শ্রেণীর ক্ষেত্রে এ সমস্ত স্তর ব্যবহার বিধিসম্মত হলেও উস্তাদ ও তার সমস্ত অনুসারী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে কেবল দুটি পন্থাই রয়েছে-অবহিত করা ও উপদেশ প্রদান।

এশিয়া অঞ্চলের চরিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যাটি হল, তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্ট থাকার গুণাবলী অর্জন। এ দুটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির দরুন সমগ্র এশিয়া, বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে অসহনীয় পঙ্গুত্ব ও তুচ্ছতায় আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী এখনো এ ধারণা পোষণ করে যে, 'অল্পেতুষ্টিতার মানে হল, জীবন ধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনও পরিত্যাগ করা। মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। কেননা, তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা। মানুষের রিজিক পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তার। সুতরাং রিজিকের অন্বেষণে মানুষকে ব্যস্ত থাকতে হবে না। এই দর্শনের ফলে অসংখ্য মানুষ আজ অথর্ব ও রিক্ত-হস্তে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক এবং এক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত চিন্তার ক্ষেত্রে বড় ধরণের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই ইমাম গাজালি যুক্তি-প্রমাণসহ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি 'اعمال المتوكلين' নামে যে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,[৮৫] তার সূচনা করেছেন এভাবে-

"ইলম মানুষের মনে একটি অবস্থার জন্ম দেয় এবং সেই অবস্থা থেকেই মানুষের জীবন নির্বাহে বহুবিধ কার্যক্রমের উৎপত্তি। কিছু মানুষ মনে করে, তাওয়াক্কুলের অর্থ হল, সকল উপায় পরিত্যাগ করে নির্জীব পদার্থের ন্যায় পড়ে থাকা। আল্লাহ নিজ কুদরতে তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এটা নিছক মূর্খ লোকদের বিশ্বাস। এই ধারণা পোষণ করা শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী।"

"তাওয়াক্কুলের[৮৬] স্বরূপ ও বাস্তবতা নিয়ে ইমাম গাজালি অতি সূক্ষ্ম ও পূর্ণাঙ্গ একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। তাওয়াক্কুলের মর্ম উদ্ধারে তিনি যে-বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা এক কথায় অভিনব ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি লিখেছেন- তাওয়াক্কুল মূলতঃ তাওহীদের[৮৭] অপর নাম। তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের উপর সর্বান্তকরণে বিশ্বাস স্থাপন করে মানুষ যখন, তখন কাজে-কর্মে যে নতুন অবস্থ ও ভাবের জন্ম নেয়, তার নামই তাওয়াক্কুল। তাওহীদের চারটি স্তর রয়েছে। যথা-

---

৮৪. সুবকী, তাজুদ্দিন ইবন আলী: *ত্বাবাকাতুশ শাফিয়াহ আল কুবরা* (হাজর, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩হি.) খ. ৬, পৃ. ১৯৩-১৯৪

৮৫. সুবকী, তাজুদ্দিন ইবন আলী: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

- মৌখিক স্বীকৃতি
- অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন।
- কাশফ তথা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি দ্বারা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার ক্রিয়াশীলতার ব্যাপারে বিশ্বাস লাভ। অর্থাৎ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির মাধ্যমে এই উপলব্ধি করা , যাবতীয় কার্যক্রম একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য শক্তি বলেই পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বাহ্যিক উপকরণের স্থান বা প্রভাব নেই।
- আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব নেই- এই চিরন্তনশাশ্বত সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

প্রথম দুটি স্তরের সাথে তাওয়াক্কুলের কোন সম্পর্ক নেই। তৃতীয় স্তর থেকেই মূলতঃ তাওয়াক্কুলের উৎপত্তি ও সূচনা। অর্থাৎ কাশফ-শক্তির মাধ্যমে মানুষের যখন এই জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ হয়, পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল যা কিছু, তার একমাত্র প্রতিবিধানকারী আল্লাহ তায়ালা, উপায়-উপকরণ এখানে অকার্যকর ও প্রভাবশূণ্য। যেমন, বাদশাহ শাহী ফরমান জারী করেন, এবং কাগজ-কলম দ্বারা সেই ফরমান প্রচার করা হয়। এখানে মানুষ কাগজ-কলমকে মূল-কর্তা বলবে না; বরং বাদশাহকেই এই আদেশের মূল-ব্যক্তি বলবে। তদ্রুপ, মানুষ যখন এই অবস্থানে উপনীত হয়, তখন বাহ্যিক ও স্থূল উপায়-উপকরণ থেকে তার দৃষ্টি ফিরে যায়। এই অবস্থানে স্থিরতা লাভ করার পর সে যা বলে, একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলে।

যা কামনা করে, তা আল্লাহর কাছেই করে। এর নামই তাওয়াক্কুল বা সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা। ইমাম গাজালি তাওয়াক্কুলের যে-অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা একপ্রকার 'ওয়াজদী অবস্থা যা আধ্যাত্মিকতার অঙ্গনে বিচরণকারী ব্যক্তিরাই কেবল অনুভব করতে পারেন। যিনি এই স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম, তাকে অবশ্যই বাহ্যিক ও স্থূল সকল উপকরণ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হতে হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে যারা তাওয়াক্কুলের দাবীদার, তারা এ ধরণের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবগত। ইমাম গাজালি উপায়-উপকরণ পরিত্যাগকে তাওয়াক্কুলের আওতাভুক্ত মনে করতেন না। উপায়-উপকরণ তার মতে তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

- আবশ্যকীয় প্রয়োজন।
- কখনো কখনো প্রয়োজনীয়।
- কখনো প্রয়োজনীয়, তবে সম্ভাব্য। যে প্রয়োজন অকাট্য, তা থেকে বিমুখ হওয়া বিধিবহির্ভূত। এরূপ বিমুখতা স্পষ্ট উম্মাদনা ও বিভ্রান্তিপ্রসূত। অকাট্য প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনভাবেই তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তুমি যদি এ আশায় বসে থাক যে, আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমার নিকট খাদ্য পৌঁছে দিবেন কিংবা খাদ্যকে তোমার নিকট পৌছার শক্তি দিয়ে দিবেন, অথবা তোমার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, তাহলে বলতে হবে, পৃথিবীতে প্রচলিত ও পরিচালিত আল্লাহর অমোঘ বিধান সম্পর্কে তোমার এখনো প্রাথমিক ধারণা লাভই হয়নি।

তিনি লিখেছেন, যে-উপকরণ কখনো কখনো প্রয়োজনীয়, তা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। একারণেই প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরত খাস (রঃ) সফরে সূচ, সুতা, কাচি, রশি, এবং মশক সাথে রাখতেন। অবশ্য যে-উপকরণ সম্ভনাময়, তা থেকে বিমুখ থাকাই সংগত। কেননা, যা কদাচ প্রয়োজনীয় হতে পারে, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়া

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এ আলোচনায় অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন, খানকায় অনুক্ষণ সময় যাপন করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তবে কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা না করে যদি কেবল হাদিয়া-তোহফার উপর নির্ভর করা যায়, তাহলে, তা ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রে লোক সমাজে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত বিষয়টি তাওয়াক্কুলের অর্ন্তভুক্ত থাকবে। কেননা, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর তো সাধকের আস্তানা বাজারে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। তখন সেখানে হাদিয়া-উপঢৌকনের স্তুপ পড়ে যাবে এবং মানুষ হাদিয়া প্রদানে হুলুস্থুল কান্ড বাধিয়ে ফেলবে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাওয়াক্কুলের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার মতে, যে ব্যক্তি অন্যের উপার্জিত বস্তু অকারণে গ্রহণ করে, সে কখনো তাওয়াক্কুলকারী হতে পারে না।[৮৮]

ইমাম গাজালির মতে, যা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী, দরিদ্র, ও ভিখারী হতে শিক্ষা দেয়, তা কখনো তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এহয়াউল উলুমের নীতি-দর্শন

এহয়াউল উলুমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার পর এ-স্থানে আমরা তার উদ্ভাবিত নীতি-দর্শন সম্পর্কে আলাচনা করতে চাই। ইমাম গাজালি নীতিদর্শন ব্যাখ্যার নীতিমালায় গ্রীক দর্শনের আচরিত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নীতি-দর্শনের উপর লিখিত প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে মিসকাওয়ার 'তাহজীবুল আখলাক' গ্রীক দর্শনের আচরিত নীতিমালারই অনুলিপি। ইমাম গাজালি এহয়াউল উলুমের সূচনা পর্বে চরিত্রের তাৎপর্য, স্বরূপ, বিভাগ, ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মূলতঃ ইবনে মিসকাওয়ার তাহজীবুল আখলাক'কে সামনে রেখে। خُلُقٌ তথা মানব চরিত্র সম্পর্কে ইমাম সাহেবের দীর্ঘ আলোচনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

خُلُقٌ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, خُلُقٌ [৮৯] এবং خَلْقٌ হচ্ছে সমার্থ-শব্দ, অধিকাংশ স্থানে শব্দ দুটি একই সাথে ব্যবহৃত হয়। আমরা বলে থাকি; লোকটি, বা অমুক ব্যক্তি خُلُقٌ এবং خَلْقٌ উভয় দিক থেকেই উত্তম। অর্থাৎ তার বাহ্যিক আচার-আচরণ যেমন উত্তম, তেমনি অন্তরলোকও পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত।

মানুষ মূলতঃ দুটি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। দেহ এবং আত্মা। দেহের যেমন একটি রূপ ও আকৃতি আছে, তদ্রুপ আত্মারও আছে একটি অবয়ব। বাহ্যিক দেহগত রূপ-সৌন্দর্যের ফলে মানুষ যেমন সুন্দর-অসুন্দর হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় সুদর্শন বা কুদর্শন, তেমনি আত্মগত স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতার বিচারে সচ্চরিত্রের দ্বারা নন্দিত ও অসচ্চরিত্রের দ্বারা নিন্দিত হয়।[৯০]

যুক্তি-শাস্ত্রে চরিত্রের সংজ্ঞা ও বিভাগ

যুক্তি-শাস্ত্রের নীতিমালা অনুসারে চরিত্রের সংজ্ঞা হল, আত্মায় স্থিত শক্তির মাধ্যমে মানুষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাল অথবা মন্দ কাজ প্রকাশ পাওয়া। এই সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় রয়েছে-

- শক্তি
- স্থিতি
- ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ

৮৮. প্রাগুক্ত (অনুবাদের সামান্য পরিবর্তনসহ)
৮৯. خلق শব্দটি اخلاق এর এক বচন
৯০. প্রাগুক্ত (অনুবাদের সামান্য পরিবর্তনসহ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমটির উদ্দেশ্য হল, কারো মাঝে যদি স্বভাবগতভাবেই দানশীলতার গুণ থেকে থাকে, এবং সে বদান্যতা ও অর্থব্যয়ের কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু অর্থস্বল্পতা কিংবা অন্য কোন জটিলতার কারণে অর্থ ব্যয়ে সক্ষম না হয়, তাহলে তার দানশীলতার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। কেননা, خلق -এর অস্তিত্বের জন্য ক্রিয়ার প্রকাশ জরুরী নয়। শর্ত কেবল এতটুকু , সুযোগ ও শক্তি থাকা অবস্থায় তা থেকে পিছু না হটা, এবং সতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পাওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টির উদ্দেশ্য হল- ব্যক্তি যদি কখনো ভাল কাজ করে, এবং তা স্বভাব ও অভ্যাসগত না হয়, তাহলে এটাকে তার চরিত্রের অংশ বলে ধরা হবে না। কেননা, এই কাজের শক্তিকে আত্মায় স্থিত শক্তি বলা যায় না। বরং তা আকস্মিকভাবে, তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতীতই কাজে এসেছে।

তৃতীয় বিষয়টির উদ্দেশ্য হল- ব্যক্তি যদি আত্মার সাথে বাধ্যতামূলক ক্রোধকে দমন করে, তাহলে তাকে সহনশীল বলা যাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সহনশীলতা তার স্বভাবজাত নয়।

خُلُقٌ-এর অনেক বিভাগ রয়েছে। তবে যে-কয়টি মৌলিক বিভাগ থেকে অন্য সকল বিভাগের উৎপত্তি, তা তিন প্রকার। যথা-

- জ্ঞান।
- ক্রোধ ।
- কু-প্রবৃত্তি

এই তিন প্রকার শক্তি যখন ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় পরিচালিত হবে, তখন তাকে বলা হবে حُسْنُ الْخُلُقِ বা সচ্চরিত্র। কারো মাঝে যদি এই তিন প্রকার শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় প্রতিভাত হয়, তাহলে তাকে বলা হবে সচ্চরিত্রবান। কিন্তু একটি বা দুটি পাওয়া গেলে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যদি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অধিকার করতে পারে, তাহলে সেই অবস্থাকে বলা হবে হিকমত বা প্রজ্ঞা। আখলাকের ক্ষেত্রে হিকমত এক প্রকার কেন্দ্র-শক্তি। অপরদিকে ক্রোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি অতি-উগ্র কিংবা অতিশিথিল মনোভাব বর্জন করে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অবলম্বন করতে পারে, এবং বিবেকের অধীন হয়, তাহলে তাকে বলা হবে সৎসাহসিকতা। সাহসিকতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। কখনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্নতা ও বীরত্বে, এবং কখনো স্বাধীন মনোভাবে। আবার কখনো সহনশীলতা, স্বাতন্ত্র, অটলতা এবং গাম্ভীর্য।[৯১]

মানুষের ক্রোধশক্তি যখন ভারসাম্যরেখা অতিক্রম করে হঠকারিতায় ধাবিত হয়, তখন তাকে বলা হয় অবিচার ও বেপরোয়া মনোভাব। এ ধরণের মনোভাব ধীরে ধীরে আত্মপ্রতারণা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মপূজার জন্ম দেয়।পক্ষান্তরে ক্রোধ-শক্তি যখন একেবারে শিথিল হয়ে যায়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় লাঞ্ছনা, অবমাননা ও হানীকর অবস্থার জনক। কু-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যখন স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতে পারে, তখন তাকে বলা হয় পবিত্রতা। পবিত্রতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। উদারতা, লজ্জাশীলতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, ক্ষমা, অল্পেতুষ্টি, পরহেজগারী, সুশীল আচরণ, ও স্বভাব মাধুর্য- ইত্যাদি হয় তার প্রকাশিত রূপ। এই সকল গুণ যখন অতি-উগ্র কিংবা অতি-শিথিল হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় লোভ-লালসা, লজ্জাহীনতা, অপচয়, রিয়া, হিংসা-ইত্যাদি।[৯২]

---

৯১. সুবকী, তাজুদ্দিন ইবন আলী,*তবাকাতুশ শাফিয়াহ আলু কুবরা* (হাজর, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩হি.) খ.৬,পৃ.১৯৫

৯২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি যখন সঠিক পন্থায় পরিচালিত হয়, তখন মানুষের মাঝে সুবিবেচনা, উদার মনোভাব ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রত হয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতে যখন উগ্রতা দেখা দেয়, তখন স্বভাবে ধূর্ততা, প্রতারণা ইত্যাদি হীনতা প্রকাশ পায়। কিন্তু বুদ্ধি যদি শিথিল ও অথর্ব হয়ে পড়ে, তাহলে মানুষ বোধহীনতা, পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতা- ইত্যাদি বিকল চরিত্রে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, উত্তম চরিত্রের উপাদান ও বিভাগ তিনটি- হিকমত বা প্রজ্ঞা, সৎসাহসিকতা, ও পবিত্রতা। উত্তম চরিত্রের অন্যান্য সকল দিক এরই পরিবর্তিত ভিন্নরূপ।

ইমাম গাজালি চরিত্রের উল্লেখিত সংজ্ঞা ও বিভাগ নির্ধারণে দার্শনিক ইবনে মিসকাওয়ার সাহায্য নিয়েছেন। তবে, চরিত্র বিশ্লেষণে ইবনে মিসকওয়া তাহজীবুল আখলাক' গ্রন্থে যে মতামত ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, তার পরিমার্জিত প্রকাশ এহয়াউল উলুমে আমরা দেখতে পাই। সেখানে যা ছিল অস্পষ্ট ও নিরস, এখানে তা হৃদয়গ্রাহী ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

ইমাম গাজালি চরিত্রের সংজ্ঞা ও বিভাগ নিয়ে আলোচনার পর চরিত্রের আমূল সংস্কার সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করতেন মানুষ স্বভাবগতভাবেই দুষ্টু প্রকৃতির এবং অনিষ্টকর চরিত্রের অধিকারী। শিক্ষা ও একান্ত অনুশীলন তাকে সভ্য ও চরিত্রবান করে তুলতে পারে। কিন্তু দার্শনিক রয়কিন তা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবে প্রাকৃতিকভাবেই শিষ্ট ও ভদ্র। গ্যালন এই উভয় মত পরিহার করে বলেছেন, সমষ্টিগতভাবে মানুষ একই স্বভাবের অনুসারী নয়। কেউ দুষ্টু-প্রকৃতির, কেউ শিষ্ট-প্রকৃতির, এবং কারো মাঝে এই উভয় প্রকারের সমন্বয় সম্ভব। গ্যালনের মতে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সংস্কার ও পরিবর্তনের অনুকুল।[৯৩]

এরিস্টটল তার চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্র মানুষের স্বভাবের জন্মগত কোন অনুসঙ্গ নয়। এ সমস্ত কিছু শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রতিফল। অবশ্য শিক্ষা ও অনুশীলন অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের যোগ্যতার তারতম্য ঘটে থাকে। ইমাম গাজালি এরিস্টটলের মতামত গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন সৃষ্ট বস্তু দুই প্রকার-

- যা পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্ট এবং মানুষের কর্তৃত্বাধীন নয়। যেমন, চাঁদ, সূর্য ,আকাশ, ও পৃথিবী।
- যা অপূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। যেমন- শস্যদানা। মানুষ নিয়মিত পরিচর্যা দ্বারা একটি শস্যদানাকে পত্রপল্লবে সুশোভিত এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত করতে পারে।

মানুষের স্বভাব ও চরিত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে, সাথে সাথে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, সমগ্র মানব জাতি একই স্বভাবের অধিকারী নয়। কারো স্বভাব পরিবর্তনের অনুকূল,এবং শিষ্টাচারের শিক্ষা সহজে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, কারো স্বভাব হয়ত অশিষ্ট ও কঠিন । শিক্ষা গ্রহণে তার কোন ব্যস্ততা নেই। উল্লেখিত আলোচনার অনুরূপ চরিত্রের বিভাগ নির্ণয়ে দার্শনিকদের মাঝে ব্যাপক মতোবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।[৯৪]

যে-সমস্ত মানুষ মনে করেন, মানুষের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তনের কোন সম্ভবনা নেই, তাদের যুক্তি হল, পৃথিবীতে এমন একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না , যেখানে মানুষের স্বভাব থেকে ক্রোধ, জৈবিক চাহিদা, আত্মম্ভরিতা-

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি ত্রুটিসমূহ চিরতরে মুছে গেছে। এ কথার উত্তরে ইমাম গাজালি বলেছেন, আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয়, এ সমস্ত জৈবিক-শক্তি মানুষের স্বভাব থেকে চিরতরে মুছে যাবে। কেননা, এসমস্ত শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে জীবাত্মার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে। স্বভাব থেকে যদি ক্রোধশক্তি বিনাশ হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বিপক্ষ শক্তির ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। জৈবিক চাহিদা যদি না থাকে, তাহলে সমাজ থেকে বংশ বৃদ্ধির ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। নীতিদর্শনের মৌলিক বক্তব্য হল, এসমস্ত শক্তি মানুষের স্বভাবে সর্বদা বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু তাতে কখনো ভারসাম্য ক্ষুন্ন হবে না। এর সমর্থন আমরা কোরআনে পাই। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন الغيظ والكاظمين অর্থাৎ ক্রোধ শক্তিদমনকারীগণ'। বলেন নি, الغيظ والفاقدين অর্থাৎ ক্রোধ শক্তি বিনাশকারীগণ।[৯৫] এ বর্ণনায় ক্রোধ শক্তির অবদমনকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে- বিনাশকে নয়।

উক্ত আলোচনায় ইমাম গাজালি শিষ্টাচার অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ কয়েকটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, স্বভাব থেকে ত্রুটি বিমোচনের পূর্বে, ত্রুটি সম্পর্কে অবগতি লাভ আবশ্যক। তাই ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগতি লাভের রয়েছে চারটি পন্থা। যথা-

প্রথম পন্থাঃ সুলুকের ক্ষেত্রে যিনি মুর্শিদ, তার কাছে জেনে নেয়া।

দ্বিতীয় পন্থা ঃ নিষ্ঠাবান ও রিয়া হতে মুক্ত সাথী ও সহকর্মীর মাধ্যমে জানা। হযরত উমর (রাঃ) সর্বদা এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম ফায়সালা করুন, যে আমার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পন্থাটি উল্লেখ করার পর ইমাম গাজালি উল্লেখ করেন, দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই পন্থাটির যথাযথ ব্যবহার নেই। এ ক্ষেত্রে সহকর্মীরা হয়ত তোষামোদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কিংবা এমন কুৎসা রটাতে আরম্ভ করে, যার ফলে প্রকৃত দোষ চাপা পড়ে যায়। যে-ব্যক্তি ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়, মানুষ তাকে স্বভাবতঃ শত্রু অথবা হিংসুক ভেবে বসে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আমরা তাকে বলে দেই, এই দোষ তোমার মাঝেও আছে। এ জাতীয় মনোভাব নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হওয়ার পথে অন্ত রায় হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় পন্থাঃ নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগতি লাভের তৃতীয় পন্থা হল, শত্রুর আচরণ। আমাদের চোখে নিজের ত্রুটি ধরা না পড়লেও, শত্রুর চোখে তা অবশ্যই ধরা পড়বে। তবে, শত্রু ভালর জন্য নয়; কুৎসা রটানোর জন্য আবিস্কার করে থাকে ঐগুলো। শত্রুর আচরণ থেকে আমরা নিজের ত্রুটির ব্যাপারে সজাগ হতে পারি। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হল, নফসের প্ররোচণায় আমরা ভেবে থাকি-- শত্রু যা বলছে, তা আমাদের মাঝে কখনোই থাকতে পারে না।

চতুর্থ পন্থা ঃ মানুষের উত্তম আচরণ- ত্রুটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমাদের জন্য আয়না স্বরূপ হতে পারে। চরিত্রবান মানুষের সাথে উঠাবসার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারি।

উল্লেখিত চারটি পন্থার ক্ষেত্রে ইমাম গাজালি প্রথম দুটি গ্যালনের রচিত تعرف المرء عيوب نفسه [৯৬] থেকে গ্রহণ করেছেন। এবং চতুর্থটি মুসলিম দার্শনিক ইয়াকুব আল-কিন্দি কর্তৃক উদ্ভাবিত। যেহেতু মানব চরিত্র

---

৯৫. আল-কুরআন, ০৩:১৩৪

৯৬. ইমাম গাজালি: *এহইয়ায়ি উলুম আদ্দীন* (মহিউদ্দীন খান অনূদিত) (ঢাকা:মদিনা পাবলিকেশান্স, প্রথম প্রকাশ,রমজান-১৪০৭ হি.) খ.১,পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনযোগ্য, এবং তার মাধ্যম হল তরবিয়ত বা অনুশীলন- যা শিশু বয়সে প্রদানই যথাযথ; তাই ইমাম গাজালি এহয়াউল উলুমে শিশুদের চরিত্র-শিক্ষার নীতিমালা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হল।

শিশু যখন বোধ ও উপলব্ধির বয়সে উপনীত হবে, এবং তার মাঝে অনুভূত হবে বিবেচনা বোধের সূচনামাত্র, তখন থেকেই তার প্রতি হতে হবে বিশেষ মনোযোগী। শিশুর মাঝে সর্বপ্রথম জাগ্রত হয় খাদ্য গ্রহণের আকাঙ্খা।[৯৭] তাই খাদ্যাভ্যাসে শিষ্টাচার শিক্ষাই হবে তার প্রথম পাঠ। তাকে শেখাতে হবে, খাবার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। পাত্রের সম্মুখ থেকে নিয়ে খেতে হয় এবং দ্রুত নয়; খেতে হয় ধীরে ধীরে। তাকে বলতে হবে, খাবারের সময় অপরের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকবে না। খাবার চিবিয়ে খাবে। হাতা গুটিয়ে নিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিশুকে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধানে উৎসাহিত করবে। তাকে বোঝাতে হবে, রঙ্গীন রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য নয়; মহিলাদের জন্য। যে-শিশুরা এ ধরণের কাপড় পরিধান করবে, তাদের সাথে মিশতে দিবে না তাকে। বিলাসী জীবনযাপন যেন শিশুর অভ্যাসে পরিণত না হয়, সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ভাল কাজে শিশুকে উৎসাহিত করবে এবং সাহস দিবে। ভাল কাজের জন্য কখনো কখনো পুরস্কৃত করবে।

কখনো অসংগত কথা বললে না শোনার ভান করবে, যেন তা কাজে পরিণত করার সুযোগ না পায়। বিশেষতঃ শিশু স্বেচ্ছায় যখন গোপন করে। কথায় কথায় শিশুকে তিরস্কার করা উচিত নয়। একই কথা বারবার বললে শিশুর নিকট তার গুরুত্ব কমে যায়। দিনে ঘুমুতে বাঁধা দিবে। শিশুর বিছানা নরম ও কারুকাজ খচিত হওয়া উচিত নয়।[৯৮]

সবিশেষ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখবে, যেন শিশু গোপনে লুকিয়ে কোন কাজ করতে অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে। শিশুর মাঝে লুকিয়ে কাজ করার প্রবণতা যদি না থাকে, তাহলে তাকে অনেক মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিদিন হাঁটাচলা ও ব্যায়ামের নির্দেশ দিবে, তাতে শিশুর শরীর ও মন সতেজ থাকবে। দেহ অনাবৃত রাখতে বারণ করবে। শিশুর মনে ধন-দৌলত, বিত্ত-বৈভব, বাহারী পোশাক-আশাক, উত্তম খাবার ও আসবাব পত্রের গর্ব যেন কখনো না হতে পারে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা, কসম করার ব্যাপারে তাকে বারণ করবে। শিশুর সাথে কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কথা বলবে না। সে প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

অন্যের কথা মনোযোগের সাথে শোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল ও কঠোর আলোচনা পরিহারে নির্দেশ দিবে। যারা এরূপ গর্হিত আচরণ করে, তাদের সাথে মিশতে দিবে না তাকে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলার সুযোগ করে দিবে। কেননা, লাগাতার পড়াশোনা মেধাকে স্থবির, অকার্যকর, ও বিকল করে দেয়। চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং শিশু এক প্রকার গ্লানী অনুভব করে, স্বীকার হয় হীনম্মন্যতাবোধের।[৯৯]

ইমাম গাজালি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষার এই নীতিমালা ইবনে মিসকাওয়ার 'তাহজীবুল আখলাক' গ্রন্থে দার্শনিক ব্রোসেনের উদ্ভাবিত নীতিমালা থেকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত আলোচনায় তিনি শিশুদের অন্যের হাদিয়া গ্রহণে কঠোর নিষেধ। করেছেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, আমাদের বর্তমান যুগে ইসলামী মাদরাসাগুলো মানুষের দানের উপর ভিক্তি

---

৯৭. ইমাম গাজালি: প্রগুক্ত,খ.১,পৃ.২৫
৯৮. প্রাগুক্ত
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

করেই পরিচালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোন ব্যক্তি কোরবানীর চামড়া মাদ্রাসায় প্রদান করল, ছাত্রদের পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করল, কোন ব্যক্তি বন্দোবস্ত করল ছাত্রদের খাবারের, তার জন্য বাৎসরিক একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়। তাতে সবিস্তারে উল্লেখ থাকে দানের কথা। এতে ছাত্রদের মাঝে জন্ম নেয় পরনির্ভরতা ও হীনম্মন্যতাবোধ। ফলে তারা কখনো সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায় না এবং হয়ে পড়ে ক্রমে মেরুদণ্ডহীন ।

অতঃপর তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত হয়, এবং সামান্য কথায় দ্বিধাবোধ করে না একে অপরকে কাফের পর্যন্ত ফতোয়া দিয়ে দেয়। সেই সাথে তারা সমাজের ধনিক শ্রেণীর তোষামোদে প্রচণ্ড রকম উৎসাহী হয়ে পড়ে। মূলতঃ এসব কিছুই ছাত্রদের চরিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘনের কুফল। ইমাম গাজালি বর্ণিত উল্লেখিত নীতিমালার যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে জাতির সুশীল আত্মনির্মাণে প্রভূত সফলতা লাভ সম্ভব। যে-শিশু উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করবে, তাকে নিয়েই যুগের নতুন গাজালির স্বপ্ন দেখা যায়।

এই নীতিমালার ক্ষেত্রে ইমাম গাজালি যদিও দর্শনশাস্ত্র থেকে অনেক উপাদান গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার নতুন বর্ণনা ও অভিনব উপস্থাপনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা দর্শন শাস্ত্রে এখনো অনুপস্থিত।[১০০]

নীতি-দর্শনে নতুন সংযোজনা

মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শিক্ষাদানে ফালসাফা ও দর্শন শাস্ত্রের বর্ণনায় ইমাম গাজালি গ্রহণযোগ্যতা ও অভিনবত্ব দান করেছেন- কেবল এতটুকু বললে তার ভূমিকা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ শাস্ত্রের এমন বিস্তৃতি, ব্যাপকতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন, যার সামনে গ্রীক চরিত্রদর্শন অথৈ সমুদ্রে ভাসমান খরকুটা তুল্য।

গ্রীক দর্শনের মুসলিম ভাষ্যকার ইবনে মিসকাওয়া[১০১] তার গ্রন্থে আত্মার ব্যাধিকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা

১. হঠকারিতা
২. ভীরুতা
৩. লোভ
৪. সকল ক্ষেত্রে শিথিল মনোভাব
৫. বোকামি
৬. স্থূল বুদ্ধি।
৭. জুলুম-নিপীড়ন এবং
৮. লাঞ্ছনার ব্যাপারে উদাসীনতা।

এর মাঝে কেবল তিনি প্রথম দুটির চিকিৎসা ও নিরাময় বর্ণনা করেছেন। অন্যগুলোর ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার আলোকপাত করেন নি। এক্ষেত্রে ইমাম গাজালি তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব চরিত্রের সঠিক ত্রুটিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে তার সমাধান ও প্রতিকার উল্লেখ করেছেন। তিনি হিংসা, রিয়া, প্রতিপত্তির মোহ, আত্মমুগ্ধতা, ক্রোধ, কৃপণতা, গীবত, মিথ্যাচার, অপ্রয়োজনীয় আলোচনা, কুৎসা রটনা, পরিহাস- ইত্যাদি সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র শিরোনামে দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

---

১০০. ইমাম গাজালি: *এহইয়ায়ি উলুম আদ্দীন (অনূদিত)* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫
১০১. ইমাম গাজালি: প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার ব্যাধি দূরীকরণে ইমাম আবু হারেব মক্কী, রাগেব ইস্পাহানী ও অন্যান্য শাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, তার যথাযথ সংজ্ঞা নির্ধারণ, সঠিক প্রকাশক্ষেত্র নির্ণয় এবং এতদসংক্রান্ত তত্ত্বালোচনায় ইমাম গাজালি যে যুগান্তকারী সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। প্রাচীন দার্শনিকদের আলোচনায় এর ছায়ামাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে আমরা এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

মানুষ তার নিত্য কাজে-কর্মে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে। যে কাজ ধর্ম সংক্রান্ত, সেক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রবঞ্চনা আরো প্রকট রূপ ধারণ করে। মানুষ পুণ্য মনে করে কাজটি করলেও, গভীর বিবেচনায় দেখা যায়, এতে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে। তাই বিষয়টি বেশ জটিল। এই দিকটি ইমাম গাজালির বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে তার উপলব্ধি নতুন ও বিরল। বিষয়টির উপর এহয়াউল উলুমে 'জাম্মুল গুরুর নামে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে।

আলেম, জাহেদ, হাজ্বী ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে এতে বিবৃত হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক অধঃপতনের ব্যবচ্ছেদ। সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ শীর্ষক আলোচনায় তিনি লিখেছেন- বিত্তবানদের অনেকে মসজিদ, মাদরাসা, ও খানকাহ নির্মাণ করে ধর্মের বিরাট উপকার করার দাবী করে বসে আছেন। অথচ, খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত টাকার মাধ্যমে তা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, উপার্জিত টাকা যদি বৈধ হয়েও থাকে, তার নিয়তে হয়তো ছিল অন্য কোন চটুলতা। কিংবা যশ ও খ্যাতি লাভই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজে এমন অনেক দুস্থ লোক মানবেতর জীবন যাপন করছে, মসজিদ নির্মাণের পরিবর্তে যাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই ছিল অধিক যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মসজিদ নির্মাণকারীর এতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। মসজিদ নির্মাণে নকশা-কারুকার্য ও বিলাসবাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ মসজিদ এবাদতের স্থান; বিত্ত-বৈভব প্রদর্শণীর ক্ষেত্র নয়।[১০২]

অনেক বিত্তবান দান করেন দুস্থ মানুষকে। তাদের পক্ষ থেকে হাজার হাজার টাকা দান করা হয়। ঘোষণা দিয়ে সাহায্য করা হয় অসহায় মানুষকে। আবার কেউ হারামাইনে দানের অধিক ফজিলত হিসেবে বার বার হজ্বে গমন করে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আসেন। কিন্তু বাস্তব হল, এসবের পিছনে খ্যাতি-প্রীতিই কাজ করে। আল্লাহর রেজামন্দিই যদি এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে এই প্রচার ও ঘোষণার কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

দান ও সদকা প্রদানের ক্ষেত্রে ইমাম গাজালি যে সমস্ত ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের বর্তমান সমাজের বিবেচনায় সর্বতোভাবেই সঠিক। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল, মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে প্রচুর অর্থসম্পদ অনর্থক কাজে ব্যয় করা হয়। বৃহৎ একটি শ্রেণী অর্থ উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের নিকট হাত পাতার মত জঘন্য নীচুতায় লিপ্ত হয়। শহরে-বন্দরে বিভিন্ন মসজিদ থাকা সত্তেও, নির্মাণ করা হয় নতুন নতুন মসজিদ। সঠিক পন্থায় ব্যয় করার মাধ্যমে এই বিপুল অর্থ ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় হতে পারত। প্রতি বছর মাদরাসাগুলো থেকে মাওলানা পদবি নিয়ে একদল যুবক বের হয়। যোগ্যতার অভাবে বৈধ ও সুশীল পন্থায় জীবন নির্বাহের সকল পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। তাদের একমাত্র আশ্রয়, দেশের প্রত্যন্ত অজপাড়াগায়, জীবনের মুখরতা থেকে অনেক অনেক দূরে- সেখানে তাদের বেতন সমপরিমাণ চাঁদার ব্যবস্থা করে

১০২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে মাদরাসা। দু'চার হরফ আরবীও পড়তে সক্ষম নন, অথচ বছর বছর তাদের হাতে দ্বীনের নতুন নতুন ধারক-বাহক তৈরী হয়ে যাচ্ছেন। সমকালীন শীর্ষস্থানীয় আলেমগণনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করছেন এই অধঃপতন, অথচ এর প্রতিবাদ করছেন না দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ।[১০৩]

যেখানে পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণ, সেখানে মানুষ ভুল করে সবচেয়ে বেশি। কেননা, সেখানে অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায় পাপ-পুণ্য নির্ণয় করা । এসমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ নিজের কাজকে সঠিক, নির্ভুল ও পুণ্যময় বলে ধরে নেয়। ইমাম গাজালি এ ধরণের অবস্থাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পার্থক্য রেখায় চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এইয়াউল উলুম গ্রন্থে 'জাম্মুল গুরুর' শিরোনামে তিনি আহলে ইলমের আলোচনায় লিখেছেন- উলামা সমাজের যারা আত্মপ্রবঞ্চনার ব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা বারো শ্রেণীতে বিভক্ত।

একটি শ্রেণী হল, যারা ইলম ও আমলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত। মানব মনের প্ররোচনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু স্বয়ং নিজেরাই যে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত, তা তাদের চিন্তার অতীত। তাদের কথায় ও কাজে যখন কদাচ তা প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন নফস বিভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করে তোলে। তারা নিজেদের অহংকার ও খ্যাতিকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, এটা অহংকার কিংবা প্রতিপত্তির মোহ নয়; বরং ইসলামের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[১০৪]

তারা মনে করেন, নিম্নমানের পোশাক পরিধান, বিভিন্ন মজলিসে পিছনের সারিতে অবস্থান যদিও দাম্ভিকতায় বাঁধা প্রদান করে, কিন্তু এতে ইসলাম ও ইসলামের ধারকদের অসম্মান হয়। ইসলামের মর্যাদা পুণরুদ্ধার, ইলমের সম্মান, স্বপন্থার প্রতি অটলতা, বেদআত পন্থীদের অবমাননা ব্যতীত কী করে সম্ভব হতে পারে?

এই শ্রেণীর আলেমগণ হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ সমসাময়িক অন্যান্য আলেমদের সমালোচনা করে থাকেন। তাদের সকলে তাদের নিকট হয়ে চরম মন্দের প্রতীক। কথায় কথায় প্রকাশ করেন নিজেদের তাক্ওয়া। এটি স্পষ্ট রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও একে তারা রিয়া মনে করেন না। তাদের যুক্তিও থাকে অভিনব। অর্থাৎ মানুষের সামনে আমরা যদি বাস্তব নমুনা তুলে না ধরি, তবে তা কীভাবে তাদের আমলে আসবে? প্রবৃত্তিকে প্রবোধ দিয়ে তারা বলে, বাস্তব অবস্থা প্রকাশের ফলে মানুষ আমার অনুসরণ করবে। এবং আমি অনেক সওয়াবের অধিকারী হব। অনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারে এটাই আমার উদ্দেশ্য।

তারা রাজা-বাদশাহদের সাথে উঠাবসা করেন এবং তোষামোদের আশ্রয় নেন নির্লজ্জভাবে। কখনো যদি মনে মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়, তবে নফস এই বলে সান্ত্বনা দেয়, এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য সম্পদ ও মর্যাদা হাসিল নয়; বরং তা বজায় রাখতে হচ্ছে অপারগতার দরুন। কেননা, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে ভাল-মন্দের সব তাদের হাতেই ক্ষমতার সমস্ত কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, বাধ্য হয়ে, মানুষের উপকারার্থে বহাল রাখতে হচ্ছে এ সম্পর্ক।

এসমস্ত ক্ষেত্রে শরীয়তের বিচারে যেহেতু সওয়াব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ইমাম গাজালি প্রতিটি ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তুলে ধরেছেন বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ ও অনুষঙ্গ। তিনি লিখেছেন- এরূপ পরিস্থিতিতে

---

১০৩. প্রাগুক্ত
১০৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

একজন আলেমের কর্মক্ষেত্রে অন্য এক আলেম এসে উপস্থিত হন যদি, তবে ধরা পড়বে উক্ত আলেমের আসল মনোভাব। তিনি যদি রিয়া হতে মুক্ত হন সম্পূর্ণভাবে, তবে ভিন্ন আলেমের[১০৫]

উপস্থিতিতে বিরক্ত বা মনোক্ষুন্ন না হয়ে বরং আনন্দিত হবেন। কেননা, মানুষ যদি তার অনুসরণের মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করেন, তাহলে সফল হয়ে যাচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আর যদি রিয়া হতে মুক্ত না হন, তবে তার আগমনে দ্বিতীয় আলেমের পসার কমে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়বে, এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল কুৎসা রটাতে আরম্ভ করবে। মূলতঃ এভাবে ধরা পড়বে তার সততা-অসততা।রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলেমদের উঠাবসা ও যোগাযোগের চিত্রটিও অনুরূপ। নতুন কোন আলেম যদি তার তুলনায় প্রশাসকের অধিক নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়ে পড়ে, তবে সকলে আদাজল খেয়ে তার বিরুদ্ধে লেগে পড়েন। ইমাম গাজালি আলেম সমাজের ত্রুটির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পাঠে মনে হবে, বর্তমান আলেম সমাজের দূরবস্থার চিত্র অবলোকন করেই তিনি এ মন্তব্য করেছেন। এশিয়া অঞ্চলের বর্তমান মুসলিম সমাজের চরিত্রগত অবস্থা এতই নাজুক, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয়ে তারা তৎপর হয়ে উঠে একে অপরের বিরুদ্ধে কাফের-ফাসেক ইত্যাদি ফতোয়া দিতে। তাদের লেখাগুলো পরিপূর্ণ থাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়িতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত কিছুর পরও তারা উভয় পক্ষই মনে করেন, যা করা হচ্ছে, সবই দ্বীনের হেফাজত ও খেদমতের উদ্দেশ্যে।

নীতি-বিজ্ঞান বর্তমান যুগের বিচারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাতে বিভিন্ন পার্থক্য ও বিভাগ সৃষ্টি করে সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত দুস্কর ও জটিল। মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনের একটি মৌলিক কারণ হল, চরিত্রের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে মানুষ পরিপূর্ণ সজাগ হতে পারে না। বদান্যতা, অপব্যয়, হীনতা, অল্পেতুষ্টি, নীচুতা, বিনয়, আত্মপ্রঞ্চনা, অসম্মান ইত্যাদি অতি সূক্ষ্ম চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষ সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করতে পারে না। তাই অপচয় করে ভেবে বসে বদান্যতা করা হল। হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়ে মনে করে , আত্মসংযম দেখান হচ্ছে। লাঞ্ছিত হয়েও মনে করে, আমার এ সম্মানের কোন তুলনা হয় না। অহংকারী হয়েও ভাবে, আত্মসম্মানবোধের এ অভিব্যক্তি অতুলনীয়।[১০৬]

ইমাম গাজালি এ জাতীয় সূক্ষ্ম পার্থক্যের চরিত্র বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে। সাথে সাথে পেশ করেছেন এসব ব্যাধির প্রতিকার। কৃপণতার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি লিখেছেন, ইতিপূর্বে দার্শনিকগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কৃপণতাকে চিহ্নিত করেছেন। এক শ্রেণীর মুসলিম দার্শনিক মনে করেন, শরীয়তের পক্ষ থেকে যে অর্থ-ব্যয় ওয়াজিব করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে আদায় না করার নামই কৃপণতা। কিন্তু আমার মতে, কৃপণতার এই সংজ্ঞা সঠিক ও নির্ভুল নয়। কোন ব্যক্তি যদি এই টাকার জন্য বাজার থেকে গোশত না কিনে ফিরে আসে, তবে তাকে কৃপণ বলাই সংগত। অথচ এই ব্যক্তি শরীয়তের ওয়াজিব ব্যয়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে নি।

অপর এক শ্রেণী মনে করেন, সামান্য অর্থ-ব্যয় যে ব্যক্তির জন্য মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কৃপণ মূলতঃ সে-ই। ইমাম গাজালির মতে, কৃপণের এই সংজ্ঞাটিও সার্বিকভাবে সঠিক নয়। কেননা, কৃপণের জন্যও কখনো কখনো সামান্য অর্থ-ব্যয় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। অপর পক্ষে, অনেক ধনী ব্যক্তির পক্ষেও অধিক দান করা সম্ভব হয় না।

---

১০৫. সম্পাদনা পরিষদ.সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ,খ.১,পৃ.৩৫০

১০৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদ

সকল মুসলিম দার্শনিকগণ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এমন কী অমুসলিম দার্শনিকরাও অনেকেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সদর্থক ধারণা পোষণ করেন। ইমাম আল গাজালি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতিকে তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত করেন, তা হলো :

১. সত্যানুসারী দল : এই দলের লোকেরা জগতকে সৃষ্ট বলে মনে করেন। তাই তারা সৃষ্টিকর্তা আছে বলে বিশ্বাস করেন।

২. দাহরিয়া বা জড়বাদী দল : এই দলের লোকেরা মনে করেন জগত বর্তমান অবস্থায় অনাদি। তাই এর কোন সৃষ্টিকর্তা থাকা দরকার নেই।

৩. দার্শনিক দল[১০৭] : এই দলের লোকেরা মনে করেন যে, জগত অনাদি হওয়া সত্ত্বেও এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে।

ইমাম আল-গাজালি সত্য অনুসারী দলকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। জড়বাদীদের মতকে তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে দার্শনিকদের ওপর তিনি মারাত্মকভাবে অসন্তুষ্ট এই কারণে যে তাঁরাও প্রকারান্তে জড়বাদীদের মতই আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এক ধরণের অস্বীকৃতি প্রমাণ করে থাকেন। তারা যদিও আল্লাহর অস্তিত্বকে মুখে মুখে স্বীকার করেন। কিন্তু কার্যত: তাঁরা এর বিরুদ্ধাচারণ করেন। তিনি তাই দার্শনিকদের যুক্তিসমূহকে পর্যালোচনা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[১০৮]

দার্শনিকদের যুক্তিঃ

দার্শনিকরা জগতকে অনাদি মনে করেও আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ সম্পর্কে তাঁদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

১. জগতের সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ্ আছেন বলতে এইরূপ বুঝায় যে, তিনি জগতের কারণ মাত্র। তিনি জগত প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তিনি প্রথম কারণ। তাই জগতকে অনাদি বলেও এই প্রথম কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

২. দার্শনিকেরা কার্য-কারণ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে এরূপ সিদ্ধান্ত নেন যে, জগতের মূলে একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব কার্য-কারণের পূর্বগামিতার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ জগতের সব ঘটনাপ্রবাহের পিছনে কারণ রয়েছে। আবার প্রত্যেক কারণের পিছনে অন্য একটা কারণ রয়েছে।এইভাবে এক সময় গিয়ে এই প্রক্রিয়া একটি আদি কারণ গ্রহণ করতে বাধ্য। আল্লাহ্-ই সেই আদি কারণ।

৩. দার্শনিকদের মতে, প্রাণসমূহের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। তাদের ক্রম অনুসারিক কোন ব্যবস্থাও নেই। গঠনের দিক থেকে অথবা উৎপত্তির দিক থেকে এর কোন দিক থেকেই এদের সাথে সম্পর্ক আরোপ করা চলে না। যেহেতু প্রাণসমূহের কোন ধারাবাহিকতা নেই তাই এর পরিচালক হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়।

৪. দার্শনিকদের মতে, কারণের অশেষ অনুগমন অসম্ভব। কেননা, কারণসমূহের এককগুলি প্রত্যেকটির একক-ই নিজে সম্ভব অথবা অবশ্যাম্ভাবী। যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে কারণের প্রয়োজন নেই। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে

---

১০৭. মো.শওকত হোসেন: *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা:তিথি পাবলিকেশন,জানুয়ারী-২০১১),পৃ.৯৬

১০৮. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত,পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সে সমগ্র-ই যার অংশ তাও সম্ভাব্যতার গুণ দ্বারা গুণান্বিত হবে। দার্শনিকদের মতে, সমগ্র-ই সম্ভব। কাজেই সমগ্রের জন্যই এর সত্তার অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন আছে। কাজেই সমগ্র এবং তার বহিঃস্তর কারণ রয়েছে। এই কারণ হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করতে হয়।

৫. কতিপয় দার্শনিক এই ধরনের মত প্রকাশ করেন যে, আত্মা দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে আদিতে একটি বিশ্বআত্মার সাথে সংযুক্ত ছিল। মৃত্যুর পরে তা আবার বিশ্বআত্মার সাথে মিলে যাবে। কিন্তু অপর দার্শনিকরা আবার মনে করেন যে, দেহ ছাড়া আত্মার কোন নিবাস নেই। আল-গাজালি, ইবনে সিনা, আল-ফারাবী প্রমুখ। দার্শনিকদের উল্লেখ করে দেখান যে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রাণ একটি পদার্থ, যা স্বয়ং অস্তিত্বশীল। দার্শনিকদের বিরুদ্ধে ইমাম আল-গাজালির যুক্তি উপযুক্ত যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে গাজালি প্রমাণ করতে চান যে, দার্শনিকগণ আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি।[১০৯] তার যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

১. ইমাম আল-গাজালি দেখান যে, দার্শনিকরা যে আদি কারণের ধারণা করেছেন তা মূলত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা অনুমান মাত্র। তাই এর দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

২. কার্য-কারণের পূর্বগামিতার মাধ্যমে যে শৃংখল দার্শনিকরা দেখিয়েছেন এই বিষয়টাকে গাজালি গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, এখানে স্বত:সিদ্ধতার দাবী করার। কোন পথ নেই।

৩.প্রাণসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা একটি একতরফা ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত।

৪. গাজালির মতে, 'সম্ভব', 'অসম্ভব' শব্দগুলি দার্শনিকগণ যথার্থ অর্থে ব্যবহার করেননি। এমন কি তারা এই শব্দগুলোর কোন স্থায়ী অর্থও গ্রহণ করেননি। এই শব্দ দুটি নিতান্তই অস্পষ্ট। --

৫. আত্মা যদি বিশ্বআত্মার অংশ হয় তাহলে তা প্রমাণসিদ্ধ নহে। আর আত্মা যদি স্বয়ং সৃষ্ট হয় তাহলে একটি সীমাহীন সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু সীমাহীন সৃষ্টির সম্ভাবনা গ্রহণ করা যায় না।[১১০]

মুল্যায়ন :

দার্শনিকদের বিরুদ্ধে গাজালির অভিযোগ মূলত: এই যে, যারা জগতের অনাদিত্বে বিশ্বাস করেন বা আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তাকে অনাদি বলে মনে করেন তারা আল্লাহর যথার্থ অস্তিত্ব প্রমাণ করতে অক্ষম। বস্তুত: আল্লাহ অনাদি, একক ভাবেই অনাদি, সবকিছুর পূর্বে তিনি-ই ছিলেন। তাঁর দ্বারা এ জগতে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। এ রকম ধারণাই ইসলামসম্মত। দার্শনিকদের মতবাদ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গাজালির এই বিশ্বাসের সুদৃঢ় প্রতিফলন ঘটেছে।আল্লাহর একত্ব মুসলমানদের জন্য অবশ্যস্বীকত একটি বিষয়। বিষয়টি মুসলমানদের বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে। তবে দার্শনিক হিসেবে কেউ এই বিষয় নিয়ে যদি যুক্তি-তর্ক করেন তাহলে সেটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমার্জিত কিছু নয়। তবে একজন মুসলিম দার্শনিক আল্লাহ্‌র একত্বের বিরুদ্ধে মত দিতে পারেন না। যদি দেন তাহলে তিনি দার্শনিক থাকতে পারেন, কিন্তু মুসলিম থাকেন না। তাই মুসলিম দার্শনিকদের আল্লাহকে এক বলে মেনে নেওয়া এবং তা প্রমাণ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মতাত্ত্বিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলিম চিন্তাবিদদের থেকেই আল্লাহর একত্ব প্রমাণের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তারা আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণ করার জন্য এত বেশী তৎপর ছিলেন যে, তাদেরকে আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার ধারক বলে অভিহিত করা হয়।

---

১০৯. প্রাগুক্ত

১১০. আল-গাযালী:*তহাফুতুল ফালাসিফা*,আল্লামা শাইখ মুফতি রেজা মাসুমী আল ওসমানী(অনূদিত) (ঢাকা:রশীদ বুক হাউস ,তা.বি.পৃ.১০১

Dhaka University Institutional Repository

এ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক দার্শনিকরাও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করতেন। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও বিশেষভাবে প্রভাবিত ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ আল্লাহর একত্ব প্রমাণের জন্য যুক্তি প্রদান করেছেন। তাঁদের যুক্তিসমূহের মধ্যে স্পষ্টতই গ্রিক-দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা যে ধরনের যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চান ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করা সঙ্গত নয়। তাছাড়া তাদের যুক্তিসমূহ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ত্রুটিমুক্ত নয়। ইমাম আল-গাজালি এ বিষয়টিই দেখাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ এক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দার্শনিকগণ যেভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণিত হয়না এবং এভাবে প্রমাণ করতে যাওয়া (মুসলিমদের পক্ষে) ঠিকও নয়।

অনুচ্ছেদ-২

আল্লাহর একত্ব সম্পর্কিতমতবাদঃ

দার্শনিকগণ আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সকল যুক্তি দিয়েছেন ইমাম আল-গাজালি তাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দার্শনিকদের দুইটি প্রধান যুক্তি রয়েছে।

প্রথম যুক্তি :

দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ একের অধিক হলে তা অবশ্যম্ভাবী সত্তার জাতি বুঝাবে আর ঐ জাতিবাচক নাম এর প্রত্যেকটির ওপর প্রযোজ্য হবে। কোন বিশেষ সত্তার ওপর তখন আর সৃষ্টিকর্তা বা পরমসত্তার মর্যাদা প্রদান করা যাবে না । যেমন মানুষ' বলতে যায়েদ, আমর ইত্যাদি কোন বিশেষ মানুষকে বোঝায় না। যায়েদই একমাত্র মানুষ নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমর আর মানুষ থাকতো না ।একটি কারণ দ্বারাই সকল মানুষকে মানুষ করা হয়েছে। তাই দেখা যায় কোন সত্তা অবশ্যম্ভাবী হলে তাকে কোন বিশেষ জাতিভুক্ত করা যায় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যম্ভাবী সত্তা একটি হতে হবে।[১১১]

দ্বিতীয় যুক্তি :

দার্শনিকগণ দেখান যে, যদি অবশ্যম্ভাবী সত্তা দুইটি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ঐ দুইটি পরস্পর নিম্নোক্তভাবে সম্পর্কিত হতে পারে:

১. হয় তারা পরস্পর সবদিক থেকে সমান হবে। নতুবা

২. তারা একে অন্যের বিপরীত হবে।

এখন যদি উভয়ই সবদিক থেকে সমান হয় তাহলে দ্বিত্ব বা তার অধিক সংখ্যা কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ যা সব দিক থেকেই একই রকম তাকে দুই সত্তা বলা বা তার অধিক বলার কোন উপায় থাকে না। কেননা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই করা যায়না।আবার যদি সবদিক থেকে দুটি সত্তা একই রকম না হয় তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। দার্শনিকদের মতে, এই পার্থক্য নিছক স্থান বা কালগত নয়; বরং এই পার্থক্য হবে সত্তাগত পার্থক্য। আর যদি এই সত্তাগত পার্থক্য স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, এদের একটি অন্যটিকে কোন কোন বিষয়ে শরীক করবে অথবা কোন কোন দিক থেকে শরীক করবে না। এখন উভয়ে কোন বিষয়ে শরীক না হওয়া সম্ভব না কিন্তু ধরে নিতে হবে যে, এরা উভয়ে উভয়ের কিছু অংশতে অংশগ্রহণ এবং কিছু অংশতে বিরোধিতা করবে। এখন দু'টি সত্তা পরস্পরে কিছু অংশতে অংশগ্রহণ এবং কিছু অংশতে বিরোধিতা করলে যে অংশ। অংশগ্রহণ করে সেই অংশ থেকে যে অংশ অংশগ্রহণ করেনা তা থেকে পৃথক হবে আর তাতে

১১১. আল-গাযালী:*তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত.পৃ.১০১

Dhaka University Institutional Repository

করে অবশ্যম্ভাবী, সত্তার মধ্যে মিশ্রণ দেখা দিবে। কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তা মিশ্র হতে পারে না। তাই সত্তা মিশ্র হতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হয় যে, সত্তা একের অধিক বা দু'টি হতে পারে না। আল্লাহ্ তাই এক এবং অদ্বিতীয়।[১১২]

আল-গাজালির অভিযোগঃ

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের উক্ত দুই ধরনের যুক্তিকেই ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এ সকল যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব প্রমাণিত হয় না। দার্শনিকদের এই দুই ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধেই আল-গাজালি প্রতিবাদ করেছেন।

প্রথম যুক্তির প্রতিবাদ:

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ উত্থাপন করেন:

প্রথমত,

দার্শনিকগণ যেভাবে মনে করেন যে, অবশ্যম্ভাবী সত্তা একের অধিক হলে তা একটি জাতি বুঝাবে। কিন্তু গাজালি দেখান যে, এটি দার্শনিকদের একটি ভুল শ্রেণী বিভাগ। গাজালির মতে, অবশ্যম্ভাবী কথাটির মধ্যে দুর্বোধ্যতা রয়েছে। তবে এটা দ্বারা মূলত কারণ না থাকা বোঝায়। অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী মানে হল যার কোন কারণ নেই। এখন যার কারণ নেই তাকে যে একটিই হতে হবে এমন কোন কথা থাকতে পারেনা। যদি দুটি সত্তা কারণহীন থাকে এবং একটি অন্যটির কারণ ও পরস্পর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে কোন যৌক্তিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ দার্শনিকরা যেভাবে আল্লাহকে অবশ্যম্ভাবী সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে কারণহীন বলেছেন, এরকম কারণহীন সত্তা একাধিক হলে কোন যৌক্তিক বিভ্রান্তি থাকে না বলে গাজালি দেখিয়েছেন। তাই অবশ্যম্ভাবী সত্তা বলে দার্শনিকরা যেভাবে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁদের এই প্রমাণ সঠিক নয়। অর্থাৎ তাদের এ যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব প্রমাণিত হয়না।[১১৩]

দ্বিতীয়ত,

গাজালি দেখান যে, দার্শনিকরা যখন বলেন, অবশ্যম্ভাবী সত্তার কোন কারণ নেই, তখন স্পষ্টতই তা একটি নঞর্থক উক্তি হয়ে পড়ে। আর এই ধরনের নঞর্থক বাক্য কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এ ধরনের নঞর্থক উক্তি আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করে না।

তৃতীয়ত,

অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাব্যতা অর্থেও যদি অবশ্যম্ভাবীর একটি স্থির ও হাবোধক বিশ্লেষণ ধরে নেওয়া হয়, তাও স্বয়ং বোধগম্য নয় বলে আল-গাজালি মনে করেন। সত্তার কারণ অস্বীকার করার জন্য যে নেতিবাচক উক্তি করা হয় তা দার্শনিকদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলে গাজালি মন্তব্য করেন।

চতুর্থত,

ইমাম আল-গাজালি দেখান যে, যখন বলা হয় কৃষ্ণতা স্বয়ং একটি রং তখন একথা দ্বারা এটা বোঝায় না যে, অন্যকিছু এই গুণ গ্রহণ করতে পারে না। তাই এমনটি বলাও সংগত নয় যে, এই বিষয় বা বস্তুটি স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ তা স্বয়ং কারণহীন। এটা দ্বারা এও বোঝায় না যে, অন্য কিছু সম্ভাব্যভাবে এই জ্ঞানের অধিকারী হতে

---

১১২. প্রাগুক্ত

১১৩. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পারবেনা। তাই আল্লাহর কারণ হতে পারবেনা। এভাবে অন্য সত্ত্বাও কারণহীন হওয়ার কোন বাধা থাকতে পারে না। সেকারণেই দার্শনিকদের এ ধরনের যুক্তি দ্বারা আল্লাহকে একক সত্তা বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলে গাজালি মনে করেন।

দ্বিতীয় যুক্তির প্রতিবাদ:

ইমাম আল-গাজালি আল্লাহর একত্ব প্রমাণের জন্য দার্শনিকদের দেওয়া দ্বিতীয় যুক্তিকেও ভ্রান্ত বলে মনে করেন। নিম্নোক্তভাবে তিনি দার্শনিকদের এই যুক্তির প্রতিবাদ জানান।

১. গাজালি দার্শনিকদের একথা মেনে নেন যে, পার্থক্য ব্যতীত কোন কিছুর দ্বিত্ব কল্পনা করা যায় না। আর সব দিক থেকে সমান দু'টি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এই শ্রেণীর গঠন প্রথম কারণে অসম্ভব, এটা দার্শনিকদের গৃহীত একটি একতরফা সিদ্ধান্ত। এর কোন প্রমাণ নেই।

২. গাজালি দেখান যে, দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথম কারণ যেমন ব্যাখ্যাকারী শব্দ দ্বারা বিশ্লেষিত হয়না, তেমনি সংখ্যা দ্বারাও হয় না। এই মতবাদের ওপরই তাদের আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দার্শনিকদের এ ধরনের বিশ্বাস যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

দার্শনিকরা আরও মনে করেন যে, সর্বতোভাবে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি এটা স্বীকার করা যায় যে, আল্লাহ্ সর্বতোভাবে এক আর সর্বতোভাবে একত্ব সর্বতোভাবে বহুত্বকে নিষিদ্ধ করে।

পাঁচ প্রকার সত্তার ওপরে বহুত্ব আরোপিত হতে পারে:

প্রথমত, কার্যত বা কল্পনাবলে বিভাজ্য হলে সেই সত্তার ওপর বহুত্ব আরোপিত হতে পারে। প্রথম কারণের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত: যদি কোন বস্তু কেবল সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত না হয়ে কল্পনায় দুটি ভিন্ন ভাব দ্বারা বিভক্ত হয়, তাহলে তার ওপর বহুত্ব আরোপ করা যায়।

তৃতীয়ত, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা প্রভৃতির কল্পনা দ্বারাও বহুত্ব সৃষ্টি হয়। কেননা এ সকল বিশেষণ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। আর সত্ত্বা এবং বিশ্লেষণ পরস্পরের অংশীদার। তাই অবশ্যম্ভাবী সত্তার বহুত্ব দেখা দেয়। কাজেই একত্ব বিনষ্ট হয়।

চতুর্থত, জাতি ও শ্রেণীর মিশ্রণ দ্বারা এক ধরনের বহুত্ব সৃষ্টি হতে পারে। একে যুক্তিগত বহুত্ব বলে। যেমন, প্রাণিত্ব যুক্তিগতভাবে বা আবশ্যিকভাবে মনুষ্যত্ব নয় কেননা সব প্রাণীই মানুষ নয়। মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। প্রাণী' হচ্ছে জাতি আর বাকশক্তিসম্পন্ন গুণটি হল শ্রেণী নিরুপক বিশেষণ। তাই মানুষ' হল এই জাতি ও শ্রেণী নিরুপক বিশেষণ দ্বারা গঠিত একটি মিশ্রণ । মানুষ বহু; আর এরকম বহুত্ব প্রথম কারণ বা আল্লাহর ওপর আরোপ করা যায় না।

পঞ্চমত, বস্তুর প্রকৃতি কল্পনা এবং ঐ প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনা করার মাধ্যমেও বহুত্ব দেখা দিতে পারে। যেমন মানুষের অস্তিত্বের পূর্বেই তার প্রকৃতি বর্তমান। ত্রিভুজ মানেই তিন কোণের সমষ্টি। তাই অস্তিত্ব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এইসব বহুত্বের নির্দেশক প্রথম কারণ বা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের আল্লাহর বহুত্ব বর্জনের এসকল পদক্ষেপগুলো ভালো করে পরীক্ষা করার কথা বলেছেন। তিনি এসকল বিষয়গুলোকে সতর্কমূলক ভাবে অনুধাবন করতে বলেছেন। ইমাম গাজালি দেখান যে, আল্লাহর সত্তায় বহুত্ব আসার মূল কারণ হল বস্তুর সাথে একে সংশ্লিষ্ট করে চিন্তা করা। দার্শনিকগণ এই ধরনের কাজ করার ফলে তারা নিজেরাই আল্লাহর একত্বকে রক্ষা করতে পারেননি।[১১৪]

১১৪. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত.পৃ.১১৪

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৩

আল্লাহর গুণ সম্পর্কিতমতবাদ

আল্লাহর কোন গুণ আছে কিনা, অথবা আল্লাহর ওপর কোন গুণ আরোপ করা যায়। কিনা এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুসলিম দর্শনের প্রাথমিক স্তরে আবির্ভূত ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। তবে একমাত্র মুতাযিলা সম্প্রদায় ছাড়া অন্য প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় এবং সাধারণ মুসলমানরা আল্লাহর গুণে বিশ্বাস করেন। মুতাযিলাদের সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রিক দর্শন প্রভাবিত ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকরাও আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁদের মতে, পবিত্র কোরআনেও আল্লাহর যে । নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করা হয় ঐ গুণসমূহ কেবল ভাষাগত তাৎপর্যই বহন করে মাত্র। এগুলো রূপক। আল্লাহর সত্তার সাথে এই সকল গুণাবলী আরোপ করা সঙ্গত নয়। দার্শনিকগণ কেবল এই অভিমত বা বিশ্বাস স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা রীতিমত বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাঁদের এই বিশ্বাস প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁর মতে, আল্লাহর সত্যিসত্যিই বিভিন্ন গুণাবলী রয়েছে।[১১৫]

আল্লাহর কোন গুণ নেই- এর পক্ষে মোতাযিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিঃ

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদদের 'আল্লাহর একতু ও ন্যায় পরায়ণতার ধারক' বলে অভিহিত করা হয়। কেননা তাঁদের তত্ত্বালোচনার মূখ্য লক্ষ্য ছিল আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা। কোন তত্ত্ব গ্রহণ অথবা বর্জন করার ক্ষেত্রে তাঁদের এই বিষয়টিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করা হলে বা আল্লাহর ওপর একাধিক গুণাবলী আরোপ করা হলে আল্লাহর একত্ব বিনষ্ট হয়। তাই তারা আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করেন না। মুতাযিলারা আল্লাহর গুণাবলীকে যেভাবে অস্বীকার করতে চান তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে :

আল্লাহর যদি গুণ থেকেই থাকে তাহলে তা হয় চিরন্তন, তা না হলে পরিবর্তনশীল হবে। এখন আল্লাহ যদি চিরন্তন গুণ থাকে অর্থাৎ আল্লাহর গুণগুলি যদি চিরন্তন হয়, তবে বহু চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। তাতে করে আল্লাহর একত্ব বিনষ্ট হবে।আবার আল্লাহর গুণাবলী যদি পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে আল্লাহ্ নিজে পরিবর্তনশীল হয়ে পরেন। কিন্তু আল্লাহকে কখনই পরিবর্তনশীল সত্তা বলা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, কোনভাবেই আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করা যায় না। তাই আল্লাহর কোন গুণ নেই - তিনি নির্গুণ।

গাজালির মতঃ

ইমাম আল-গাজালি আল্লাহর গুণ সম্পর্কিত মুতাযিলাদের মতবাদ বর্জন করেন। তিনি তাঁর হাফুতুল ফালাসিফা' নামক গ্রন্থে সরাসরিভাবে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রথমে কিছু না বলে দার্শনিক (ফালাসিফা) সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এর মাধ্যমেই মুতাযিলা দার্শনিকদের মতাদর্শ খণ্ডন করার প্রয়াস পান। কেননা দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে মুতাযিলাদের মতাদর্শ এবং যুক্তিসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল।

আল্লাহর কোন গুণ নেই- এটা প্রমাণে দার্শনিকদের যুক্তিঃ

দার্শনিকগণ আল্লাহর কোন গুণ নেই— এটা প্রমাণ করতে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, ইমাম আল-গাজালি তাকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন।

---

১১৫. আল-গাযালী:*তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকদের প্রথম যুক্তিঃ

দার্শনিকগণ দেখান যে, আল্লাহর যদি গুণ থাকে তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর গুণ (বিশেষ্য এবং বিশেষণ) এই দুটি বিষয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিকল্প দেখা দেবে, যার কোন কোন সম্পর্কে তারা সম্পর্কিত হবে :

প্রথমতঃ

এদের একটি এর অস্তিত্বের জন্য অপরটির মুখাপেক্ষি হবে না।

দ্বিতীয়তঃ

এদের প্রত্যেকটি নিজ নিজ অস্তিত্বের জন্য অপরটির ওপর নির্ভরশীল বা অপরটির মুখাপেক্ষী হবে।

তৃতীয়তঃ

এদের কোন একটি অপরটির অমুখাপেক্ষি হবে; এবং অপরটি তার অস্তিত্বের জন্য অন্যটির মুখাপেক্ষি হবে।দার্শনিকরা দেখান যে, এই তিন প্রকার বিকল্পের কোনটিই যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই আল্লাহর কোন গুণাবলী যৌক্তিকভাবে স্বীকার করা যায় না।প্রথম বিকল্পের বিশ্লেষণ করে দার্শনিকরা দেখান যে, আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলী এ দু'টি বিষয় যদি প্রত্যেকটি অপরটির অভাবহীন বা অমুখাপেক্ষি হয়, তাহলে উভয়ই হবে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একাধিক অবশ্যম্ভাবী সত্তা গ্রহণ করা যায় না। এতে আল্লাহ্ সত্তার। দ্বৈততা আসে। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব বিনষ্ট হয়। তাই প্রথম বিকল্প গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিকল্প বিশ্লেষণ করে দার্শনিকগণ দেখান যে, আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলী উভয়ই যদি উভয়ের ওপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ অস্তিত্বের জন্য যদি প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষি হয়, তাহলে কোনটিই অবশ্যম্ভাবী হতে পারবে না। কেননা অবশ্যম্ভাবী সত্তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটা অস্তিত্বের জন্য পরনির্ভরশীল নয়, এটা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। কিন্তু গুণগুলি যদি অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে তা চিরন্তন হতে পারে না। আবার আল্লাহ্ যদি তার অস্তিত্বের জন্য গুণগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে আল্লাহ আর চিরন্তন থাকেন না। এখন দু'টি বিষয়ের কোনটিই যদি চিরন্তন না হয় তাহলে জগত অসম্ভব হবে। তাই দুটি বিষয়ের উভয়ই চিরন্তন হতে পারবেনা।[১১৬]

তৃতীয় বিকল্প অনুসারে যদি এদের কোন একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে সেটি হবে কারণ দ্বারা অস্তিত্বশীল। অর্থাৎ তার অস্তিত্বের কারণ থাকতে হবে, সেটি অবশ্যম্ভাবী হবে না। অপরদিকে, যেটি অস্তিত্বের জন্য অন্যটির ওপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ কোন কিছুর অমুখাপেক্ষী তা হবে অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে এই দাড়াবে যে, নির্ভরশীল সত্তাটি বহিঃস্থ কারণ দ্বারা অবশ্যম্ভাবী সত্তার সাথে যুক্ত হবে। ইমাম আল-গাজালির অভিযোগ ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই সকল যুক্তি যথার্থ মনে করেন না। নিম্নোক্তভাবে গাজালি দার্শনিকদের যুক্তি খণ্ডন করেন :

এক.

ইমাম গাজালি দেখান যে, তারা যে দ্বৈততার সম্ভাবনার কথা বলেছেন অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী সত্তা দু'টি হয়ে যাবার কথা বলেছেন সেই দ্বৈতসত্তা মূলত শর্তহীন দ্বৈততা। এই দ্বিতৃতা পরিহারের জন্য দার্শনিকদের কোন যুক্তিই নেই। গাজালি অভিমত প্রকাশ করেন যে, আজ অবধি কিছু নঞর্থক প্রমাণ ছাড়া এই সমস্যা বা এটা হতে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও তাঁদের কোন কার্যকরী প্রমাণ নেই। আর তাই এই দ্বিত্বতার দোহাই দিয়ে আল্লাহর গুণ

১১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকার করার কোন সুযোগ তাদের নেই দ্বিত্বতার সমস্যাকে তাই আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত সমস্যার সাথে একাত্ম করে দেখা বা আল্লাহর গুণ সংক্রান্ত সমস্যার ভিত্তি হিসেবে দ্বৈততার সমস্যাকে গ্রহণ করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। গাজালির মতে, বরং এটা বলাই সংগত যে, সত্তা তার অস্তিত্বের জন্য বিশেষণের অভাবী নয়, অথচ বিশেষণ বিশেষ্যের অভাবী, যেমন মানুষের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।[১১৭]

দুই.

অবশ্যম্ভাবী সত্তা বলতে দার্শনিকরা সঠিক কি বোঝাতে চান সে সম্পর্কে ইমাম আল-গাজালির কিছু পর্যালোচনা রয়েছে। তাঁর মতে, যদি দার্শনিকগণ অবশ্যম্ভাবী সত্তা দ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করেন যে, তাঁর কোন কার্যকরী কারণ নেই, তাহলে তার কারণের প্রশ্নটা আসলে কেন। যেমনভাবে অনাদি সত্তার কোন কারণ নেই, তেমনি করেই বিশেষণ বা গুণ অনাদি, এর কোন কার্যকরী কারণ নেই। আর যদি অবশ্যম্ভাবী সত্তার এই রকম অর্থ ধরে নেয়া হয় যে, এর কোন গ্রহণকারী কারণ হয়না, তাহলে একে এই অর্থে অবশ্যম্ভাবী সত্তা বলা চলে না। বরং এতদসত্ত্বেও তা অনাদি। এর কোন কর্তা নেই। এই মতের পরস্পর বিরোধিতা কোথায়— দার্শনিকরা এ প্রশ্নের কোন যথার্থ উত্তর দিতে পারেননা বলে ইমাম আল-গাজালি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিন.

কেবলমাত্র যে সত্তা অবশ্যম্ভাবী তারই গ্রহণকারী কারণ নেই। এবং এর সাথে 'যদি স্বীকার করা হয় যে, গুণসমূহের গ্রহণকারী কারণ আছে, তাহলে এর ফল হওয়ার বিষয়টিও স্বীকার করা হয়ে যায়। দার্শনিকগণ অবশ্যম্ভাবী সত্তার অস্তিত্ব বা এর কোন গ্রহণকারী কারণ নেই তা যুক্তিসংগত দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেননি বলে গাজালি মনে করেন। তারা কেবল কারণ ও ফলের অনুগম কিভাবে বন্ধ করা যায় তা-ই কোন মতে, প্রমাণ করেছেন মাত্র। তাই এটুকু প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যকিছু (গুণ সম্পর্কিত সমস্যার সবদিক) প্রমাণ করতে চেষ্টা করা সম্ভব নয়। এটি তাদের একটি অযৌক্তিক দাবী মাত্র।

চার.

আগম খণ্ডন দার্শনিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আল-গাজালি স্বীকার করেন। কেননা যাবতীয় অস্তিত্বশীল বস্তু বা বিষয়ই যদি কারণের অভাবী হয় এবং কারণ যদি আর একটি কারণের অভাবী হয় তাহলে অশেষ অনুগম ঘটবেই। গাজালি এই অনুগমন খণ্ডন করেই এটা ধরে নেন যে, বিশেষণ সত্তার সাথেই নিহিত। সত্তা থেকে একে পৃথক করা যায় না। সত্তা অবশ্যম্ভাবী। সত্তার কোন অনুগমন নেই। তাই সত্তার জ্ঞানের কোন অনুগম নেই। জ্ঞানের কোন কর্তা বা কারণই নেই, তা সঁত্তার সাথে চিরকালই বিনা কারণে বর্তমান রয়েছে। [১১৮]

দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তিঃ

দার্শনিকরা মানবীয় গুণাবলীর সাথে তুলনামূলকভাবে দেখান যে, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণগুলো আমাদের সত্তার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নয়; বরং এগুলি আকস্মিক। জীবনের কোন এক সময় এগুলি আমাদের ওপর আরোপিত হয়। দার্শনিকরা দেখান যে, যখন। এসকল গুণ প্রথম সত্তা বা আল্লাহর ওপর আরোপ করা হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদের ধরে নিতে হবে যে, প্রথম সত্তা বা আল্লাহরও ঐ গুণ বা গুণসমূহ তাঁর প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নয়, বরং এটা আকষ্মিক এবং আরোপিত বিষয়। প্রথম সত্তা বা আল্লাহর ওপর তা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু আরোপিত হবার

---

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪
১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

পরে ঐ গুণ চিরস্থায়ী হয়েছে। দার্শনিকরা দেখান যে, এরূপ বহু আকস্মিক গুণই বিচ্যুত হয় না। যে সত্তার সাথে আরোপিত হয় ঐ সত্তার সাথে ইহা স্থায়ী হয়ে যায়।[১১৯] এইভাবে গুণগুলি তার সত্তার সাথে (যে সত্তার ওপর গুণগুলি আরোপিত হয়েছে) সহ-অবস্থানকারী হয়ে পড়ে। দার্শনিকদের মতে, আকস্মিক গুণ হলেই তা সত্তার অনুসরণকারী হবে, সত্তা হয়ে পরবে তার কারণ আর গুণ হবে তার ফল । কিন্তু এমন হলে এটা অবশ্যম্ভাবী হতে পারবেনা।

ইমাম আল-গাজালির অভিযোগঃ

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের প্রদত্ত দ্বিতীয় যুক্তিকে পরিবর্তিত ভাষায় প্রথম যুক্তি বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, প্রথম যুক্তির সাথে এর তেমন কোন পার্থক্য নেই। আল-গাজালি দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তি খন্ডনের জন্য নিম্নেক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন :

এক.

দার্শনিকরা আদিসত্তাকে বা আল্লাহকে তার গুণাবলীর কারণ বলে প্রতীয়মান করেছেন। আর কারণকে আদিসত্তা বা আল্লাহর কর্মের ফল রূপে দেখিয়েছেন। গাজালি একথা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। কেননা তাহলে তা আমাদের সত্তার সাথে আমাদের একটি বিশেষ গুণ, যেমন জ্ঞান, এর এমন সম্পর্ক বোঝাতে পারে যে, জ্ঞান হল আমাদের সত্তার কারণ। কিন্তু আমরা ভালো করেই উপলব্ধি করি যে, আমাদের সত্তাই আমাদের জ্ঞানের কারণ নয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তার নিজ গুণের কারণ হতে পারেন না।[১২০]

দুই.

দার্শনিকদের শব্দ প্রয়োগের অদক্ষতা বা অপকৌশলের প্রতি আল-গাজালি নজর দেন। তিনি দেখান যে, দার্শনিকরা কিছু গুরুগম্ভীর শব্দ (অনুসরণকারী, অবিচ্ছেদ্য, অতিদরকারী ফল, কারণ ইত্যাদি) ও নামকরণজাত ভড়ং দ্বারা এবং এগুলি যে অর্থহীন এটা বলে দিয়েই আমাদের ভীতিগ্রস্থ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করেন নি।

তিন.

দার্শনিকরা আল্লাহর সত্তায় গুণারোপকে এই কারণে ব্যাখ্যা করতে চান না। যে, কিছু সংখ্যক গুণারোপ করলে আল্লাহ অভাবী হয়ে যাবেন। গাজালি বলেন, যাবতীয় গঠনই গঠনকারীর অভাবী'– একথা ঠিক। এইভাবে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই সৃষ্টিকর্তার অভাবী'– এই সিদ্ধান্তের জন্য বলা যায়, প্রথম বস্তু অনাদি, এর কারণ নেই, কোন সৃষ্টিকর্তাও নেই। আর এভাবেই বলা যায় যে, প্রথম কারণ বা প্রথম সত্তার (বা আল্লাহর) বিশেষণ আছে, তিনি অনাদি, কারণহীন বিশেষ্য, তার কারণ নেই। এটা কারণহীন অনাদি।।

এসকল যুক্তি খণ্ডন ছাড়াও আল-গাজালি আল্লাহর গুণের স্বপক্ষে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং শরিয়তের কিছু কথা উল্লেখ করেন।

ইমাম গাজালি সাধারণ ধার্মিক গোত্রের নিম্নেক্ত মানুষের বিশ্বাসসমূহের কথা উল্লেখ করেন:

১. যারা নবী-রাসূল-এর সততায় বিশ্বাসী, তাঁদের এই বিশ্বাসের মূল কারণ তাঁদের মুযিযা দর্শন;

২. যারা নবীগণকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর সম্বন্ধে মানবীয় যুক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করতে বিরত থাকেন।

৩. যারা আল্লাহর গুণকে মানবীয় যুক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকেন;

---

১১৯. প্রাগুক্ত

১২০. আল-গাযালী:*তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. যারা আল্লাহর গুণ সম্পর্কে নবী (সা.) যা বলেছেন, তা-ই স্বীকার করে নিয়েছেন;

৫. যারা জ্ঞানী, ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর এই সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা শরিয়তের বিধান মনে করেন;

৬. যারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন শব্দ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন যা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

ইমাম আল-গাজালি এই সকল শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেন, দার্শনিকরা কিভাবে এঁদের যুক্তি বা বিশ্বাসসমূহ খণ্ডন করবেন? গাজালি দেখান যে, দার্শনিকরা ঐসকল মানুষদের অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগে অক্ষম মানুষ বলে মনে করেন। কিন্তু গাজালি মতে, দার্শনিকদের এমনটি মনে করা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা। বরং তাঁদের (দার্শনিকদের) নিজেদের যুক্তিই যে সঠিক নয়, গাজালি তা প্রমাণ করেছেন। গাজালি একথা স্বীকার করেন যে, বিশ্বাসী মানুষের বিরুদ্ধে দার্শনিকরা যেসকল যুক্তি প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে যেভাবে অবমূল্যায়ন করেছেন তার প্রতিউত্তর দেওয়ার জন্যই তিনি এই অধ্যায়ের আলোকপাত করেছেন। তাছাড়া শরিয়ত অনুসারে আল্লাহ্ গুণাবলী স্বীকার করার দার্শনিক ভিত্তি তিনি রচনা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।[১২১]

গাজালির নিজের অভিমতঃ

ইমাম আল-গাজালি আল্লাহর গুণকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতেঃ

১. আল্লাহর গুণ তার সত্তার সাথে বিদ্যমান, একে তাঁর সত্তা থেকে আলাদা করা যায়। তাই এই গুণ স্বীকার করে নিলে দ্বৈততা আসার প্রশ্নই ওঠেনা।

২.আল্লাহর সত্তার যথেষ্ট গুণগুলি অবশ্যম্ভাবী সত্তার থেকে আলাদাভাবে অবশ্যম্ভাবী নয় ।

৩. আল্লাহর ওপর গুণারোপ করলে তাকে সীমিত করা হয় না। আল্লাহর গুণ এবং মানবীয় জাগতিক গুণ একরকম নয়। আল্লাহ যেমন অসীম তার গুণাবলীও তেমনি অসীম।

৪. শরিয়ত যেহেতু আল্লাহর গুণাবলী মেনে নিয়েছে, তাই তা মেনে নেওয়া উচিত।

মূল্যায়নঃ

দার্শনিকরা আল্লাহর গুণাবলী স্বীকার করেন না, কিন্তু কুরআনে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে। মুতাযিলা প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এই গুণগুলোকে রূপক বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ মত সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ নিজে কোন রূপকের আশ্রয় নিতে পারেন না। তিনি কুরআনে স্পষ্টভাবে তার বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যে গুণাবলীগুলো স্বীকার না করা হলে আল্লাহর আল্লাহত্বে অর্থাৎ আর অসীমত্ব ও পরম ক্ষমতাই অস্বীকার করা হয়। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে-

"তিনিই আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন, তিনি ব্যতীত কেহই আরাধ্য ও আনুগত্যের যোগ্য নয়"।[১২২]

১২১. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

১২২. আল-কুরআন, ৫৯:২৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৪

ইমাম গাজালির আত্মা সর্ম্পকিত মতবাদ

দার্শনিকদের মতে, মানুষের আত্মা বা মানবাত্মা একটি স্বয়ং বর্তমান আধ্যাত্মিক পদার্থ। শুধু তাই নয়— এটা স্থাননিরপেক্ষ, অবস্তু বা বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন, দেহের সাথে সম্পর্কিত নয় আবার দেহ হতে বিচ্ছিন্নও নয়। ইমাম আল-গাজালি আত্মাকে স্বয়ং বর্তমান মনে না করলেও একে আধ্যাত্মিক বলে স্বীকার করেন। কিন্তু দার্শনিকগণ তা প্রমাণ করতে গিয়ে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেছেন সেগুলো তিনি যথার্থ মনে করেন । দার্শনিকদের দেওয়া বিভিন্ন যুক্তি পর্যালোচনা করে ইমাম গাজালি এর ভ্রান্তিসমূহ চিহ্নিত করেন। দার্শনিকগণ আত্মাকে একটি স্বয়ং বর্তমান বা স্বয়ং অস্তিত্বশীল একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ হিসেবে প্রমাণ করার পূর্বে জীবাত্মা বা জৈবিক শক্তি, মানবাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেন এবং মানবাত্মার সাথে জীবাত্মার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চিহ্নিত করেন। জীবাত্মা বা জৈবিক শক্তি যে শক্তি সকল জীবদেহের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তা হল জৈবিক শক্তি। জৈবিক শক্তি বা জীবাত্মার কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণির মধ্যে অনেকটা একই রকমভাবে অবস্থান করে।[১২৩] দার্শনিকগণ জীবাত্মা বা জৈবিক শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো:

১. গতি উৎপাদক শক্তি এবং

২. অনুভবকারী শক্তি।

দেহের সঞ্চালন, বর্ধন ইত্যাদি শক্তি হল গতি উৎপাদক শক্তি। গতি উৎপাদক শক্তির মাধ্যমেই দেহ সঞ্চালন, বর্ধন ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়। আর অনুভবকারী শক্তি হল আত্মার এমন এক শক্তি যে শক্তির মাধ্যমে জীবন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যে কোন অনুভব সম্ভব করে তুলতে পারে। অনুভবকারী শক্তি দুই প্রকার। যথা-

১. বাহ্যিক এবং

২. অভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক অনুভবকারী শক্তি পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ জীবদেহ তার হাত, পা, চোখ, কান, ত্বক ইত্যাদি দ্বারা যা অনুভব করে তা বাহ্যিক অনুভবকারী শক্তির মাধ্যমে সম্ভব হয়। আর অভ্যন্তরীণ অনুভবকারী শক্তি মানসিক বা মনোজগতের যে সকল সাধারণ ঘটনা আছে বলে আমরা জানি সেগুলোর সংগঠক। দার্শনিকগণ এই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা:

১. কল্পনা শক্তি

২. বোধশক্তি এবং

৩. চিন্তাশক্তি। নিম্নে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. কল্পনা শক্তি :

কল্পনা শক্তি এমন একটি শক্তি যে শক্তির মাধ্যমে চোখ বন্ধ করেও দৃষ্ট বস্তুর আকৃতি রক্ষিত হয়। জীবের পঞ্চইন্দ্রিয় যা অনুভব করে কল্পনায় তা সংগৃহীত হয় এবং কোন না কোন সময়ে ইন্দ্রিয় সংবেদন এমনকি উপলব্ধির বস্তু না থাকলেও বা সংবেদন সৃষ্টি না হলেও উক্ত বস্তুর গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা জন্মে। কল্পনাশক্তি না থাকলে কেউ শুধু মধু দেখেই তার স্বাদ না নিয়েই তার মিষ্টতা অনুমান করতে পারতো না। দার্শনিকদের মতে, কল্পনাশক্তির স্থান মস্তিস্কের সম্মুখে ও দৃষ্টিশক্তির পেছনের দিকে।[১২৪]

---

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫

১২৪. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

Dhaka University Institutional Repository

২. বোধশক্তি :

বোধশক্তি হল এমন একটি অভ্যন্তরীণ জৈবিক শক্তি যার মাধ্যমে। যে কোন ধারণা বোঝা বা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই শক্তির স্থান । মস্তিস্কের সর্বশেষ পশ্চাৎভাগে বলে দার্শনিকরা মনে করেন।

৩. চিন্তাশক্তি বা ধারণা শক্তি :

এই শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের একটিকে অন্যটির সাথে মিশ্রণ এবং তার মাধ্যমে নতুন কোন ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। আমরা পঙ্খীরাজ ঘোড়া, অশ্বদেহে নরমুণ্ড বিশিষ্ট মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবতে পারি, এসব এক ধরনের মিশ্র চিন্তা। চিন্তাশক্তি নিজস্বভাবে এই যোগ্যতা সংরক্ষণ করে। দার্শনিকদের মতে, এক্ষেত্রে চিন্তাশক্তি কল্পনা শক্তিকেও একত্র করে বসে, কল্পনার আশ্রয় বা কল্পনাকে কাজে লাগায়। তাঁদের মতে, চিন্তাশক্তি বা ধারণাশক্তির স্থান হল মস্তিস্কের মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তির লব্ধ আকৃতি রক্ষক কোষ অর্থাৎ কল্পনাশক্তি রক্ষক কোষ এবং অর্থের বা বোধশক্তি রক্ষক কোষের মধ্যে। মানবাত্মা দার্শনিকদের মতে, মানবাত্মা কেবল জীবাত্মা নয়। জীবাত্মার বৈশিষ্ট্যগুলি জীব হিসেবে মানবাত্মার মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মানবাত্মা জীবাত্মা বা জীবনীশক্তি থেকে অতিরিক্ত শক্তির ধারক। দার্শনিকদের মতে, একমাত্র মানুষের আত্মাই বাকশক্তিসম্পন্ন। বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কথা বলার শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কার্যত কথা বলতে পারুক আর না পারুক তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন ছোট শিশু কথা বলতে পারে কথা বলার শক্তি বা বাকশক্তির দ্বারা। বাশক্তি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। দার্শনিকগণ একে প্রকাশ্য জ্ঞানের বিশিষ্টতম ফল বলে। মন্তব্য করেন। দার্শনিকগণ মানবাত্মার দুই ধরনের শক্তি রয়েছে বলে দেখিয়েছেন। তা হলো:

১. জ্ঞানশক্তি

২. কর্মশক্তি।

জ্ঞানশক্তিকে দার্শনিকগণ চিন্তাশক্তিও বলেছেন। জ্ঞানশক্তির কাজ হল কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং ঐ বিষয়সমূহের বস্তুনিরপেক্ষ তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

কর্মশক্তি হলো এমন একটি শক্তি যা মানবদেহকে কোন গঠনমূলক কর্মের দিকে উত্তেজিত করে তোলে। দার্শনিকদের মতে, মানুষের গঠন-প্রকৃতি থেকেই এই শক্তি উদ্ভূত হয়ে থাকে। মানবাত্মার এই দুই ধরনের শক্তিকে দার্শনিকগণ দুই ধরনের বুদ্ধি বলেও অভিহিত করেছেন। যাইহোক, মানবাত্মার দুটি ভিন্নধর্মী গুণ রয়েছে। তার মধ্যে চিন্তাশক্তি একটি উচ্চতর শক্তি। এর মাধ্যমে মানুষ ফেরেশতাদের মতো উর্ধ্ব জগতের জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে পারে। কর্মশক্তি চিন্তাশক্তির চেয়ে গুণগত মানের দিক থেকে কিছুটা নিম্ন প্রকৃতির। এটা দেহের গতি, প্রচেষ্টা, আত্মিক অভ্যাস ইত্যাদি গঠন করে থাকে। সর্বপ্রকার দৈহিক কর্মের অভ্যন্তরীণ প্রেরণা হল কর্মশক্তি।

এতক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে মানবাত্মার যে বর্ণনা দেওয়া হল তাতে করে এর কর্ম অনুযায়ী বিভাগগুলোকে নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

মানবাত্মা

১.জ্ঞানশক্তি (জ্ঞান গ্রহণকারী)

২.কর্মশক্তি (দৈহিক কর্মের প্রেরণাদানকারী)

Dhaka University Institutional Repository

এতক্ষণ জীবাত্মা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তা স্পষ্ট করার জন্য জীবাত্মার বিভিন্ন অংশকে নিম্নেক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

জীব বা জৈবিক শক্তি

১.গতি উৎপাদক শক্তি

২.অনুভবকারী শক্তি

৩.বাহ্যিক অনুভবকারী শক্তি

৪.অভ্যন্তরীণ অনুভবকারী শক্তি

৫.কল্পনাশক্তি

৬.বোধশক্তি

৭.চিন্তা বা ধারণাশক্তি

ইমাম আল-গাজালি মানবাত্মা ও জীবাত্মা সম্পর্কে দার্শনিকদের যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তাতে করে দেখা যায়, জীবাত্মার সাথে মানবাত্মার বেশকিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো:

১. সকল মানবাত্মাই জীবাত্মা কিন্তু সকল জীবাত্মা মানবাত্মা নয়।

২. জ্ঞানের দিক থেকে জীবাত্মা মানবাত্মার চেয়ে নিম্নমানের। জীবাত্মা মানবাত্মার মতো করে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

৩. জীবাত্মা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন নয়, কিন্তু মানবাত্মা বোধশক্তিসম্পন্ন। মানুষের আত্মা স্বয়ং বর্তমান একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ প্রমাণ করতে দার্শনিকদের প্রদত্ত যুক্তিসমূহ।

মানবাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করে দার্শনিকরা দেখাতে চান যে, জীবাত্মা থেকে মানবাত্মার বিশেষ বিশেষ কিছু দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে, তাই জীবাত্মা একটি সাধারণ আত্মা নয়; এর প্রকৃতি জাগতিক বস্তুসমূহের সাথে তুলনীয় নয়। দার্শনিকদের মতে, মানবাত্মা জাগতিক পদার্থ নয়, এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রকতির। দার্শনিকগণ মানবাত্মাকে আধ্যাত্মিক প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু ইমাম আল-গাজালি সেই সকল যুক্তিগুলোকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে যুক্তি প্রদান করেন।

দার্শনিকদের প্রথম যুক্তি:

দার্শনিকদের মতে, মানবাত্মা জ্ঞানের ধারক। এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু এতে কিছু অবিভাজ্য একক রয়েছে। জ্ঞান যদি অবিভাজ্য হয়, তাহলে জ্ঞানের স্থান বা ধারকও অবিভাজ্য হবে। জ্ঞানের ধারক যেহেতু মানবাত্মা সেহেতু মানবাত্মাকেও অবিভাজ্য হতে হবে। কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থই বিভাজ্য। তাই এটা প্রমাণিত হয় যে, আত্মা কোন জাগতিক পদার্থ নয়। আর আত্মা যদি জাগতিক পদার্থ না হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক পদার্থ । যৌক্তিক আকারে প্রকাশ করলে তাঁদের এই যুক্তির আকার দাঁড়ায়:

ক. যদি জ্ঞানের স্থান বিভাজ্য হয়, তাহলে এতে পতিত জ্ঞান বিভাজ্য হবে।

খ. এতে পতিত জ্ঞান বিভাজ্য নয়।

গ. অতএব, জ্ঞানের স্থান বিভাজ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আর জ্ঞানের স্থান বিভাজ্য না হওয়ার মানে হচ্ছে তা বস্তু নয়। আমরা এই সিদ্ধান্তটিকে নিম্নোক্ত যুক্তিতেও প্রকাশ করতে পারি।যদি জ্ঞানের স্থান বস্তু হয় তাহলে, জ্ঞান বিভাজ্য হবে জ্ঞান বিভাজ্য নয়।অতএব জ্ঞানের স্থান বস্তু নয়।জ্ঞানের স্থান বস্তু না হওয়া মানেই হল তা আধ্যাত্মিক। দার্শনিকরা জ্ঞানের স্থান হিসেবে মানবাত্মাকেই চিহ্নিত করেন, তাই মানবাত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির।[১২৫]

গাজালির অভিযোগঃ

আল-গাজালির মতে, দার্শনিকদের এই ধরনের যুক্তি সঠিক নয়। কেননা বস্তুর সাথে আত্মার তুলনা করা সঙ্গত নয়। তাছাড়া, বস্তুতে যা কিছু আরোপিত হয় তা-ই বিভাজ্য— এর পক্ষে তাদের এমন কোন যুক্তি নেই যে, এটাকে আবশ্যিক মনে করা যায়। দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তি দার্শনিকরা দেখান যে, আত্মার মধ্যে যে, জ্ঞানীয় বিষয় বিদ্যমান আছে সেই জ্ঞানের সাথে দেহের সম্পর্ক এমন যে, তা দেহের সমগ্র অঙ্গের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ যে কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেহের প্রতিটি অংশেরই সম্পর্ক আছে।[১২৬]

গাজালির প্রতিবাদ:

ইমাম আল-গাজালির মতে, এমন মনে করা ভ্রান্ত। কেননা যদি কোন সময় আত্মার মস্তিস্কে অবস্থিত অংশ লেখার ইচ্ছা করে তাহলে হাতে অবস্থিত আত্মার অংশ তা বর্জন করতে পারে। বস্তুত লেখার কাজটি হাত দ্বারা করলেও লেখার জ্ঞান হাতে আছে বা এর অংশ বিশেষ হাতে আছে এমন ভাবা যুক্তিসংগত নয়। কেননা হাত কেটে ফেললে লেখার জ্ঞান বিনষ্ট হয় না।[১২৭]

দার্শনিকদের তৃতীয় যুক্তি:

আমরা জানি, দার্শনিকরা জ্ঞানকে মানবাত্মার একটি অপরিহার্য গুণ বলে মনে করে থাকেন। এখন তাদের মতে, এই জ্ঞান যদি দেহের অংশমাত্র হতো, তাহলে দেহের ঐ বিশেষ অংশমাত্রই জ্ঞানী হত। অর্থাৎ আমরা যদি ধরে নেই, জ্ঞান আছে মস্তিস্কে, তাহলে বলা হতো ঐ লোকের মস্তিস্ক জ্ঞানী। বা যদি ধরা হতো জ্ঞান আছে হাঁটুতে তাহলে আমরা বলতাম যে, ঐ লোকের হাঁটু ভীষণ জ্ঞানী। কিন্তু এমনটি কখনও বলা হয় না; বরং সামগ্রিকভাবে ঐ মানুষটিকেই জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞান হওয়া মানুষের অর্থাৎ সমগ্র মানবসত্তার একটি সাধারণ ধর্ম মনে করা হয়। কোন বিশেষ মানুষের বিশেষ অঙ্গের সাথে এটা যুক্ত নয়। কোন বিশেষ মানুষের সকল অঙ্গসহ ঐ মানুষটিকেই জ্ঞানী বলা হয়। কোন অংশকে বাদ দিয়েও জ্ঞানী বলা যায় না। যেমন এমন বলা হয়না যে, অমুক লোকের মাথার চুল বা পায়ের পাতা ছাড়া পুরোটাই জ্ঞানী। আসলে ঐ মানুষটির সকল অঙ্গসহ পুরো মানুষটিকেই আমরা জ্ঞানী বলে থাকি। জ্ঞান যেহেতু একটি অনির্দিষ্ট বিমূর্ত বিষয়, একে যেহেতু কোন অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত করা যায় না, তাই জ্ঞানের কর্তা বা আত্মা অবশ্যই আধ্যাত্মিক হবে।[১২৮]

---

১২৫. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬

১২৬. প্রাগুক্ত

১২৭. প্রাগুক্ত

১২৮. মো.শওকত হোসেন: *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: তিথি পাবলিকেশন, জানুয়ারী-২০১১), পৃ.১২৬

Dhaka University Institutional Repository

গাজালির প্রতিবাদ:

ইমাম আল-গাজালির মতে, দার্শনিকদের এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা মানুষকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্বাদগ্রহণকারী ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। ঠিকতেমনিভাবে পশুকেও ঐ বিশেষ গুণগুলি দ্বারা বিশেষিত করা হয়ে থাকে। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির অনুভূতি দেহ দ্বারা হয় না। বরং এক্ষেত্রে রূপক ভাষা ব্যবহৃত হয়।

যেমন যদি বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি বাগদাদে থাকেন। এ দ্বারা এটা বোঝায় না যে, ঐ ব্যক্তি বাগদাদের সর্বত্রই আছেন। অর্থাৎ বাগদাদের সকল স্থান জুড়েই তার দেহ অবস্থান করছে, বা বাগদাদের সকল জায়গায়ই তার বসতি আছে। বরং একথা দ্বারা এটা বোঝানো হতে পারে যে, বাগদাদের কোন একটি ছোট্ট স্থানে তিনি থাকেন। এখানে বাগদাদের সকল স্থানে না থেকেও যেমন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি বাগদাদে থাকেন, তেমনি দেহের সকল স্থানে না থাকলেও আত্মাকে বলা যেতে পারে তা দেহের ভিতরে থাকে। তাই দার্শনিকদের উক্ত যুক্তি দ্বারা আত্মার অতি প্রাকৃত বা আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হয় না। [১২৯]

দার্শনিকদের চতুর্থ যুক্তি:

দার্শনিকরা দেখান যে, যদি জ্ঞান হৃদয় অথবা মস্তিস্কের কোন অংশে অবস্থান করে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞানের বিপরীত মূর্খতাকেও হৃদয়ের বা মস্তিস্কের অপর কোন স্থানে অবস্থিত বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এতে করে মানুষ একই সময়ে কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানী এবং মূর্খ উভয়ই হতে পারে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। তাই মূর্খতার স্থান ও জ্ঞানের স্থান অবশ্যই পৃথক হবে। এই দু'টি বিপরীত গুণ একই সাথে অবস্থান করা অসম্ভব। তবে যদি তা বিভক্ত হতো তাহলে কিছু অংশে মূর্খতার অবস্থান আবার কিছু অংশে জ্ঞানের অবস্থান আছে বলে ধরে নেওয়া অসম্ভব হতো না। কেননা দুটি বিপরীত বিষয় কোন বস্তুর বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে। যেমন, একই কাপড়ের একটি অংশে সাদা অন্য অংশে কালো এরকম বিভিন্ন রং এর হতে পারে। কিন্তু জ্ঞান হলো অবিভাজ্য, তাই তার স্থান একই সংগে । মূর্খতার সাথে হতে পারে না। এতে প্রমাণ হয় যে, জ্ঞান হৃদয় বা মস্তিস্ক এরকম কোন বিশেষ অংশে কেন্দ্রীভূত থাকে না। অতএব আত্মা দেহে অবস্থান করে না। আত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির।[১৩০]

ইমাম আল-গাজালির প্রতিবাদ:

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই চতুর্থ প্রমাণকেও যথার্থ মনে করেন না। তিনি ইচ্ছা আকাংখা, কামনা ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে দার্শনিকদের এই যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন। গাজালি দেখান যে, ইচ্ছা, আকাংখা, কামনা ইত্যাদি বিষয় মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। এগুলি হচ্ছে কতগুলো ভাব, যা দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে। প্রাণের মাধ্যমে এই যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই প্রাণ পশু ও মানুষ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। যোগসূত্র যখন এক হয় তখন তার দিকে বিরুদ্ধ সম্পর্ক আরোপ করা সম্ভব হয় না। তাই বিভিন্ন বিপরীত গুণ (যেমন, জ্ঞান ও মূর্খতা) বিভিন্ন বিপরীত স্থানে অবস্থান করার প্রয়োজন হয় না।[১৩১]

---

১২৯. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, তা.বি. পৃ.১১৭

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিকদের পঞ্চম যুক্তিঃ

দার্শনিকদের মতে, জ্ঞান যদি দৈহিক যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তু অনুভব করে, তাহলে সে নিজেকে জানতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অনুক্রম অসম্ভব। অর্থাৎ জ্ঞান বা মানবাত্মা নিজেকে জানে। অতএব পূর্বক্রম অসম্ভব, অর্থাৎ জ্ঞান বা আত্মা দৈহিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটা একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ বিধায় এটা এমন ক্ষমতাসম্পন্ন।

দার্শনিকরা বলেন যে, দর্শন ক্রিয়া যখন দেহ দ্বারা সংঘটিত হয় তখন দর্শন। দর্শকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে না। কেননা দৃষ্টিশক্তি দেখা যায় না। তেমনিভাবে কান শোনে, কিন্তু শ্রবণশক্তি শোনা যায় না। এরকমভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের বেলায়ই এটা প্রযোজ্য। কাজেই জ্ঞান যদি দৈহিক অংগ দ্বারা অনুভূত হত তাহলে এটা অপরকে – জানতো কিন্তু নিজেকে জানতো না।

ইমাম আল-গাজালির প্রতিবাদঃ

দার্শনিকদের পঞ্চম যুক্তিও ইমাম আল-গাজালি স্বীকার করেন না। গাজালির মতে, একথা স্বীকার করা যায় যে, অনুক্রমের বিপরীত বর্জন দ্বারা পূর্বক্রমও বিপরীত সিদ্ধান্ত হবে। তবে এটা কেবল তখনই ঘটবে যখন অনুক্রম ও পূর্বক্রমের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু দার্শনিকগণ আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুক্রম ও পূর্বক্রমের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক আছে— একথা প্রমাণ করতে পারেন নি। তাই দার্শনিকদের আলোচ্য যুক্তি যথার্থ নয়। গাজালির মতে, জ্ঞান অপরকে যেমন জানে তেমনি নিজেকেও জানে। দার্শনিকরা দেহের অংশের সাথে যেভাবে তুলনা করেছেন তা এখানে সঙ্গত নয়। এখানে এটি একটি ব্যতিক্রম। আর এটা আমরা স্বীকার করি যে, স্বভাবের ব্যতিক্রম অসম্ভব কিছু না।[১৩২]

দার্শনিকদের ষষ্ট প্রমাণ :

দার্শনিকগণ প্রমাণ করতে চান যে, আত্মা দেহের কোন বিশেষ অংগে বা অংশে অবস্থান করে না, তাই এটা দৈহিক বিষয় নয়— এটা আধ্যাত্মিক। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মানবদেহের কোন বিশেষ অংগে বা অংশে আত্মা অবস্থান করলে তাহলে আত্মা ঐ অংগকে বা অংশকে উপলব্ধি করতে বা জানতে পারে না। যেমন, দৃষ্টিশক্তি চোখে আছে, চোখের মণির মাধ্যমে চোখ দেখে কিন্তু চোখ নিজে নিজের চোখের মণি দেখতে পায় না। তেমনিভাবে আত্মা যদি হৃদয় বা মস্তিস্কের মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে আত্মা হৃদয় বা মস্তিস্ক সম্পর্কে জানতে পারতো না।কিন্তু আত্মা হৃদয় এবং মস্তিস্কসহ দেহের সকল অংগ সম্পর্কে জানতে পারে। তাই আত্মা দেহের মধ্যে অবস্থান করে না। আর দেহের মধ্যে অবস্থান করা অর্থই হলো তার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক।

আল-গাজালির প্রতিবাদঃ

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই ধরনের প্রমাণকেও ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁর মতে আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে না এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তিনি দেখান যে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ ইত্যাদি অনুভব আমাদের হৃদয়েই সংঘটিত হয়। আত্মার সাথে হৃদয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক না থাকলে এমনটি হওয়া কি সম্ভব? তাছাড়া দেহের অন্য বিভিন্ন অংগ রয়েছে যা কেটে ফেললে বা অকেজ হয়ে গেলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বা তা কেটে ফেললে মানুষ বেঁচে থাকতে। পারে না। তাই এ থেকে এটা ধারণা করা অসম্ভব কিছু নয় যে, আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। তাই দার্শনিকরা যেভাবে আত্মাকে হৃদয়ে বা অন্য কোন

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গে অবস্থান করে না বলে ঘোষণা করেন তা সুনিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। আর দার্শনিকরা যেভাবে ইন্দ্রিয়ের নিজের জ্ঞানকে নিজের দ্বারা উপলব্ধ হয় না বা কোন অংগের নিজের অনুভব নিজের হয় না বলেছেন, যেমন চোখ তার নিজের দৃষ্টিশক্তি এবং মনি দেখে না- একথার জবাব পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। বস্তুত: এটি আবশ্যিক নয়। আত্মার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে বা হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়।

দার্শনিকদের সপ্তম যুক্তি:

দার্শনিকদের সপ্তম যুক্তিতে তাঁরা এটা দেখাতে চান যে, আত্মা দেহের কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান করে না বা দেহের অংশ নয়। তাই এর প্রকৃতি আধ্যাত্মিক। দার্শনিকরা দেখান যে, যে কোন বস্তুগত সত্তা ব্যবহৃত হতে হতে তা হয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না হয় তার কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন চোখ দেখতে দেখতে এক সময় দৃষ্টি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা দৃষ্টি ক্ষমতা কমে যায়। আত্মাও যদি দেহের কোন অংশ হতো তবে তাও ঐ রকম ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে যেতো। কিন্তু দেখা যায় যে, দেহের ক্ষয়ের মুখে মানুষের জ্ঞান কমে না। আবার দেহ পুষ্ট হলে জ্ঞানও বেড়ে যায় না। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না।

মোট কথা, আত্মার ক্ষমতা দেহের ক্ষমতার সাথে ওঠা-নামা করে তাই এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা দেহের কোন অংশ নয়। তাছাড়া যে কোন বস্তুগত পদার্থই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু আত্মা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা আত্মার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হয়— এমন বলা চলে না। তাই আত্মা দেহের অংশও নয়, আবার দেহের মত কোন জড়ীয় বিষয়ও নয়। অতএব আত্মা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ।[১৩৩]

গাজালির অভিযোগ:

দার্শনিকদের সপ্তম যুক্তি ইমাম আল-গাজালি মেনে নেন না। তাঁর মতে, দৈহিক অংগের সাথে বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে না এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দার্শনিকরা কতিপয় দৈহিক অংগের উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কতিপয় বিষয়ের ক্ষেত্রে যা সত্য বা স্বীকার্য তা সকল বিষয়ের ওপর নির্বিচারে চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

দার্শনিকদের অষ্টম যুক্তি:

দার্শনিকরা দেখান যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানব দেহ বর্ধিত হয় এবং এই পর্যন্ত এসে মানব দেহে স্থিতি আসে, অর্থাৎ বর্ধন বন্ধ হয়ে যায়। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই এর পরে মানবদেহ ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। আত্মা দৈহিক হলে তাতেও এমন অবস্থা দেখা দিতো ।[১৩৪]

আল-গাজালির অভিযোগ:

দার্শনিকদের অষ্টম যুক্তিকেও ইমাম আল-গাজালি ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। তিনি দেখান যে, যে কোন শক্তির তা দৈহিক হোক আর অদৈহিক হোক, ক্ষয়ের কারণ অসংখ্য। কোন কোন শক্তি জীবনের প্রথম দিকে বৃদ্ধি পায়, আবার কোন কোন শক্তি জীবনের মধ্যভাগে বৃদ্ধি পায়, আবার কোন কোন শক্তি বৃদ্ধি পায় জীবনের শেষভাগে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এমন বয়স অনুসারে বৃদ্ধি হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় বয়স বৃদ্ধিতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তিনি দেখান যে, জ্ঞানশক্তির জন্যই পরে হয়, তাই দৈহিক শক্তির পরেও তার কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি দেখান যে, দার্শনিকরা যে দৃষ্টিশক্তির উদাহরণ দিয়েছেন সেই দৃষ্টিশক্তির জন্ম দেহের জন্মের সাথেই হয়। কিন্তু বুদ্ধি সাধারণত ১৫ বছরের নীচে হয় না। গাজালি দেখিয়েছেন যে,যদি জ্ঞানগত শক্তি দেহে

---

১৩৩. প্রাগুক্ত

১৩৪. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান থাকে, তবে দেহের দুর্বলতা সর্বাবস্থায় একে দুর্বল করবে।এখানে অনুক্রম অসম্ভব, অর্থাৎ দেহের দুর্বলতা সর্বাবস্থায় জ্ঞানগতশক্তিকে দুর্বল করে না পূর্বক্রম অসম্ভব, অর্থাৎ জ্ঞানগতশক্তি দেহে অবস্থান করে না।এর পরেও দার্শনিকরা বলেন যে, যদি কোন কোন অবস্থায় অনুক্রম বর্তমানও থাকে, অর্থাৎ দেহের দুর্বলতা জ্ঞানশক্তিকে দুর্বল করে, তবুও পূর্বক্রম অবশ্যম্ভাবী নয়।

অর্থাৎ এতে করে আবশ্যিকভাবে এটা প্রমাণিত হয় না যে, জ্ঞানগত শক্তি দেহেই অবস্থান করে। অথবা দৃষ্টিশক্তির স্থান দেহ হলে বাঁ দৃষ্টিশক্তি দৈহিক হলে ঘ্রাণ শক্তি আধ্যাত্মিক। বস্তুত: এমন কথার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংগ-প্রত্যঙ্গ বা বিভিন্ন প্রকার শক্তির ধরন ও মাত্রা একরকম হয় না। এগুলির কার্যকারিতাও বিভিন্ন রকমের হয়। তাই এসকল ক্ষেত্রে কোন সর্বজনীন সিদ্ধান্ত চলে। কেননা এসকল বিষয়ের সঠিক পরিমাপের কোন সুযোগ নেই। তাই দার্শনিকদের অষ্টম যুক্তি অনুসারে দৈহিক ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং আত্মিক ক্ষমতা বা জ্ঞানগত ক্ষমতার হাস-বৃদ্ধির যে জরিপ তাঁরা প্রদান করেন তা সঠিক নয়। এবং এর ভিত্তিতে আত্মাকে অদৈহিক প্রমাণ করে তাকে আধ্যাত্মিক বলারও কোন সুযোগ নেই বলে ইমাম আল-গাজালি অভিমত প্রকাশ করেন।[১৩৫]

দার্শনিকদের নবম যুক্তি:

দার্শনিকগণ তাঁদের নবম প্রমাণে দেখান যে, মানব দেহ বিভিন্ন অস্থায়ী গুণের ধারক। এই অস্থায়ী গুণগুলি মাঝে মাঝে বিলুপ্ত হয় আবার বৃদ্ধি পায়। দেহ বিভিন্ন সময়। ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আবার বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণের ফলে ঐ ক্ষয় পূরণ হয়। আবার আমরা দেখি যে, কোন শিশু মায়ের দুধ খাওয়া অবস্থায় তার শারীরিক গঠন যেমন থাকে মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে যখন স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ করে তখন থেকে তার শারীরিক গঠনে বেশ পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে একটি মানবশিশু শৈশব পেড়িয়ে যৌবনে, যৌবন অতিক্রম করে মধ্য বয়সে পৌঁছায়। ৪০ বছর পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি ও আংগিক গঠন বর্ধিত হতে থাকে। আবার চল্লিশ বছর পরে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে যার অনেক ক্ষয় খাদ্য দ্বারাও পূরণ করা সম্ভব হয় না। দেহের এই বিভিন্ন অবস্থায় দেহ কি একই দেহ থাকে? না দেহকে একই দেহ বলা যায় না। সেই শিশু দেহ আর যুবক/ যুবতী অবস্থায় বা বার্ধক্য বা প্রৌঢ় অবস্থায় দেহ কখনও একই দেহ নয়। কিন্তু আমরা একথা নিশ্চিত বলি যে, এই মানুষটি শৈশবের সেই মানুষ। অর্থাৎ প্রতিটি অবস্থায়ই একটি মানুষ তার দৈহিক যতই তারতম্য ঘটুক না কেন, সে একই মানুষ থাকে। যেমন যায়েদ ছোট বেলায়ও যায়েদ ছিল, যুবক বয়সেও যায়েদ ছিল, মধ্য বয়সেও যায়েদ আবার পৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যে পতিত হলেও যায়েদই থাকবে। কেননা মানুষের জ্ঞান, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব এটা মূলত স্থায়ী বিষয়। মানুষের চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের ওপর এর একটি ধারাবাহিক ও স্থায়ী ছাপ থাকে। আমাদের ছোট বেলার শিক্ষা বয়স্ক অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে। মানুষের আত্মা কোন দৈহিক বিষয় নয় বা দেহের মতো পরিবর্তনশীল বিষয় নয়। বিধায় জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানের মৌলিক পরিবর্তন হয় না। বস্তুত আত্মা দেহাতীত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, দেহ এর যন্ত্র মাত্র।[১৩৬]

আল-গাজালির প্রতিবাদ:

আল-গাজালি দেখান যে, দার্শনিকদের নবম প্রমাণের দ্বারাও এটা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। তাঁর মতে, দার্শনিকরা যেভাবে জ্ঞানের বিষয়ের স্থায়িত্বের কথা বলেছেন, তা সঠিক নয়। শিশু আর যুবক

১৩৫. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
১৩৬. প্রাগুক্ত,পৃ.১২৮

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার জ্ঞান হুবহু একইভাবে পরিণত বয়স পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না। তাঁর মতে, জ্ঞান একটি মানসিক প্রতিকৃতি রেখে লোপ পায়। আর দেহের যে পরিবর্তনের কথা দার্শনিকরা বলেছেন, সেই রকম আমূল পরিবর্তনও মানবদেহে অন্তত ঘটে না। বরং এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত বচ। আছে, তাহল: মানুষ যদি ১০০ বছরও বাঁচে তাহলেও নিশ্চিতভাবে তার দেহে পিতৃবীর্যের কিছু অংশও বাকি থাকে।' এতে প্রমাণিত হয় যে, মানবদেহও জ্ঞানের মতে কিছু অংশ বা কিছু সারসত্তা সর্বাবস্থায় ধারণ করে চলে। এ প্রসঙ্গে আল-গাজালি একটি উদাহরণ প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, যদি কোন পাত্রে এক পোয়া গোলাপের নির্যাস রাখা হয়, অতঃপর যদি তাতে এক পোয়া পানি ঢালা হয়, যাতে ঐ পানি ও গোলাপের নির্যাস মিশ্রিত হয়ে যায়। এর পর যদি এটা হতে এক পোয়া সাধারণ পানি তার মধ্যে মিশানো হয় এবং তার থেকে এক পোয়া পানি ফেলে দিয়ে আবার এক পোয়া সাধারণ পানি মিশানো হয় এবং এই প্রক্রিয়া যদি সহস্রাধিক বারও চলতে থাকে তবুও তাতে প্রথম মূল গোলাপ নির্যাসের কিছু অংশ অন্তত বিদ্যমান থাকবে। কোন ক্রমেই এমন অবস্থা হবে না যে ঐ মিশ্রণে মূল গোলাপ নির্যাসের কিছু না কিছু পরিমাণ মিশ্রিত নেই । দেহের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটে। দেহ যত পরিবর্তন, বর্ধন লাভ করুক তার মধ্যে পিতবীর্যের অংশ বর্তমান থাকে। দেহ যখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় তখনও এর মধ্যে পিতৃবীর্যের অংশ বিদ্যমান থাকবে। তাই জ্ঞানশক্তির স্থিতিশীলতা এবং দৈহিকশক্তির স্থিতিশীলতার বিষয়টি অনেকটা একই রকম; এদের মধ্যে প্রকৃতিগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। তাই একটিকে জড় এবং অন্যটিকে আধ্যাত্মিক বলার কোন পথ খোলা নেই বলে ইমাম আল-গাজালি মনে করেন।[১৩৭]

দার্শনিকদের দশম যুক্তি:

দার্শনিকগণ দেখান যে, মানুষ এক ধরনের প্রাণী, কিন্তু যে কোন প্রাণী নয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কেবল প্রাণ ও আকার রয়েছে আর রয়েছে কিছু অস্থায়ী বিশেষ বিশেষ গুণাবলী। মানুষেরও এই অস্থায়ী বিশেষ বিশেষ গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। তবে মানুষের এর অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী রয়েছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, যে বুদ্ধিবৃত্তির জন্য মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী রয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বিভিন্ন প্রকার সৎগুণ ইত্যাদি সার্বিকগুণ রয়েছে।

এই সার্বিক গুণগুলো বিমূর্ত প্রকৃতির। কোন বিমূর্ত বিষয় জড়বস্তু হতে পারে না ।তাই এগুলো আধ্যাত্মিক। দার্শনিকদের মতে এই বিমূর্ত গুণগুলো মানবাত্মার গুণ । তাই মানবাত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির । দার্শনিকরা আরও দেখান যে, চোখ, কান, ত্বক, দ্বারা যা উপলব্ধ হয়, তার থেকে মানুষের বুদ্ধিতে যা উপলব্ধ হয় তার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিশেষ, কিন্তু বুদ্ধি বিমূর্ত সার্বিকের জ্ঞান দান করে। আর এই বিমূর্ত সার্বিক সর্বদা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই আত্মা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির।[১৩৮]

আল-গাজালির প্রতিবাদ:

দার্শনিকদের দশম যুক্তিও আল-গাজালি গ্রহণ করেন না। তিনি দেখান যে, মানুষ সাধারণত সরাসরি কোন সার্বিকের জ্ঞান লাভ করে না। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক ইত্যাদি অংগ । থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার বিশেষ বিশেষ অনুভব বা খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার জ্ঞানই বুদ্ধি প্রথম লাভ করে। এবং এগুলো বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি সার্বিক ধারণা গঠন করে। যেমন ইন্দ্রিয় কোন একটি বিশেষ বস্তু দেখে কিন্তু আমাদের বুদ্ধি তা নিয়ে ভেবে তাকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে।

---

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

১৩৮. মাওলানা মোঃ মোহিবুল্লাহ আজাদ: *ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ* (ঢাকা, আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স.তা.বি.২০১৮), পৃ.২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তবে যুক্তির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়াও বিমূর্ত জ্ঞান লাভ করা যায়। তবে এটি খুব ব্যতিক্রম বিষয়। সচরাচর তা ঘটেনা। তাছাড়া, এক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা কোন না কোন ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এ থেকে চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আত্মা একটি দেহবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়। গাজালি মূলত বোঝাতে চান যে, দার্শনিকরা সার্বিক বলতে বা সার্বিক জ্ঞান বলতে যা বুঝিয়েছেন সার্বিকের বা সার্বিক জ্ঞানের সেই অর্থ সঠিক নয়। গাজালির মতে, ইন্দ্রিয় যা উপলব্ধি করে জ্ঞানেও তার থেকে অতিরিক্ত কিছু উপলব্ধি হয়না। পার্থক্য এখানে যে, ইন্দ্রিয়ে এটা অবিশ্লেষ্যরূপে অবস্থান করে, আর জ্ঞান একে বিশ্লেষণ করতে পারে। এবং বিশ্লেষিত ধারণাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত থাকে। তাই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে জ্ঞানের ধারক আত্মাকে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত এবং অদৈহিক বলার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে ইমাম আল-গাজালি মনে করেন। অর্থাৎ দার্শনিকদের এই ধরণের যুক্তি মানব আত্মাকে আধ্যাত্মিক বলে প্রমাণ করতে পারে না বলেই আল-গাজালি অভিমত প্রকাশ করেন।

মানুষের আত্মার অবিনশ্বরতা প্রসঙ্গে:

মানুষের আত্মা সংক্রান্ত বিষয় গ্রিক দার্শনিকগণ এবং মুসলিম চিন্তাবিদগণ বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। আত্মা সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনার মধ্যে আত্মার অবিনশ্বরতার সমস্যা একটি বিশেষ দার্শনিক সমস্যা। মানুষের মৃত্যুর পরে আত্মা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, নাকি দেহাবসানের পরেও আত্মা অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে— এ প্রশ্ন সর্বকালের মানুষকে কমবেশী ভাবিয়ে তুলেছে।ফালাসিফা শ্রেণীর মুসলিম দার্শনিকগণ আত্মার অমরত্ব বা আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে, মানুষের আত্মা একবার সৃষ্টি হলে তার আর অস্তিত্বহীন হওয়া বা ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। আত্মা চিরস্থায়ী। এর ধ্বংস কল্পনা করা অসম্ভব। ইমাম আল-গাজালিও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। তিনিও মনে করেন যে, আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আত্মা অবিনশ্বর কিন্তু তবুও তিনি দার্শনিকদের আত্মার অবিনশ্বরতার স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, আত্মা অবিনশ্বর ঠিকই, কিন্তু দার্শনিকরা যেভাবে আত্মাকে অবিনশ্বর বলেছেন সেভাবে আত্মার অমরত্ব বা অবিনশ্বরতা প্রমাণিত হয় না। দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ ভ্রান্ত । ইমাম গাজালি দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে এই ভ্রান্তিসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস নেন।[১৩৯]

আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণে দার্শনিকদের দেওয়া যুক্তিসমূহ:

আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণ করার জন্য দার্শনিকরা যে সকল যুক্তি প্রদান করেছেন ইমাম আল-গাজালি সে সকল যুক্তিসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করেছেন।

দার্শনিকদের প্রথম যুক্তি:

দার্শনিকরা দেখান যে, আত্মা যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে ধ্বংস হতে হবে :

ক) দেহের মৃত্যুর দ্বারা আত্মার ধ্বংস সংঘটিত হবে;

খ) আত্মাতে আপতিত কোন বিপরীত ঘটনা, বা বিষয় দ্বারা আত্মার ধ্বংস

সংঘটিত হবে;

গ) সর্বশক্তিমানের (আল্লাহর) ক্ষমতা দ্বারা আত্মার ধ্বংস সাধিত হবে।

দার্শনিকগণ দেখাতে চেষ্টা করেন যে, এই তিনটি বিকল্পের কোনটি দ্বারাই, যৌক্তিকভাবে, আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারেনা।

---

১৩৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিকল্প দ্বারা যে কারণে আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না:

দার্শনিকরা দেখান যে, প্রথম বিকল্প অর্থাৎ দেহের মৃত্যুর দ্বারা আত্মার ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা :

১. আত্মা দেহের কোন অংশ বা অংগ নয়। অথবা দেহ আত্মার আধারও নয়। তাই দেহের ধ্বংসের সাথে আত্মার ধ্বংসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

২. দার্শনিকদের মতে, দেহ হচ্ছে আত্মার একটি যন্ত্র বিশেষ। আর আত্মা হল তার যন্ত্রী বা চালক। যন্ত্রের ধ্বংসের দ্বারা যেমন যন্ত্রীর ধ্বংস অবশ্যম্ভামী নয়, তেমনি দেহের ধ্বংসের দ্বারা আত্মার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী নয়।

৩. যদি দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক আজাদী হয়, বা দেহ ও দৈহিক শক্তি একাকার হয় তাহলে আত্মা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। দার্শনিকদের মতে, ইতর প্রাণীর আত্মা এই শ্রেণীর, তাই এক্ষেত্রে আত্মার ধ্বংস সম্ভব। কিন্তু আত্মা যদি দেহের অংশিদারীত্ব ছাড়া স্বতন্ত্র কিছু কর্ম সম্পাদন করে থাকে তাহলে তার ধ্বংস সম্ভব নয়। মানবাত্মা স্বতন্ত্রভাবে স্মৃতি, অনুভূতি, ক্রোধ ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাই মানবাত্মা দেহের সাথে ধ্বংস হতে পারে না।

৪. আত্মার দেহ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাজ হচ্ছে জ্ঞানগ্রাহ্য বিষয়সমূহের বস্তুনিরপেক্ষ উপলব্ধি। আত্মার এই কর্ম সম্পাদন করতে দেহের কোন সাহায্য দরকার হয় না। যেহেতু আত্মার পক্ষে দেহনিরপেক্ষ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব এবং তার অস্তিত্বও। দেহনিরপেক্ষ; তাই তার অস্তিত্বের জন্য দেহের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় বিকল্প দ্বারা যে কারণে আত্মা ধ্বংস হতে পারে না। দার্শনিকদের মতে, আত্মার ওপর আরোপিত বিপরীত কোন ঘটনা বা বিষয় দ্বারা আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না, কেননা : পদার্থের কোন বিপরীত অবস্থা নেই। পদার্থের পরিবর্তিত অবস্থা বা রূপান্তরিত অবস্থা রয়েছে। পদার্থ কখনই ধ্বংস হয় না, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দার্শনিকরা দেখান যে, পানির আকৃতি এর বিপরীত বায়ুর আকৃতি দ্বারা বিনষ্ট হয় বলে মনে হয়, কিন্তু এর মূল উপাদান মূলত: একই এটা কখনও পরিবর্তিত হয় এমনকি পরিবর্তনের ক্ষেত্র ও উপাদান কখনও ধ্বংস হয় না। তাই আত্মার ধ্বংস এর বিপরীত বিষয় বা বস্তু দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। তৃতীয় বিকল্প দ্বারা আত্মা যে কারণে ধ্বংস হয় না আত্মা কোন শক্তি দ্বারা ধ্বংস হতে পারে না। কেননা ধ্বংস বা অনস্তিত্ব কোন বস্তু নয়। যে তা শক্তি দ্বারা সংঘটিত করা হবে।[১৪০]

মানুষের আত্মার অবিনশ্বরতা খণ্ডনে দার্শনিকদের প্রদত্ত প্রথম যুক্তির অসারতা প্রমাণে ইমাম আল-গাজালির যুক্তি

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের প্রদত্ত প্রথম যুক্তিকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এই যুক্তি মূলত: তাঁদের জগতের অনাদিত্ব প্রমাণের যুক্তিরই অনুরূপ। আল-গাজালি নিম্নোক্তভাবে দার্শনিকদের যুক্তিসমূহের সমালোচনা করেন :

প্রথমত :

দেহের 'ধ্বংসের সাথে আত্মা ধ্বংস হয় না, বা দেহের মৃত্যুর সাথে আত্মার মৃত্যু হয় না, তাই আত্মা অমর দার্শনিকদের এই যুক্তি ঠিক নয়। দার্শনিকদের মতে, আত্মা দেহে অবস্থানকারী নয় বিধায় দেহের মৃত্যুতে বা দেহের ধ্বংসের মাধ্যমে আত্মার মৃত্যু বা আত্মার ধ্বংস হয় না। ইমাম আল-গজালির মতে, দার্শনিকদের এই যুক্তির ভিত্তি হল 'প্রথম সমস্যা অর্থাৎ জগতের অনাদিত্ব। জগতের অনাদিত্ব যেহেতু তারা সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি তাই এর মাধ্যমে আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণিত হয় না।

১৪০. মাওলানা মোঃ মোহিবুল্লাহ আজাদ: প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ

যদিও দার্শনিকদের মতে, আত্মা দেহে অবস্থান করে না, তথাপি এটা বাস্তব যে, দেহের সাথে এর কোন না কোন যোগাযোগ বিদ্যমান। কেননা দেহ সৃষ্টি না হলে আত্মা সৃষ্টি হয় না। এমনকি ইবনে সীনা ও অন্যান্য কিছু মুসলিম দার্শনিকরা একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু দেহের সাথে আত্মার কী ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে সে সম্পর্কে তারা কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। দেহ ও আত্মার মধ্যে সম্পর্কের যোগ্যতাও অজ্ঞাত। কিন্তু অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত মত প্রদান করা নিঃসন্দেহে একটি ভ্রান্তিপূর্ণ কাজ। কেননা এমনও হতে পারে যে, এই যোগ্যতা (অজ্ঞাত যোগ্যতা) আত্মার অমরত্বকে দেহের স্থায়ীত্বের ওপর নির্ভর করে দেহের ধ্বংসকে আত্মার ধ্বংসের কারণ করে তুলতে পারে। তাই অজ্ঞাত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত অনুমিত করাই ঠিক নয়। দেহের সাথে সম্পর্কিত আত্মার ক্ষেত্রেও তাই এমন যুক্তি দেওয়া যায়না যে, দেহের মৃত্যুর সাথে আত্মার মৃত্যুর, দেহের ধ্বংসের সাথে আত্মার ধ্বংসের কোন সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়ত :

দার্শনিকরা আল্লাহর কুদরতে আত্মার ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। গাজালির মতে, এটা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, তার ক্ষমতার বাইরে কিছু নেই। তিনি ইচ্ছা করলেই এমনটি করতে পারেন। আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়, বা আল্লাহর পরিবর্তিত ইচ্ছা থাকতে পারে না (তাহলে তাঁর সত্তায় পরিবর্তন আসে) বলে দার্শনিকরা যে যুক্তি দিয়েছেন, সে সম্পর্কে ইমাম আল-গাজালি কোনো নতুন যুক্তি আরোপ না করে তিনি কেবল দেখান যে, দার্শনিকদের এই যুক্তি জগতের অবিনশ্বরতার যুক্তি খণ্ডনের সময়ই প্রদত্ত হয়েছে। তাই দার্শনিকদের এই যুক্তি দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরতা বা আত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয় না।

চতুর্থত:

দার্শনিকরা তাদের প্রথম যুক্তিতে আত্মার ধ্বংস হবার (যদি আত্মা ধ্বংস হয়) তিনটি বিকল্প পথ বা উপায়ের উল্লেখ করেছেন। এবং এই তিনটি বিকল্পের কোনটি দ্বারা আত্মা ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, এটার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেই তারা বলতে চান। যে, আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, এটা অবিনশ্বর বা অমর। কিন্তু আল-গাজালি এখানে প্রশ্ন করেন যে, দার্শনিকরা কেন তিনটি বিকল্পই গ্রহণ করলেন বা বিবেচনা করলেন, তাঁরা কেন এর চেয়ে বেশী বিকল্পের কথা বললেন না। আর যদি নাইবা বলেন তাহলে তাদের দেখাতে হবে যে, এর চেয়ে অন্য বিকল্প গৃহীত হতে পারে না, বা অন্য কোন উপায়ে জগত ধ্বংস হতে পারে না। দার্শনিকরা কোথাও এমনটি প্রমাণ করেন নি যে, আত্মার ধ্বংস এই তিনটি বিকল্পের অন্য কোন বিকল্পের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, আত্মার ধ্বংসের চার বা তার চেয়ে বেশী বিকল্প থাকতে পারতো। আর তাহলে দার্শনিকদের উল্লেখিত তিনটি বিকল্পের দ্বারা না হলেও অন্যকোন বিকল্পের দ্বারা আত্মা ধ্বংসের সম্ভাবনা থেকে যায়।[১৪১]

আত্মার অবিনশ্বরতার পক্ষে দার্শনিকদের দেওয়া দ্বিতীয় যুক্তি :

প্রথমত:

দার্শনিকরা দেখান যে, স্থাননিরপেক্ষ বস্তু বা বিষয়ের কোন ধ্বংস সম্ভব নয়। অন্য কথায় বলা চলে যে, মূল পদার্থগুলির কখনও কোন অস্তিত্বহীনতা বা ধ্বংস কল্পনা করা যায় না। আত্মা হল একটি স্থাননিরপেক্ষ বস্তু বা মূল পদার্থ, তাই আত্মার ধ্বংস বা বিনাস হয় না। আত্মা অবিনশ্বর।

১৪১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত:

দার্শনিকরা দেখান যে, কোন বস্তুর অস্তিত্বের শক্তি তার অস্তিত্বের পূর্বেই তাতে বিদ্যমান থাকে। তাই অস্তিত্ব ঐ বস্তু ব্যতীত অন্যকিছু। তবে তা স্বয়ং অস্তিত্বের সম্ভাবনা হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণতা দর্শনের শক্তি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণতা দর্শনের পূর্বেই চক্ষুর মধ্যে নিহিত থাকে। আর কার্যত যখন কৃষ্ণতা দর্শন সংঘটিত হয়, তখন সেই শক্তি কার্যত কৃষ্ণতা দর্শনের সাথে একত্রে চক্ষুতে বিদ্যমান থাকে না। বস্তুত অস্তিত্বের শক্তি আর প্রকৃত অস্তিত্ব কখনও একরকম হয় না।

এছাড়া, যদি মূলবস্তু বা বিষয়সমূহ অস্তিত্বহীন হয়, তাহলে অস্তিত্বহীনতার পূর্বেই ঐ বস্তুতে অস্তিত্বহীনতার সম্ভাবনা থাকতে হবে। এর পর তাতে অস্তিত্বের সম্ভাবনাও থাকবে। কেননা যা ধ্বংস সম্ভব তা অবশ্যম্ভাবী সত্তা নয়। সুতরাং তা হচ্ছে সম্ভাব্য সত্তা। আর অস্তিত্বের শক্তি বলতে আমরা অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেই বুঝে থাকি। তাই এ থেকে বোঝা যায় যে, একই বস্তুতে একই সাথে অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং তার কার্যত অস্তিত্বলাভ উভয়ই থাকতে পারে। অর্থাৎ একই বস্তু শক্তিতে এবং কার্যে বর্তমান থাকা সম্ভব বোঝায়। কিন্তু এ দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে যখন কোন বস্তু সম্ভাবনায় থাকে, তখন তা কার্যত থাকে না। আর যখন তা কার্যত থাকে, তখন তা আর সম্ভাবনায় থাকে না।

তাই এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মূল বস্তুসমূহের জন্য ধ্বংসের পূর্বে ধ্বংস প্রমাণ করতে যাওয়া অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্তিত্বের অবস্থা বলে প্রমাণ করতে যাওয়ার সদৃশ। কিন্তু একই সাথে এমন বিপরীত অবস্থার সহাবস্থান যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু মূল বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা অসম্ভব হবে। আত্মা একটি মূল বস্তু তাই এক্ষেত্রেও এটা অসম্ভব। তাই আত্মার ধ্বংস সম্ভব নয়। আত্মা অবিনশ্বর।[১৪২]

দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে গাজালির প্রতিবাদ :

ইমাম আল-গাজালি আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণে দার্শনিকদের প্রদত্ত দ্বিতীয় যুক্তিকেও ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এটা দার্শনিকদের প্রদত্ত সেই যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি যা তারা জগতের অনাদিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে দিয়েছিলেন। দার্শনিকরা ঐখানে সম্ভাব্য জগত ও সৃষ্ট জগতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এখানেও সম্ভাব্যতা, অসম্ভাব্যতার সেই রকম ব্যাখ্যাই উপাস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। গাজালি ঘোষণা করেন যে, এই যুক্তির মূল অন্তনিহীত উদ্দেশ্য হল আত্মাকে তারা একটি অনাদি বস্তুই ভাবতে চান। আর এই অনাদি বস্তু ধ্বংস হয়না বলেই তাদের বিশ্বাস। জগতের অনাদিত্বের বিষয়টি জড়জগত সম্পর্কিত ছিল। এখানে বিষয়টি জড় জগত সম্পর্কিত না হলেও যুক্তির ধরন ও প্রয়োগ একই ধরনের। তাই গাজালি বলেন: "আমরা এই আলোচনার গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। উহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। কারণ এখানেও একই সমস্যা। এখানে জড় পদার্থ বা আত্মত্মিক পদার্থ যাহাই আলোচিত হোক না কেন, তাহাতে কোনই পার্থক্য নেই।"[১৪৩]

পর্যালোচনা :

মানুষের আত্মা হাত, পা, মাথার মতো কোন দৈহিক অংগ নয় বলে দার্শনিকদের বিশ্বাস। মানুষের মৃত্যুর পরে তার দেহ বিনষ্ট হয়। সকল অংগ-প্রত্যঙ্গ পচে-গলে যায়, কিন্তু আত্মার কি হয়? আত্মা কি ধ্বংস হয়? দার্শনিকদের মতে,

১৪২. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭
১৪৩. মো.শওকত হোসেন: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা ধ্বংস হয় না; এটা একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ। তাই একে তারা ধ্বংসযোগ্য মনে করেন না। ইমাম আল গাজালিও আত্মাকে দেহের মতো ধ্বংসশীল সত্তা মনে করেন না। তবে দার্শনিকদের দেওয়া যুক্তি গাজালি গ্রহণ করেন না। গাজালি দেখান যে, দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ দ্বারা আত্মার অবিনশ্বরতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় না। ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন তা অনেকাংশেই যৌক্তিক।

তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন: "আমরা এই আলোচনার গোপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি। উহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। কারণ এখানেও একই সমস্যা। বস্তুত আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুকেই অনাদিত্বের মর্যাদায় উপনীত করা ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিতে যেমন চরম অপরাধের কাজ, তেমনিভাবে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ। থেকেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই ক্ষেত্রে ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের যুক্তি খন্ডন করে যথার্থ ইমানী দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই সাথে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মৌলিকত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামি শরিয়ত অনুসারে আত্মাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসশীল বলা হয়নি। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে ব্যক্তিসত্তার বিলোপ হয়। ব্যক্তিআত্মা উপভোগ করে তার দৈহিক মৃত্যুর সাধ। কোরআনে বলা হয়েছে :

كل نفس ذاءقة الموت

"প্রতিটি আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"[১৪৪]

কিন্তু তাতে করে এটা বোঝানো হয়নি যে, আত্মা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। বরং এতে করে এটা বোঝানো হয়েছে যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুরিত হয়। মানুষের সকল জীবনীশক্তি এবং উপলব্ধির মূল নিয়ামক হল আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মা দেহান্তর হয়। কিন্তু আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। মানুষের পার্থিব জীবনের সকল পাপ-পুণ্যের বিচার হবার জন্য আত্মাকে অমর হতে হয়। আত্মাই ভোগ করে শান্তি আর শান্তি।দার্শনিকদের দ্বিতীয় যুক্তিও গ্রহণ করেন না। তাঁর মতে, এই যুক্তি যথার্থ নয়। তিনি নিম্নোক্তভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করেন :

১. গাজালির মতে, এটা স্বীকার করা যায় যে, কোন জিনিস সৃষ্টি হতে হলে তার সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি লাগে এবং কিছু পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। দার্শনিকরা যে উদাহরণ দিয়েছেন তাও গাজালি যথার্থ বলে মনে করেন। কিন্তু লৌহ থেকে তুলা উৎপন্ন হতে কত সময় লাগবে সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট কিছু দার্শনিকরা বলেন নি বলে ইমাম গাজালি উল্লেখ করেন। তিনি দেখান যে, আল্লাহ্ কত সময়ে, মানুষ সৃষ্টি করবেন তা কিন্তু। আমাদের জ্ঞাত নয়। তাই আল্লাহও ধীরে ধীরে অস্থি-মাংশ সংযোজন করে মানুষ সৃষ্টি করবেন কিনা তা আমরা জানি না। তবে তার প্রক্রিয়া হলে তিনি বললেই সব হয়ে যায়।

২. আল্লাহর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়মের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা সংগত নয়। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেননা আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান।

৩. জগতের বিভিন্ন কার্যের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই নিয়ম একটি আবশ্যিক নিয়ম, এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। বস্তুত: কার্য-কারণ সম্পর্ক অনিবার্য নয়, এটা একটি সাধারণভাবে গৃহীত ধারণা মাত্র। প্রত্যেক কার্য ও ঘটনাকে এই নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে এমন নয়। আর বিশেষ করে আল্লাহ্র কার্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মের নিয়ন্ত্রণতো কল্পনাই করা যায় না। আল্লাহর কার্যপদ্ধতি তাঁর ইচ্ছাধীন, কোন নিয়মের অধীন নয়। তাই আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন।

১৪৪. আল-কুরআন, ০৩:১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. আল্লাহর শক্তির ভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত ও আশ্চর্যজনক, তেমনি তাঁর কর্মপদ্ধতিও বিচিত্র প্রকারের। এই বিচিত্র প্রকারের কর্মের মধ্যে সকল কর্মপদ্ধতি আমাদের জ্ঞাত নয়। আল্লাহ্র কর্ম-পদ্ধতি বিচিত্র, তার মধ্যে আমরা যে সকল বিষয় দেখি কেবল সে সম্পর্কেই বলতে পারি। কিন্তু এমন অনেক কর্ম-পদ্ধতি রয়েছে যে সম্পর্কে আমরা অবগত নই। যেমন, বিভিন্ন মুয্যি, কিরামত ইত্যাদি। এসবের অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত।এগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। যদিও এসবের কর্ম-পদ্ধতি আমরা জানি না। আর যদি এমন দাবী করা হয় যে, যে সকল কর্ম পদ্ধতি আমরা জানি না সেই সকল কর্ম স্বীকার করা যাবে না, তা সঙ্গত হবেনা। যেমন গাজালি দেখিয়েছেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, আমরা চুম্বক ও লোহার মাঝে কোন প্রকার সূতা বাঁধা দেখি না বা একে অন্যকে কোন মাধ্যম দ্বারা টানে এমনও দেখি না; কিন্তু আমরা একথা সবাই বিনা দ্বিধায়ই স্বীকার করি যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। তাই কোন বিষয়ে না দেখলেই আমরা বলবো তা নেই, এমনটি হতে পারে না। অতএব একথা স্বীকার করে নিতে কোন বাধা নেই যে, আল্লাহ পরম ক্ষমতাবান, তার ক্ষমতার ভান্ডার সীমিত নয়। তিনি যেমনভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন।[১৪৫]

দার্শনিকদের তৃতীয় যুক্তি

দার্শনিকগণ দেখান যে, আল্লাহর কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। আল্লাহ্ সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত, সুশৃংখল কিছু কর্মপদ্ধতিতে কাজ করেন। জগতের সকল নিয়মশৃঙ্খলা এ জন্যই রক্ষিত হয়। আল্লাহ্ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের আচরণ করলে বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করলে জগতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। তাই আল্লাহ সর্বদা একই নিয়মে কাজ করেন। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাঁর রয়েছে নির্ধারিত কর্ম-পদ্ধতি। এমনকি তিনি কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেনও। আল্লাহ্ বলেছেন: "আমার কর্মপন্থা এক ব্যতীত ভিন্ন নয়, ইহা চোখের পলকের ন্যায়।" (সূরা: ৫৪, আ: ৫০) ।তিনি আরও বলেছেন : "আল্লাহর কর্ম-পদ্ধতির কোন পরিবর্তন দেখবে না।" (সূরা ৩০, আ: ৬২)। এখন আল্লাহর কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত, এবং তার কোন পরিবর্তন হয় না একথার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি যখন কোন নীতি বা কর্ম-পদ্ধতি চালু করেন তখন ঐ পদ্ধতি আর বন্ধ করেন না। মানুষের শরীর গঠনের একটি নিয়ম আল্লাহ্ চালু করেছেন তাই সেই নিয়ম বহাল থাকাই শ্রেয়। আর যদি পরকালে দৈহিক পুনরুত্থান হয়, অন্তত: একবার এটা সম্ভব হয়, তাহলে তা একটি নিয়মে পরিণত হবে। আর এই নিয়ম একবার চালু হয়ে গেলে তা অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে। হয়তোবা প্রতি দশ লক্ষ বছর পরেও এই বিষয়ের অর্থাৎ পুনরুত্থানের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। পুনরুত্থান বারবার সংঘটিত হতে পারে না। তাই দৈহিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

গাজালির প্রতিবাদ

ইমাম আল-গাজালি দেখান যে, দার্শনিকদের এই ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। নিম্নোক্ত কারণে এটা ভ্রান্ত:

১. আল্লাহ্ একই নিয়মে সাধারণত কাজ করে থাকেন একথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ঐ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ঐ নিয়মের বাইরে তিনি যেতে পারেন বস্তুতঃ আল্লাহ্ সাধারণত একই ধরনের নিয়মে কাজ করে থাকেন কিন্তু ইচ্ছা করলে আল্লাহ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। তিনি অন্য নিয়মে বা অন্য কর্ম-পদ্ধতিতে কাজ করতে পারেন। কেননা তিনি সর্ববিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১৪৫. মাওলানা মোঃ মোহিবুল্লাহ আজাদ: প্রাগুক্ত, পৃ.২৬০

Dhaka University Institutional Repository

২. ইমাম আল-গাজালি দেখান যে, এই তৃতীয় প্রমাণে দার্শনিকরা যেভাবেই তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করুক না কেন তাদের বক্তব্য মূলত জগতের অনাদিত্ব এবং অবিনশ্বরতা অন্যদিকে কার্য-কারণ নিয়ম এবং প্রাকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এই দুই ধরনের মৌল বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গাজালি দেখান যে, এই দুই প্রকার মৌল বিশ্বাসই যে ভ্রান্ত তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪৬]

মূল্যায়ন

দৈহিক পুনরুত্থানের সমস্যা আল-গাজালির হাফুতুল ফালাসিফায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। দার্শনিকরা দৈহিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে যে মত দিয়েছেন গাজালি তাকে সরাসরিভাবেই শরিয়ত বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত: ইসলামি শরিয়তে দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে দৈহিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে: "এবং যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে (মানুষকে) একত্রিত করবেন সেদিন (তাদের মনে হবে যে,) তাদের অবস্থিতি দিনের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল, তারা পরস্পরকে চিনবে।" [১৪৭]

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহর সামনে পরকালে মানুষ যখন। পুনরুত্থিত হবে তখন প্রত্যেক মানুষ একে অন্যকে চিনবে, পৃথিবীর জীবন তাদের কাছে। ক্ষণকালীন মনে হবে। এখন যদি একে অন্যকে চিনতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই দৈহিকভাবে পুনরুত্থান হতে হবে। আল্লাহ্ যেমনটি করে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনি করেই তিনি আবার নতুন করে মানুষের দেহ সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহ্র কাছে অসম্ভব কিছু নয়। কুরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য! সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতপর তার পুনরুত্থান ঘটান।" (সূরা ১০, আয়াত : ৪) দার্শনিকদের অনেকেই মাটি থেকে পুনরায় মানুষ সৃষ্টিকে অসম্ভব বলে মনে করেন। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন: "আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন সম্পর্কে ভাবো, কিভাবে তিনি জমীন মৃত হবার পর পূনর্জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে (মানুষকে) পুনরায় জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা রুম, আ: ৫০)। আল্লাহ্ এখানে দেখিয়েছেন যে, ভূমি একসময় শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় তখন তাতে কোন ফসল জন্মায় না, এমনি অনেক জীবিত ফসল ও উদ্ভিদ মরে যায়। ভূমি বা মৃত্তিকার এই অবস্থাকে মৃত অবস্থা বলা হয়েছে। কিন্তু আবার আমরা লক্ষ্য করি যে, ঐ মৃত্তিকায় পানি আসে। আল্লাহর অনুগ্রহে তখন ক্রমশ তা উদ্ভিদ ও ফসল ফলানোর উপযোগী হয়ে ওঠে; এই অবস্থাকে বলা হয়েছে জীবিত অবস্থা। আল্লাহ মৃত্তিকাকে যেমন মৃত থেকে জীবিত করেন। মানুষের দেহকেও নিশ্চয়ই এমনভাবে মৃত থেকে জীবিত করা তাঁর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। আর সবচে বড় কথা, তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী।

যারা দৈহিক পুনরুত্থানে অস্বীকতি জ্ঞাপন করে আল্লাহ তাদেরকে বিতণ্ডাকারী' বলে উল্লেখ করেন। দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে মানুষের সৃষ্ট বিভ্রান্তির উল্লেখ করে সুরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেন : "মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে গলে যাবে?' বল, তার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এট প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি

১৪৬. আল কুরআন, ১০:৪৫
১৪৭. আল কুরআন, ৩০:৫০

Dhaka University Institutional Repository

তার অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

যে সকল লোক দৈহিক পুনরুত্থান স্বীকার করবেনা সে সকল লোকের জন্য চরম শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে জান্নাতবাসীদের একে অপরের সাথে এক কথোপকথনের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন (তাদের কথোপকথন এমন হবে) :"তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ কেউ বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল সে বলতো, তুমি কি সত্যি এতে বিশ্বাস করো যে, আমাদের মৃত্যুর পর, আমরা হাড় ও মাটি হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আবার হিসাব নেওয়া হবে?' বলা হল, তোমরা কি তাদের দেখতে চাও?" তারপর সে ঝুকে দেখবে আর তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।"[১৪৮]

বস্তুত দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। আর দার্শনিকরা যেভাবে দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়টিকে রূপক বলে চালিয়ে দিতে চান তাও সঙ্গত নয়। কেননা কুরআনে এটা স্পষ্ট করেই বর্ণনা করা হয়েছে, রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয় নি। কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা আপাত দুর্বোধ্য সেসকল বিষয়ের রূপক বর্ণনা আছে। এবং আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, এর অর্থ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করা সঙ্গত নয়। আল্লাহ্ স্পষ্টতই ঘোষণা করেন :"তিনিইতোমাদের প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফেৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানেননা। এবং যারা সুবিজ্ঞ তাঁরা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। বস্তুত বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[১৪৯]। দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি, এ বিষয়টিতে কুরআনে একাধিক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি রয়েছে। তাই এটাকে কখনই রূপক বলা যাবে না। বরং স্বীকার করে নিতে হবে যে, দৈহিক পুনরুত্থান হবেই ।

'আত্মা একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ'—এ সম্পর্কে আলোচনা।

ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকরা মানুষের আত্মাকে একটি স্বয়ং বর্তমান আধ্যাত্মিক পদার্থ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবনে সিনাসহ প্রায় সকল মুসলিম দার্শনিকই আত্মা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম আল-গাজালি মুসলিম দার্শনিকদের এ আলোচনাকে পর্যালোচনা করে দেখান যে, আত্মাকে আধ্যাত্মিক পদার্থ রূপে প্রমাণ করতে দিয়ে দার্শনিকরা যে সকল যুক্তি দিয়েছেন তাঁর অনেক যুক্তিই যথার্থ নয়। ইমাম গাজালি অবশ্য আত্মার আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামি শরিয়ত অনুসারে আত্মাকে আধ্যাত্মিক হিসেবেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু তার ধারণা যদি দার্শনিকদের মতো করে আত্মার অমরত্বের স্বীকার করা হয়, তাহলে তাতে করে আত্মার অমরত্বের প্রমাণের বদলে তা অপ্রামাণ হয় এবং অনেক দিক থেকে তা শরিয়ত বিরোধী মতের সৃষ্টি করে। ইবনে রুশদ মুসলিম দার্শনিক ও গাজালির যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দার্শনিকদের মতবাদকেই রক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি গাজালির যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫০]

গাজালির যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা

---

১৪৮. আল-কুরআন, ৩৭:৫০-৫৫

১৪৯. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

১৫০. আল-গাযালী: *তহাফুতুলফালাসিফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে রুশদ গাজালির যুক্তিসমূহ যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন নিচে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। তবে সংগত কারণেই ইমাম গাজালির মতের খুবই সংক্ষিপ্ত সার এখানে উল্লেখ করা হবে। গাজালি দার্শনিকদের আত্মার বিভাগকরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছেন। গাজালির মতে, দার্শনিকগণ মানুষের প্রবৃত্তিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটি জ্ঞানের অংশ এবং অন্যটি কল্পনাশক্তি। আত্মার অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দেখিয়ে তিনি পশুদের আত্মার সাথে মানুষের আত্মারও তুলনামূলক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি দেন; যা দার্শনিকরা করেছেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এর পরে তিনি এই মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস নিয়েছেন। গাজালির এ ধরনের অভিযোগের জবাবে ইবনে রুশদ প্রথমে গাজালির যুক্তি খণ্ডন করেই এই বলে গাজালির প্রতিবাদ করেন যে, দার্শনিক বলতে গাজালি যদি ফালাসিফা সম্প্রদায় বা জগতের সকল দার্শনিকদের কথা বলেন তাহলে তিনি ঠিক করেন নি। কেননা উপরোক্তভাবে আত্মাকে বর্ণনা করা অর্থাৎ মানুষের আত্মাকে উদ্ভিদ আত্মা এবং প্রাণি আত্মা থেকে উক্ত প্রক্রিয়ায় পৃথক করে মানবাত্মাকে আধ্যাত্মিক বলে প্রমাণ করার যে প্রচেষ্টা তা জগতের সকল দার্শনিক তো দূরের কথা, এমনকি ফালাসিফা সম্প্রদায়ের সকল দার্শনিকও এ ব্যাপারে একমত ছিলেন না।[১৫১]

ইবনে রুশদ দেখান যে, এটি একমাত্র ইবনে সিনার মতবাদ। ইবনে সিনাই একমাত্র মানুষের বুদ্ধি সংক্রান্ত প্রবৃত্তি বা বৌদ্ধিক প্রবৃত্তিকে মানুষের কল্পনা শক্তি থেকে আলাদা করেছেন। এবং কল্পনাকে সবচেয়ে অবৌদ্ধিক বলে মনে করেছেন। গাজালির এই অভিযোগটি তাই কেবল ইবনে সিনার ওপরই প্রযোজ্য। ইবনে রুশদ-এর ভাষায় :

All this is nothing but an account of the theory of the philosophers about these faculties and his conception of them; only he (Ghazali) followed Avicenna, who distinguished himself from the rest of the philosophers by assuming in the animal another faculty than the imaginative.[১৫২]

এক্ষেত্রে ইবনে রুশদও সিনার মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। ইবনে রুশদ একথা স্বীকার করেন না যে, কল্পনাশক্তি থেকে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব বা কল্পনার মধ্যে বৌদ্ধিক কোন কিছু বিদ্যমান থাকে না। তাঁর মতে, ইবনে সিনার মতবাদ সত্য হতো যদি এমন মনে করা যেতো যে, কল্পনাশক্তি এক বিশেষ প্রত্যক্ষণশক্তি নয় এবং প্রাণিদের মধ্যে কল্পনাশক্তির সাথে বুদ্ধির কোন সন্নিবেশ দেখা না যেতো। ইবনে রুশদ বলেন –

“What Avicenna says would only be possible if the imaginative faculty were not perceptive; and there is no sense in adding another faculty to the imaginative in the animal, especially in an animal which possesses many arts by nature”.[১৫৩]

ইবনে রুশদ নিম্নোক্তভাবে গাজালির যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করেন।

১৫১. Averrose: *Tahafut at –Tahafut,*(Internet archive, Last modified edition ,19 Feb.2021,p.359
১৫২. Averrose: ibid, p.359
১৫৩. Averrose: ibid, p.360

Dhaka University Institutional Repository

এক :

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা এমন যুক্তি দিয়েছেন যে, জ্ঞানের স্থান হিসেবে আত্মাকে তাঁরা অবিভাজ্য বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর অবিভাজ্য বিষয়কে তারা আধ্যাত্মিক বলেছেন। এর বিরুদ্ধে গাজালি বলেছিলেন যে, বস্তুতে আরোপিত জ্ঞান বিভাজ্য হবে আর অবস্তুতে আরোপিত বিষয় অবিভাজ্য হবে, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এতে করে এটা বলা যায় যে, জ্ঞান বিভাজ্য বলেই জ্ঞানেরধারক বিভাজ্য হবে। এমন কথা আবশ্যিকভাবে বলা চলে না। তাই জ্ঞান নামক। গুণকে অবিভাজ্য বলায় তাদের ধারক অবিভাজ্য হয়ে যায় না।

ইবনে রুশদ গাজালির অভিযোগটিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। তা হলো :

ক. এই যুক্তির প্রথম অর্থ এমন হতে পারে যে, যদি কোন বিশেষ দেহের কোন বিশেষ অংশে কোন জ্ঞান আশ্রয় করে থাকে, তাহলে ঐ দেহের প্রত্যেক অংশের সংজ্ঞার সাথে তা সমভাবে আরোপিত হবে। যেমন কোন শ্বেত-বস্তুর শুভ্রত্ব গুণটি তাঁর সর্বাঙ্গের ওপরই প্রযোজ্য।

খ. এই অর্থ অনুসারে, যখন কোন গুণকে কোন বিশেষ দেহ বা বিশেষ অংগের ওপর আরোপ করা হয় তখন এই দেহ বা ঐ অংগের সামগ্রিক অংশের ওপর তা আরোপিত হয়, এবং ঐ দেহ বা অংগকে বিচ্ছিন্ন করলে ঐ গুণটি তার ওপর আরোপ করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন চোখের ওপর দৃষ্টিশক্তি গুণটি আরোপ করা হয়, তখন তা সামগ্রিকভাবেই করা হয়ে থাকে। চোখকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে ঐ খণ্ডিত অংশের ওপর দৃষ্টিশক্তি গুণটি প্রয়োগ হয় না। অর্থাৎ ঐ খণ্ড অংশগুলো দেখার কাজ করতে পারে না। ইবনে রুশদ দেখান যে, এই বিষয়টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন বোধগম্য বিষয়গুলো কখনও বিভাজ্য হয় না। জ্ঞানের বিষয়টি সে রকমের বিষয়। তাই আমরা এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এর জন্য কোন দৈহিক অংগের দরকার নেই। অতএব এটা আধ্যাত্মিক সত্তার কর্ম। জ্ঞানের ধারক আত্মা তাই আধ্যাত্মিক। দার্শনিকরা মূলত এমনই বলতে চেয়েছেন।

দুই:

দার্শনিকরা আত্মার মধ্যে যে জ্ঞানীয় অংশ রয়েছে তাকে দেহের সকল অঙ্গের সাথে যুক্ত বলে মনে করেছেন বলে গাজালি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আল-গাজালি এই যুক্তিকে ভ্রান্ত মনে করেছেন। তিনি দেখান যে, আত্মার মস্তিষ্কে অবস্থিত অংশ যদি লেখার ইচ্ছা করে আর হাতে অবস্থিত অংশ যদি লিখতে না চায়, তাহলে একটি বিভ্রাট দেখা দেবে। লেখার কাজটি হাত দ্বারা করলেও লেখার জ্ঞান খানিকটা হাতে আছে এমন মনে করা সঙ্গত নয়। এর প্রমাণ এই যে, হাত বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেললেও লেখার জ্ঞান বা কোন বিশেষ জ্ঞানের ঘাটতি হয় না। ইবনে রুশদ দেখান যে, এই আলোচনা প্রথম যুক্তির আলোচনা থেকে অবিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আমরা সেখানে স্বীকার করে নিয়েছি যে, জ্ঞানকে তার উৎস থেকে বা উৎপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক করা যায় না। ইবনে রুশদ-এর ভাষায় :

This discussion is not an independent one, but only a complement to the first, for in the first discussion it was merely assumed that knowledge is not divided by the division of its substratum, and here an attempt is made to prove this by making use of a division into three categories.[১৫৪]

১৫৪. ibid-p, 360

Dhaka University Institutional Repository

তিন:

দার্শনিকরা দেখান যে, মানুষের জ্ঞান কোন বিশেষ অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা এমন বলতাম যে, অমুক ব্যক্তির মাথা জ্ঞানী, অমুক ব্যক্তির হাঁটু খুব জ্ঞানী, ইত্যাদি। বস্তুত: জ্ঞান একটি বিমূর্ত বিষয় যা কোন বিশেষ অঙ্গের সাথে এককভাবে সম্পর্কিত না হয়ে বরং সকল অঙ্গের সাথেই সামগ্রিকভাবে যুক্ত হয়। জ্ঞান যেহেতু একটি অনির্দিষ্ট বিমূর্ত বিষয়, একে যেহেতু কোন বিশেষ অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত করা যায় না তাই জ্ঞানের কর্তা বা আত্মাকে অবশ্যই দেহের সাথে যুক্ত না করে তাকে আধ্যাত্মিক বলে স্বীকার করতে হবে। ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই যুক্তিকে তাঁদের নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেন। তিনি দেখান যে, মানবদেহের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গে জ্ঞান আছে বললে এটা বোঝায় না যে, মানব দেহের সর্বত্রই আত্মা আছে। যেমন কোন লোক বাগদাদে আছেন বলতে এটা বোঝায় না যে, ঐ ব্যক্তি বাগদাদের সকল স্থানে আছেন। ইবনে রুশদ-এর মতে, এক্ষেত্রে ইমাম গাজালির যুক্তি সুস্পষ্ট নয়। তিনি দেখান যে, দার্শনিকরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান শরীরের নির্দিষ্ট কোন অংগের সাথে জড়িত নয়। এবং এটা অত্যন্ত প্রমাণিত সত্য। তাই এক্ষেত্রে গাজালি আপত্তি করতে পারেন না। দেহের সকল স্থানেই আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে নেই, এই কথা মেনে নেওয়া অমুলক কিছু নয়। তবে ইবনে রুশদ দেখান যে, দেহের কোন স্থানে জ্ঞান নেই কিন্তু দেহ ছাড়াও জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে একথা কল্পনা করা যায় না।[১৫৫]

চার:

জ্ঞান যদি দৈহিক কোন অংগ, যেমন হৃদয়, মস্তিষ্ক ইত্যাদির সাথেই সম্পর্কিত বা ইত্যাদির মধ্যেই অবস্থান করতো তবে এর বিপরীত মুর্খতাকেও অনুরূপ অন্য কোন অংগের সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। কেননা একই অঙ্গে বিপরীত গুণ ধারণ করা যায় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, মূর্খতার জন্য কোন বিশেষ অঙ্গকে কেউ চিহ্নিত করে না। তাই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান হৃদয় বা মস্তিষ্ক এমন কোন বিশেষ দৈহিক অংগের ওপর নির্ভরশীল নয়। ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই ধরনের যুক্তি সম্পর্কে বলেন যে, বিভিন্ন বিপরীত গুণ বিভিন্ন অংগ দ্বারা সংঘটিত হওয়ার দরকার নেই। আমরা বিচিত্র ধরনের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা করে থাকি কিন্তু আলাদা কোন অংগ এ জন্য নেই দার্শনিকদের একথা ঠিক আছে। কিন্তু এর থেকে আত্মা আধ্যাত্মিক প্রমাণিত হয় না। পশুদের বেলাও এমন ঘটে কিন্তু দার্শনিকরা মানবাত্মা থেকে পশু আত্মার পার্থক্য করেছেন।ইবনে রুশদ দেখান যে, দার্শনিকদের নামে গাজালির মূল প্রতিবাদ হচ্ছে জ্ঞানকে এমনভাবে তিনি দেহের মধ্যে অবস্থানকারী বলতে চান না যেভাবে বর্ণ এবং অন্যান্য গুণাবলী বস্তুর সাথে বিদ্যমান থাকে। তবে রুশদ-এর মতে, দার্শনিকরা এটা নিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যেসব জ্ঞান পেয়ে থাকি, যাকে সাধারণ জ্ঞান বলা চলে তা মূলত দৈহিক বটে। বস্তুত: আত্মায় দুই ধরনের অবস্থিতি (inherence) আছে বলা হয়। তা হলো : অপ্রত্যক্ষ গুণাবলী (non-perceptive attributes) এবং প্রত্যক্ষ (perceptive) ধরণের অবস্থিতি।তবে ইবনে রুশদ দেখান যে, আত্মা সম্পর্কে দার্শনিকরা এই যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা কেবল দার্শনিক মহলেই সীমাবদ্ধ, সাধারণ মানুষ এমন ভাবে চিন্তা করে। না। তারা কখনও ধারণা করতে পারে না যে, আত্মার পক্ষে একই সময়ে দু'টো পরস্পর বিরোধী চিন্তা করা সম্ভব।

---

১৫৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচঃ

দার্শনিকরা দেখান যে, জ্ঞান যদি দৈহিক অংগের দ্বারা জ্ঞাত হতো তাহলে তা নিজেকে জানতে সক্ষম হতো না। কেননা যা অন্যকে জানে তা নিজেকে জানে না। যেমন চোখ অন্যকে দেখে কিন্তু নিজেকে দেখে না। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর বিপরীত বিষয় কার্যকর। জ্ঞান যেমন অপরকে জানে, তেমনিভাবে তা নিজেকে জানে। অতএব জ্ঞান দৈহিক কোন অঙ্গের সাথে জড়িত নয়, এটা আধ্যাত্মিক। ইমাম আল-গাজালি দেখান যে, এটি একটি ব্যতিক্রম যে, জ্ঞান অপরকে এবং নিজেকে একইভাবে জানে। ব্যতিক্রম কখনও নিয়ম হয় না। আবার নিয়ম হলেও তা যে অপরিবর্তনীয় হবে এমন কোন কারণ নেই। দার্শনিকরা বিষয়টি তাই আবশ্যিকভাবে প্রমাণ করতে পারেননি।ইবনে রুশদ দেখান যে, দৈহিক অঙ্গের সাথে আত্মাকে এভাবে তুলনা করা যায় না। তবে এমনও দৈহিক বিষয় আছে যা নিজের এবং অন্যের ওপর সমভাবে কার্যকর। "it is not impossible that a bodily perception should perceive itself"[১৫৬]

ইবনে রুশদ-এর মতে, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিজাত বিষয় মূলত এক এবং অভিন্ন। রুশদ এর যুক্তি, তাঁর ভাষায় :

No composite can think itself, because if this were so, its essence would be different from that by which it thinks, for it would think only with a part of its essence; and since intellect and intelligible are identical, if the composite thought its essence, the composite would become a simple,and the whole the part, and all this is impossible.[১৫৭]

ইবনে রুশদ-এর মতে, এ ধরনের যুক্তি কেবল তাত্ত্বিক বা দ্বান্দ্বিকভাবে অনুমিত যুক্তিই নয়; বরং এর বাস্তব উদাহরণও রয়েছে। এটা প্রদর্শনযোগ্য এবং এই যুক্তিকে আবশ্যিক হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

ছয়ঃ

দার্শনিকদের ৬ষ্ঠ প্রমাণেও তাঁরা একই রকম কথা বলেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, আত্মা হৃদয় ও মস্তিষ্ক সবকিছুই জানে, সুতরাং আত্মা এগুলোর মধ্যে তথা দৈহিক কোন অংগের মধ্যে আত্মা নেই। গাজালি দেখান যে, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভব আমাদের হৃদয় থেকেই হয়; তাই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, হৃদয়ে আত্মা নেই। এমনও হতে পারে আত্মা হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। ইবনে রুশদ এই যুক্তির জবাবে বলেন যে, দার্শনিকরা কোন্ অংগে আত্মার অবস্থান তা বলেননি। তারা এটা দেখাতে চান যে, দেহের মধ্যে আত্মা আছে, কিন্তু কোথায় আছে এমন কথা তারা বলেন নি। এমন কথাও দার্শনিকরা মনে করেন না যে, দেহ থেকে আত্মার উৎপত্তি হয়েছে।[১৫৮]

সাতঃ

দার্শনিকরা দেখিয়েছেন যে, মানবদেহ সাধারণত চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হয়, এবং তারপর তার কার্যক্ষমতা ক্রমশঃ কমতে থাকে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি চল্লিশ বছর বয়সের পরে কমে না গিয়ে বরং বেড়ে যায়। এতে করে এটা

১৫৬. ibid, p.361.
১৫৭. ibid, p.362.
১৫৮. মো.শওকত হোসেনঃ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধির ধারক আত্মা দৈহিক বিষয় নয়, এটা আধ্যাত্মিক।ইমাম আল-গাজালি এর প্রতিবাদে দেখান যে, যে কোন শক্তি ক্ষয়ের কারণ একাধিক হতে পারে। সকল শক্তি ৪০ বছর পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং এরপর কমতে থাকবে, এমন কোন কথা নেই। তাই জ্ঞানশক্তি ৪০ বছর পরে বাড়া-কমার ব্যাপারটির কোনভাবেই নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় না।ইবনে রুশদ দেখান যে, যদি আমাদের দৈহিক শক্তির মূলে উত্তাপকে ধরে নেয়া হয়, তাহলে দৈহিক বিভিন্ন শক্তি যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তার সাথে সাথে বুদ্ধিও ক্ষয়প্রাপ্ত হবে বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে বিভিন্ন শক্তি এবং বুদ্ধির মৌল শক্তি হিসেবে উত্তাপ একরকম নয়। তিনি আরও দেখান যে, যদি এটা মনে করা হয় যে,বুদ্ধিরমৌল শক্তি (the substrata for the intellect) পরস্পর পৃথক তবুও এটা স্বীকার করা আবশ্যক নয় যে, উভয়ই সমান তালে টিকে থাকে।

আটঃ

দার্শনিকরা দেখান যে, যে কোন দৈহিক অংগ ব্যবহৃত হতে হতে তা ক্রমশ: তার শক্তি হারায়। আত্মা যদি দৈহিক অংগে বিদ্যমান হতো তাহলে তা শক্তিহীন হয়ে পরতো। যেমন চোখ দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হতে হতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার কর্ম হিসেবে জ্ঞানক্রিয়া কখনও নষ্ট হয় না। তাই আত্মা কোন দৈহিক বিষয় নয়— এটা আধ্যাত্মিক। ইমাম আল-গাজালি যুক্তি দেখান যে, এমন কথা আবশ্যিকভাবে বলা যায় না যে, বয়সের সাথে জ্ঞানের ক্রিয়া কমে যায় না। দার্শনিকদের কতিপয় উদাহরণ কখনও সার্বিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা বিধায়ক হতে পারে না। ইবনে রুশদ এ সম্পর্কে বলেন যে, এ ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিবাদ নেই। দার্শনিকগণ সহজবোধ্য বিষয়গুলি (intelligibles)'র ধারক কে এর নিজের মধ্যে না দেখতে পেয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, এগুলো দেহের মধ্যে অবস্থান করে না। ইবনে রুশদ-এর ভাষায় : Since the philosophers found that the receptacle of the inteligibles was not impressed by the intelligibles, they decided that this receptacle was not a body.[১৫৯]

নয়ঃ

দার্শনিকগণ দেখান যে, মানবদেহ বিভিন্ন অস্থায়ী গুণের আধার। এই অস্থায়ী গুণগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কিংবা ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয় না। তাই আত্মা একটি স্থায়ী ধ্বংসহীন বিষয়। ইমাম আল-গাজালি এই যুক্তির বিরুদ্ধে দেখান যে, দৈহিক বিভিন্ন গুণ যে একেবারে পরিবর্তিত হয় তা নয়; দেহেরও মৌল উপাদান সর্বদা এক থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রবাদ তুলে ধরেন তা হলো: 'কোন ব্যক্তি যদি ১০০ বছরও বাঁচে তবুও তার মধ্যে পীতবীর্যের অংশ বিদ্যমান থাকে। দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তির স্থিতিশীলতার বিষয়টি অনেকটা একই রকম, তাই একটিকে জড় এবং অন্যটিকে আধ্যাত্মিক বলার কোন যুক্তি নেই।ইবনে রুশদ দেখান যে, গাজালির অভিযোগের মূল বিষয় হল তিনি মনে করেন যে, দার্শনিকরা দেহের সাথে আত্মাকে একই রকম করে ফেলেছেন, অথচ দেহকে তারা আধ্যাত্মিক বলেছেন। রুশদ-এর মতে, এটি গাজালির একটি বড় রকমের ভুল। দার্শনিকরা কেউ এমনটি বলেন নি। তারা শুধু বলতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন একটি সারসত্তা (essence) বিদ্যমান রয়েছে যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকে।[১৬০]

---

১৫৯. Averrose: ibid, p.361
১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দার্শনিকরা প্রাচীনকালের দার্শনিকদের মতো (গ্রিক দার্শনিকদের মতো) এটা বিশ্বাস করতেন না যে, এ পৃথিবী একটি চিরন্তন পরিবর্তনের আধার। এসকল প্রাচীন দার্শনিকরা যারা জগতের এই স্থায়িত্বের জ্ঞানকে অস্বীকার করতেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্লেটো আকার' (form)-এর ধারণা করতে বাধ্য হন। তাঁর মতে, দৃশ্যমান জগতের পরিবর্তনশীল সবকিছু ধ্বংস হতে পারে কিন্তু আকার কখনও ধ্বংস হয় না। তাই ইবনে রুশদ-এর মতে, গাজালির অভিযোগগুলি সত্য নয় এবং দার্শনিকদের ওপর এটা প্রযোজ্য নয়। "There is no sense in occupying ourselves with this and the objection of Ghazali against this proof is valid."[১৬১]

দশ:

দার্শনিকরা দেখান যে, আমাদের মধ্যে বুদ্ধি রয়েছে। ইন্দ্রিয় ছাড়াও আমরা বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করি। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বিশেষ, কিন্তু বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা বিমূর্ত সার্বিককে জানতে পারি। বিমূর্ত সার্বিক একটা আধ্যাত্মিক বিষয়। তাই বুদ্ধির ধারক আত্মাও আধ্যাত্মিক হবে। ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান যে, জ্ঞান কখনও সার্বিক হয়েই জন্মায় না। অর্থাৎ একসাথে কখনও সার্বিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক ইত্যাদি অংগের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সমন্বয়েই গঠিত হয় সার্বিক জ্ঞান। ইবনে রুশদ-এর মতে, দার্শনিকদের বিরুদ্ধে গাজালির এই অভিযোগও সঠিক নয়। তিনি দেখান যে, গাজালি বৌদ্ধিক বিষয়কে একটি একক (unity) বলেছেন; কিন্তু তা সার্বিক বলে স্বীকার করেন নি। এতে করে বুদ্ধির সাথে ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠানের কোন পার্থক্য থাকে না। তাই গাজালির এই যুক্তি ঠিক নয়। যায়েদ-এর মধ্যে যে জীববৃত্তি রয়েছে খালিদের মধ্যকার জীববৃত্তি থেকে তাকে ভিন্নজাতের বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু গাজালির যুক্তি অনুযায়ী বিষয়টি সেরকম বলেই প্রতিয়মান হয়। ইবনে রুশদ -এর ভাষায় : "Since for Ghazali the intelligible is a unity, but not something universal, and for him the animality of Zaid is numerically identical with the animality which he observes in Khalid. And this is false, and if it were true, there would be no difference between sense-perception and the apprehension of the intellect".[১৬২]

পর্যালোচনা :

মানুষের আত্মা একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সমকালীন মনোদর্শনে কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মাকে অস্বীকার করা হয়। মনোবিজ্ঞানে আত্মাকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হয় না। আত্মাকে নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে প্রয়াসী নয়। তবে মনোদর্শন বা মনোবিজ্ঞান যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন আত্মাকে অস্বীকার করার মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা লক্ষ করা যায় । তবে আত্মাকে যারা আধ্যাত্মিক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁরাও অনেকক্ষেত্রে এমন সব যুক্তির অবতারনা করেছেন যা অনেকক্ষেত্রেই যথার্থ নয়। ইমাম আল-গাজালি সেই বিষয়ে দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গাজালির এই প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য।

---

১৬১. ibid, p.363.
১৬২. আল কুরআন, ১৭:৮৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা চলে আত্মার যথার্থ প্রকৃতি নিয়ে আমরা যতই যুক্তির অবতারণা করি না কেন এ বিষয়ে আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান আছে বলে দাবী করার মতো কোন যুক্তি নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

يسءلونك عن الروح قل الروح من امر ربي

অর্থঃ"তারা আপনাকে রুহ(আত্মা)সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, আপনি বলুন এটা আমার প্রভূর নির্দেশ বৈ কিছুই নয়।"[১৬৩]

অনুচেছদ-৫

ইমাম গাজালির জ্ঞান সর্ম্পকিত মতবাদ

একজন বড় মাপের দার্শনিক হিসেবে গাজালিও জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব হচ্ছে দর্শনের এমন একটি শাখা যেখানে জ্ঞানের স্বরূপ, উৎস, শর্ত, সম্ভাবনা সীমা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইমাম গাজালি তাঁর "আল-মুনকিজ মিনাদ-দালাল" নামক গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে তার জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিক্ষার বিষদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। এ সবের আলোকে তার জ্ঞানতত্ত্বকে নিম্নোক্ত দিকে ভাগ করা যায় :

১. সর্ব প্রকার জ্ঞানের বিচারমূলক পর্যালোচনা :

গাজালি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। যৌবনে পদার্পণ করার মধ্যেই তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দখল স্থাপন করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব মতাদর্শ আত্মস্থ করার জন্য নিরলসভাবে অধ্যয়ন করে যান। এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বলেছেন, "বিশ বছর বয়সের মধ্যে প্রচলিত কোন মতবাদ বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা ছিল না। কোন বাতিনীর (অজ্ঞেয়বাদীর) গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন থেকে আমি বিরত হই নি। কোন জাহিরীর (বাহ্য জ্ঞানীর) ক্রিয়াকলাপ আমার অজ্ঞাত থাকে নি। কোন দার্শনিক মতবাদই আমার অজানা ছিলনা। কোন মোতাকাল্লিন বা তার্কিক ধর্ম তাত্ত্বিকের তত্ত্ব বা তর্কের রহস্য ভেদ না করে আমি ক্ষান্ত হই নি। কোন সুফির মরমী সাধনা, কোন দরবেশের তত্ত্বকথা, কোন নাস্তিকের নাস্তিকতা ছিল না আমার অজ্ঞাত। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই আমার অনুসন্ধিৎসা এরূপ প্রবল ছিল। আমার এ স্বভাব আল্লাহ আমাকে আমার অজ্ঞাতেই দান করেছিলেন।"এ সময়ে গাজালি কোন ধরনের জ্ঞানকেই বিপদজনক বা ক্ষতিকর মনে করতেন। না। তাঁর মতে, কোন জ্ঞানকেই অবজ্ঞা করা যায় না। প্রয়োজন তার নিরপেক্ষ যুক্তিনিষ্ঠ পর্যালোচনা। কেননা ভ্রান্ত তত্ত্বের যৌক্তিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারে প্রকৃত সত্য। জীবনের এ অবস্থা পর্যন্ত গাজালি বিচার-বুদ্ধির প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন।

২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি সংশয় :

বিভিন্ন রকমের জ্ঞান আত্মস্থ করার পর গাজালি লক্ষ্য করলেন যে, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই ত্রুটিপূর্ণ। এ সবের প্রকাশিত তত্ত্ব সুনিশ্চিত সত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর সমসাময়িক সময়ে এক ধরনের নির্বিচারবাদী ধর্মতাত্ত্বিকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা ধর্মের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন তা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল ভ্রান্ত। অর্থাৎ ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনে বহুলাংশেই তাঁরা ব্যর্থ ছিলেন। বিজ্ঞানের ধারণা ও বিশ্বাস যে সব প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল তাও সম্পূর্ণভবে সুনিশ্চিত সত্য প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এমন কি এ কারণেই সময়ের বিবর্তনে বিজ্ঞানের বহু ধারণা বিশ্বাসও বিবর্তিত হচ্ছে।

অন্য দিকে দর্শনের অবস্থা আরো শোচনীয়। দার্শনিকরা যে সকল যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব প্রদানে রত ছিলেন তা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ।[১৬৪]

---

১৬৩. আল-কুরআন, ১৭:৮৫

১৬৪. মাওলানা মোঃ মোহিবুল্লাহ আজাদ: প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২

Dhaka University Institutional Repository

৩. তৎকালীন ফালাসিফা সম্প্রদায়ের মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব

ইমাম গাজালি পর্যালোচনা করে দেখেন যে, গ্রিক দর্শনের অনুকরণে তারা যে সকল তত্ত্ব ও মতাদর্শ প্রদান করেন তা অনেক ক্ষেত্রেই বৌদ্ধিক যুক্তি এবং শাশ্বত ধর্ম ইসলামের অন্তর্নিহিত আবেদনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই তিনি দর্শনকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন।

৪. সুনিশ্চিত সত্য-আবিস্কারের জন্য পদ্ধতিগত সংশয় :

ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির অযথার্থতার কারণ হিসেবে গাজালি একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করলেন তাহলো প্রাধিকার বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। তিনি দেখান যে, জ্ঞানের প্রতিটি শাখাই কোন না কোন প্রাধিকারের স্বীকার। যেমন ধর্মতত্ত্ব কিছু সংস্কার তথা পূর্ব পুরুষের আচার নির্ভর; বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্য-কারণ নিয়ম, শক্তির অবিনাশিতাবাদ ইত্যাদির ওপর অন্ধ আনুগত্য পোষণ করে। অন্যদিকে, দর্শন মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গ্রিক মনন দ্বারা। কিন্তু গাজালি মনে করেন জ্ঞানের যে কোন শাখা হওয়া উচিত প্রাধিকারমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রকৃতির। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন প্রাধিকার বা অন্ধবিশ্বাস নয়, বরং প্রয়োজন হচ্ছে সংস্কার ও প্রাধিকারমুক্ত স্বাধীন মনন। এই স্বাধীন মনন সবকিছুকেই সংশয় করবে (এবং তা করতে বাধ্য)। তবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনিশ্চিত সত্য প্রাপ্তি।[১৬৫]

৫. জ্ঞানের উৎসসমূহ সম্পর্কে সংশয় :

গাজালি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি সংশয় প্রকাশের পরে লক্ষ্য করলেন যে, এর মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করা দরকার। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সকল শাখা কোন্ উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করে তাকেই পর্যবেক্ষণ করা দরকার। সেই উৎস যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে তা থেকে উৎসারিত জ্ঞানও ত্রুটিমুক্ত হবে না। তিনি দেখলেন যে, এসবের ব্যহত জ্ঞানের উৎস প্রধানত দু'টি, তা হল—

i. ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষণ এবং

ii. বিচারবুদ্ধি -

জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষণকে পর্যবেক্ষণ করে গাজালি দেখান যে, এটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের গঠন ও কার্যকারিতা বিভিন্ন শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার ফলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারিত হতে পারি। তিনি দেখান যে, একটি ছোট্ট মুদ্রা একটি বিশাল তারকাকে ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু জ্যামিতিক হিসাব অনুযায়ী আমরা জানি, একটি তারকা পৃথিবীর চেয়েও বহুগুণে বড়। ইন্দ্রিয়ের মত বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞাও, গাজালির মতে, জ্ঞানের যথার্থ মাধ্যম হতে পারে না। কেননা মানব প্রজ্ঞারও রয়েছে অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা। তিনি দেখান যে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণিত অনেক তত্ত্ব-মতাদর্শই ভ্রান্ত বা স্ববিরোধী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।[১৬৬]

৬. জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যাদেশ ও স্বজ্ঞা :

প্রাধিকার, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা জ্ঞানের এইসব বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার পরে গাজালি স্বজ্ঞা বা এক ধরনের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকেই যথার্থ জ্ঞানের প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি দেখান যে,

---

১৬৫. প্রাগুক্ত

১৬৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এই অনুভূতি আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ্ যাদের এই প্রজ্ঞাশক্তি দান করেছেন তারাই জগত জীবনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তবে এর থেকে সুনিশ্চিত হচ্ছে প্রত্যাদেশ। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের সাধনার দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ্ যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁরাই এই দূর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। আল-গাজালি যে কারণে স্বজ্ঞাকেই জ্ঞান-সাধনার যথার্থ উৎস মনে করেছেন। আল-গাজালি তাঁর 'আল-মুনকিদ মিল-আল' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি সবকিছুর উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তথা স্বজ্ঞাকেই জ্ঞানের যথার্থ মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৬৭] এর কারণ নিম্নোক্ত

i. আমাদের যে কোন ইন্দ্রিয় অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু স্বজ্ঞা একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত।

ii. স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আল্লাহ্ কোন কোন মানুষকে অত্যন্ত খুশী হয়ে প্রদান করেন। মূলত: এঁদেরকে জগত জীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্যই তিনি হয়ত তার পছেন্দর মানুষদের প্রজ্ঞাশক্তি দান করেন। তাই এটা কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না।

iii. ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কোন বিষয়ের বাইরে থেকে তা প্রত্যক্ষণ করে বা ধারণা পোষণ করে। কিন্তু স্বজ্ঞা এমন একটি মাধ্যম যা তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে জ্ঞান ও জ্ঞেয় একাকার হয়ে যায়। তাই স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হয় সংশয়মুক্ত সুনিশ্চিত।

প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই সর্বোৎকৃষ্ট হওয়া শর্তেও গাজালি মানুষের জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে,নবুয়তের সমাপ্তি ঘটেছে। আর কোন নবী-রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। প্রত্যাদেশের জ্ঞান সাধনা মানুষের জন্য সমীচীন নয়। মানুষ তার স্বজ্ঞার দ্বার উন্মোচনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিষয়টি একান্তভাবেই আল্লাহর শুভদৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

পর্যালোচনা

ইমাম আল-গাজালি ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু সাধক পুরুষ। সুনিশ্চিত সত্য আবিস্কারের জন্য তিনি জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন সত্যানুরাগী এই সাধক তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করে দেখলেন যে, তাদের অনেক মতবাদই সুনিশ্চিত বলে মনে করা যায় না। তাই তিনি সুনিশ্চিত সত্য আবিস্কার করার জন্য প্রথমেই পদ্ধতিগত সংশয়ের আশ্রয় নেন। তার এই সংশয় পদ্ধতির সাথে আধুনিক দর্শনের জনক রেনে দেকার্তের 'মেডিটেশনে' বর্ণিত সংশয়বাদের আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত: দেকার্ত যে সংশয় পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন ইমাম গাজালি। সংশয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে গাজালি বিজ্ঞান ও সাধারণ বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রাধিকার ও পূর্বস্বীকৃতিকে অস্বীকার করেন। এক্ষেত্রে তিনি কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে সাহসিকতার সাথে সংশয় করেন। তিনি এই নীতির আবশ্যিকতার স্বীকার করেন না। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমও কার্যকারণ নিয়ম সম্পর্কে প্রায় গাজালির মতই অভিমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া। সমকালীন বিজ্ঞানেও কার্য-কারণ নীতিটি একটি অনির্দেশ্য নীতিতে পরিণত হয়েছে। এই দিক থেকে গাজালির চিন্তাকে অনেক অগ্রসরমান বলা চলে।[১৬৮]

---

১৬৭. মো:শওকত হোসেন: *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, (ঢাকা:তিথী পাবলিকেশন-১৯৯৮), পৃ.১০৪

১৬৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গাজালি ইন্দ্রিয় প্রমাণ ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত পরিষ্কার। তবে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে তিনি যে স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন তার প্রকৃতি অতোটা সুস্পষ্ট নয়। অতীন্দ্রিয় কোন কিছুকেই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভবও নয়। গাজালি একাধারে একজন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত দার্শনিক ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী মুসলমান এবং খোদা প্রেমে নিবেদিত একজন সুফি সাধক। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন যে, এই জাগতিক জীবনে প্রকৃত রহস্য খোদার অনুগ্রহ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি নবী-রাসূলদের জানিয়েছেন সম্যকভাবে আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদেরকে তিনি স্বজ্ঞার শক্তিতে শক্তিমান করেছেন তাঁরা। কোন কোন ক্ষেত্রে লাভ করেছেন সুনিশ্চিত সত্য।[১৬৯]

'আল্লাহ্‌র সার্বিক জ্ঞান আছে, বিশেষ জ্ঞান নেই' এটা প্রমাণে দার্শনিকরা ব্যর্থ হয়েছেন বলে গাজালি যে যুক্তি দিয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা।

ফালাসিফা সম্প্রদায়ের কিছু দার্শনিক এমন মত প্রদান করেছেন যে, আল্লাহর কেবল সার্বিক জ্ঞান রয়েছে, বিশেষ জ্ঞান নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কেবল কোন কিছুকে সার্বিকভাবে জানেন, কিন্তু বিশেষভাবে জানেন না। যেমন, আল্লাহ্‌ জানেন সকল মানুষ কম-বেশী ভুল করবে। কিন্তু মুন্না আজ স্কুলে গিয়ে কি ভুল করেছে তা তিনি জানেন না। এসবের খবর তিনি রাখেন না।ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এই ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, আল্লাহ্‌ সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই অজ্ঞাত নয়। তিনি সার্বিকভাবেও জানেন আবার বিশেষ বিশেষভাবেও জানেন। ইবনে রুশদ দার্শনিকদের এবং গাজালির মতের মধ্যস্থতা করার জন্য যুক্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে, দার্শনিকদের সাথে গাজালির এই বিরোধ মূলত এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি।আল্লাহর সার্বিক জ্ঞান আছে, বিশেষ জ্ঞান নেই— এটা প্রমাণে দার্শনিকদের যুক্তি: দার্শনিকদের যুক্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তিগুলো হলো :

এক : বিশেষ জ্ঞান খণ্ড খণ্ড। এগুলো পরিবর্তনশীল। আর জ্ঞানের সাথে জ্ঞাতার সত্তায় পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ তার মনোজগতে অন্তত পরিবর্তন সূচিত হয়। এখন আল্লাহর যদি বিশেষ জ্ঞান তথা খণ্ড খণ্ড জ্ঞান থাকে তাহলে তাঁর সত্তায় পরিবর্তন দেখা দিবে। কিন্তু আল্লাহর সত্তায় পরিবর্তন আশা করা যায় না।

দুই : বিশেষ জ্ঞান কালীক সম্পর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান কোন কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। -

তিন : কোন বিশেষ বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান লাভ করা মানে ঐ বিশেষ বস্তু বা ঘটনার সাথে কোন বিশেষ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু আল্লাহ্‌ এরকম কোন বিশেষ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হলে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন।

আল-গাজালির প্রতিবাদ

ইমাম আল-গাজালি দার্শনিকদের এ সকল যুক্তির প্রতিবাদে বলেন--

এক:

দার্শনিকদের এই অভিমত শরিয়ত বিরোধী। শরিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ্‌ জগতের সকল খুটিনাটি ঘটনাসহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত।

দুই:

ইমাম গাজালির মতে, প্রকৃত সত্য কখুনও পরিবর্তিত হয় না। আল্লাহ যা জানেন তা প্রকৃতভাবে জানেন, তাই তাঁর জ্ঞানে পরিবর্তন আসতে পারেনা। আল্লাহ্‌ বিশেষ ঘটনারও প্রকৃত অবস্থা জানেন।

---

১৬৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তিন:

মানুষের সার্বিক জ্ঞান সীমিত। কিন্তু আল্লাহর সার্বিক জ্ঞান কোন কিছু দ্বারা সীমিত নয়, তাই তাঁর সার্বিক জ্ঞানের সাথে বিশেষ জ্ঞান বিরোধপূর্ণ হয় না।

চার:

একই বস্তু আমার ডান দিকে, আবার আমার বাম দিকেও অবস্থান করলে যেমন ঐ বস্তুর সাথে আমার সম্পর্কের পরিবর্তন হয় মাত্র কিন্তু আমার সত্তার পরিবর্তন আসে না, তেমনি কোন বিশেষ বস্তুর সাথে বিশেষ বিশেষভাবে সম্পর্কিত হলে তাতে সম্পর্ককারীর সত্তায় কোন পরিবর্তন আসা জরুরী নয়।

পর্যালোচনা

আল্লাহর জ্ঞান নিয়ে দার্শনিক ও ইমাম আল-গাজালির মধ্যে যে বিবাদ তা নিতান্তই দার্শনিক বিতর্ক। একে ইমাম আল-গাজালি যেভাবে শরিয়ত বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন তা হয়তো সঙ্গত নয়। কেননা দার্শনিকরা মূলত: দার্শনিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন মাত্র ধর্মকে আঘাত করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। তারা আল্লাহর একত্বকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই পরিবর্তনশীল বিশেষ জ্ঞানকে তারা আল্লাহর জ্ঞান থেকে বর্জন করেছিলেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহর সার্বিক জ্ঞান রয়েছে। যদি এমন মনে করা হয় যে, আল্লাহ্ এমন সার্বিক জ্ঞান রাখেন যার মধ্যে সকল বিশেষ জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত তাহলে দার্শনিকদের মতবাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকে না। আল্লাহ্ মূলত সব বিশেষ জ্ঞানের উৎস থেকেই জানেন। তিনি তাই সকল কিছুই অবগত। কিন্তু মানুষের মত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় অবগত নন। তিনি মূল জাতিগতভাবেই ইহা অবগত। তাই এই অর্থে তাঁর সার্বিক জ্ঞান আছে বলা চলে। আমরা প্রত্যহ যে সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম করে থাকি ইহা তিনি ঐ কর্ম সংগঠনের পূর্বেই জেনে থাকেন। তার জ্ঞান কোন তাৎক্ষণিক জ্ঞান নয়। অবশ্য তিনি কর্ম সম্পাদনের সময় যে জানেন না তা নয়। কিন্তু মানুষ কেবল ঘটনা ঘটলেই জানে, এমনকি কোন কোন ঘটনা ভ্রান্তভাবে জানে, কিন্তু আল্লাহ এমনটিভাবে জানেন না। তিনি সবকিছু সঠিকভাবেই জানেন। ইবনে রুশদ যথার্থই দেখিয়েছেন যে, দার্শনিকগণের সাথে ইমাম আল-গাজালির মতবিরোধ মূলত এক ধরনের ভ্রান্ত মতবিরোধ। দার্শনিকরা ইসলামি শরিয়তের বিরোধিতা করতে চান নি। ইমাম গাজালিও যথার্থভাবে আল্লহকে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে সর্বাগ্রে বোঝা দরকার যে, আল্লাহর জ্ঞান এবং মানুষের জ্ঞান। কোন দিক থেকেই এক রকম নয়।[১৭০]

জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ইমাম গাজালির মতবাদের সমালোচনা:

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে জ্ঞান অর্জনকে অনেকটা বাধ্যবাধকতামল করা হয়েছে। করআন এবং হাদিসের বাণীতে জ্ঞান অর্জনের প্রতি মানষকে উৎসাহিত কর হয়েছে। ইসলামের এই অন্তর্নিহিত প্রেরণা থেকে মুসলমানেরা জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেটা মধ্যযুগ বলে পরিচিত সে যুগে মুসলমানরাই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে অগ্রগতির দিকে ত্বরান্বিত করেছেন। খীস্টান ধর্মযাযকগণ এবং খ্রীস্টান নৃপতিগণ অনেক জায়গায় দর্শন চর্চাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণ করেন। তারা গ্রিক দর্শনের চর্চাকেও সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস নেন। তমশাচছন্ন যুগে মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার অতান্ত যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। খলিফা মামুন, হারুন অর রশীদ প্রমুখ মুসলিম শাসনকগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমানগণ গ্রিক

১৭০. আল-গাযালী: *তুহফাতুলফালাসিফা*, তা.বি.পৃ.২২৯

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন আট শতকের দিকে এ সময়ে ফালাসিফা নামক একদল চিন্তা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যারা গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসসমূহের সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াসী হন আল-কিন্দী, আল। ফারাবী, ইবনে সীনা প্রমুখ দার্শনিকগণ ফালাসিফা সমপ্রদায়ের প্রখ্যাত দার্শনিক হিসেবে পরিচিত। তারা প্রত্যেকেই প্রাচীন গ্রিক দর্শনকে নিজেদের অবদানে সিক্ত করে তার প্রচার ও প্রসারে আত্ম নিয়োগ করেন। কিন্তু ইমাম আল গাজালি মুসলিম দার্শনিকদের অধিকাংশ তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী এমনকি কাফের বলেও মন্তব্য করেন । তিনি তাদের বিরুদ্ধে এক বড় রকমের তাত্ত্বিক আন্দোলনের সূচনা করেন তার তহফাতুল ফালাসিফা নামক গ্রন্থে তিনি দার্শনিকদের পদস্খলন তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ইবনে রুশদ গাজালির এই ধরনের প্রতিবাদ মেনে নেন নি। তিনি দার্শনিক মতবাদসমূহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তার মতে মতবাদসমূহ সম্পূর্ণরূপে যথার্থ না হতে পারে। তাদের মতবাদসামহে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের মতবাদসমূহের গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করে গাজালি যেভাবে তাদেরকে সমালোচনা করেছেন তাঁর অনেক দিককেই তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করেন। ইবনে রুশূদ তার Tahafut-al-Tahafuz নামক গ্রন্থে আল গাজালির মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করেন।[১৭১] এর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চান যে, দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আল-গাজালির যে অভিযোগ করেছেন তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। তিনি গাজালির সমালোচনা করতে গিয়ে যে সকল বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়েছেন বা গাজালির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ দিকসমূহ নীচে তুলে ধরাহলো:

১. ইবনে রুশদ দেখান যে, গাজালি যেভাবে দার্শনিকদের মতবাদসমূহ খণ্ডন করার প্রয়াস নিয়েছেন তা অনেক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক। জ্ঞানের যথার্থ রূপ উদঘাটন করার চাইতে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করাই হয়তো গাজালির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, দার্শনিকদের মতবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে গাজালি তাঁদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি অথবা সৌজন্যতা দেখাননি।

২. গাজালি দার্শনিকদের মতবাদসমূহ না বুঝেই অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন বলে ইবনে রুশদ মন্তব্য করেন। বস্তুত কোন কিছুকে সমালোচনা পর্যালোচনা করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক কিন্তু ইবনে রুশদ দেখান যে, ইবনে সীনা, আল-ফারাবী প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদসমূহ যথার্থভাবে তিনি বুঝতেন না। তাছাড়া গ্রিক দর্শন সম্পর্কেও তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিলোনা। তিনি অনেক মতবাদকে গ্রিক দার্শনিকদের মতবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন যা প্রকৃতপক্ষে গ্রিক দার্শনিকদের মত নয়। অথবা অনেক বিষয়কে তিনি ফালাসিফাদের মতবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। যা সত্যিকারে ফালাসিফাদের মতবাদ বা ফালাসিফা সম্প্রদায়ের সকল দার্শনিকদের মত নয়।।

৩. দার্শনিকদের মতবাদসমূহ বোঝার মত যথেষ্ট যোগ্যতা গাজালির ছিলোনা বলে ইবনে রুশদ মন্তব্য করেন। তিনি দেখান যে, আল-ফারাবী, ইবনে সীনা প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদসমূহ অথবা প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক দার্শনিকদের মতবাদ বোঝার মত পর্যাপ্ত পাণ্ডিত্য গাজালির ছিলোনা।

৪.ইবনে রুশদ অভিযোগ করেছেন যে, গাজালি তড়িঘড়ি করে প্রচুর পরিমাণ গ্রন্থ লিখে জ্ঞানের রাজ্যে এক ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। তাঁর অনেক গ্রন্থই পর্যাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বা পাণ্ডিত্যের ফসল নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আবেগ, অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় নিয়েছেন।

---

১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইবনে রুশদ দেখান যে, গাজালি দার্শনিকদের মতবাদসমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই স্ববিরোধিতায় উপনীত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান যে, গাজালির প্রথম দিকের রচনা" মাকাসিদুল ফালাসিফা"মূলত গ্রিক দর্শনের অনুকরণে প্রণীত।

এছাড়া বিভিন্ন মতবাদের আলোচনারও তিনি (গাজালি) সর্বক্ষেত্রে একই রকম অভিমত পোষণ করেন নি। যেমন- দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কীয় আলোচনায় 'তহাফুতুল ফালাসিফা' গ্রন্থে তিনি দৈহিক পুনরুত্থানকে স্বীকার করেছেন এবং কেবল মাত্র আত্মিক উত্থানকে অসম্ভব বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে সুফি দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন এক লেখায় তিনি বলেছেন যে, আত্মিক উত্থান সম্ভব। ইবনে রুশদের ভাষায় :" Ghazali asserts in this book that no Muslim believes in a purely spiritual resurrection and in another book he says, that the sufis hold it." একরমভাবে বহু লেখায় গাজালি স্ববিরোধিতায় উপনীত হয়েছেন বলে ইবনে রুশদ দেখিয়েছেন।[১৭২]

১৭২. Averrose:*Tahafut-al-Tahafut,* p.362

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম গাজালির মাকতুবাত বা চিঠি-পত্র

অনুচ্ছেদ-১

রাজা-বাদশাহ গণের উদ্দেশ্যে-

প্রসঙ্গ কথাঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালির যশগাথা চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াদার আলেমদের একটিদল তাহার প্রতি হিংসাকাতর হইয়া নানাভাবে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে শুরু করে। এলমে-দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভ করার উদগ্র লালসায় যে সমস্ত ভণ্ড প্রকৃতির লোক নানা বেশে নানা কুপন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং বিত্তবান শ্রেণীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জীবনের সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া থাকে।

"এহইয়াউ-উলুমুদ্দীন" কিতাবে সেই সমস্ত কপট মনুষ্যরূপী নরকের কীটদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া ইমাম সাহেব যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ভণ্ড দুনিয়া-পুরুস্ত আলেমগণ সেই জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ইমাম সাহেবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করে। এই সময় খোরাসানের শাসক ছিলেন সুলজুকী বংশের সুলতান সনুজর বিন মালেক শাহ। সুলজুকী খান্দানের সুলতানগণ ইমাম আবু হানিফার অনুসারী এবং হানাফী ফেকাহর ভক্ত ছিলেন। ইবনে খাল্লেকানের বর্ণনা অনুযায়ী সুলজুকী সুলতানগণই ইমাম আবু হানিফার (রাহঃ) মাজারের উপর সুদৃশ্য গম্বুজ নির্মাণ করাইয়া অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[১৭৩]

প্রথম জীবনে ইমাম গাজালি ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কিত একটি পুস্তিকায় ইমাম আবু হানিফার সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনার তীব্রতা কোন কোন স্থানে শোভনতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অবশ্য পরিণত বয়সে ইমাম গাজালি তাঁহার সেই মতামত প্রত্যাহার এবং উক্ত পুস্তিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা সেই পুস্তিকাটিকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া হানাফী ফেকাহর। প্রতি সীমাহীন ভক্তি পোষণকারী খোরাসানের বাদশাহর নিকট ইমাম সাহেব সম্পর্কে নানাপ্রকার ভিত্তিহীন অভিযোগ পেশ করে। তাহারা এতটুকু পর্যন্ত বলিয়া দেয় যে, ইমাম গাজালির ধর্ম-বিশ্বাসই সন্দেহযুক্ত। আল্লাহর নূর সম্পর্কে তিনি অগ্নি উপাসকদের অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন। গ্রীক দার্শনিকদের ভাষার মারপ্যাচে সাজাইয়া তিনি ইসলামী ঈমান-আকীদার গোড়া বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে এমন অনেক কথা রহিয়াছে, যা তাঁহার ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত করার জন্য যথেষ্ট।[১৭৪]

মাগরেবে-আকসা বা মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি এলাকার লোকেরা ছিলেন মালেকী ফেকাহর অনুসারী। মালেকী মাযহাবের কোন কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে। ইমাম গাজালি সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম আবু বকর আল-বাকেল্লানী তখনও জীবিত। তিনি ইমাম গাজালির সমালোচনার জবাব দিয়াছিলেন। জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তিনিও ইমাম সাহেবের সমালোচক ছিলেন।সুলতান সন্জর

১৭৩. প্রাগুক্ত
১৭৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন সরল প্রকৃতির লোক। এলমে-দ্বীনে তাহার ভাল অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে আলেমবেশী ভণ্ডদের কথা বিশ্বাস করিয়া বাদশাহ ইমাম সহেবকে দরবারে তলব করিবার নির্দেশ দিলেন। শেষ জীবনে ইমাম সাহেব এই মর্মে শপথ করিয়াছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবন তিনি কোন বাদশাহের দরবারে যাইবেন না, কোন সরকারী সুযোগ-সুবিধা কবুল করিবেন না এবং বহস-মুনাযারা করিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করিবেন না।কিন্তু বাদশাহর নির্দেশ অমান্য করারও উপায় ছিল না। তাই খোরাসানের উপকণ্ঠে মাশহাদে রো' নামক স্থান পর্যন্ত গিয়া বাদশাহকে উদ্দেশ্য করিয়া সরল ফারসী ভাষায় একটি পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রটি ছিল এইরূপ ঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের বাদশাহকে দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের জীবনেও এমন বাদশাহী দান করুন, যার তুলনায় দুনিয়ার বাদশাহী তুচ্ছ এবং মূল্যহীন বলিয়া মনে হয় এবং তা আখেরাতের অনন্ত জীবনে যেন কাজে আসে। কেননা, দুনিয়ার বাদশাহীর সীমানা পৃথিবীর পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, এর বেশী নয়। মানুষের বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত বৎসরের বেশী হয় না। আখেরাতের জীবনে আল্লাহপাক যে বাদশাহী দান করিবেন, তার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টিজগত একটি ধূলিকণার বরাবরও নয়। তাই সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহীও সেই ধুলিকণার একটি ভগ্নাংশ হিসাবেও গণ্য হইতে পারে না। ধূলিকণা এবং তার ভগ্নাংশের কি-ই বা মূল্য হইতে পারে ? চিরস্থায়ী বাদশাহীর মোকাবেলায় একশত বৎসরের জীবনেরই বা কি মূল্য রহিয়াছে যে, তা অর্জন করিয়াই মানুষ অহংকারে ফাটিয়া পড়িবে ? হে ইসলামের বাদশাহ! আপনার খান্দান যেরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্যের শীর্ষে উন্নীত হইয়াছে, আপনিও সেই অনুপাতে সৎসাহস এবং সকাজ করার মনোবল অর্জন করুন। আল্লাহর তরফ হইতে পরকালের সেই অনন্ত বাদশাহী হাসিল না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হইবেন না।[১৭৫]

এই সৌভাগ্য যাহা দুনিয়ার অন্যান্যদের জন্য কঠিন সাধনাসাপেক্ষ হইতে পারে; কিন্তু হে পূর্বদেশের বাদশাহ! আপনার পক্ষে তা অত্যন্ত সুলভ। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর এক দিনের ন্যায়-বিচার ষাট বৎসরের বিরামহীন এবাদতের চাইতে উত্তম।" আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাকে রাজ্য শাসন ক্ষমতার দৌলত দান করিয়াছেন, তখন অন্যান্যরা ষাট বৎসরে যা করিতে পারে, আপনি এক দিনের মধ্যেই তা করিতে পারেন। অবশ্য এরদ্বারা দুনিয়ার বাদশাহী এবং সৌভাগ্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যদি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে ইহা আপনার দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিস বলিয়া মনে হইবে । কেননা, জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, দুনিয়া যদি একটি সোনার কলসী সদৃশও হয়, তবুও যেহেতু ইহা চিরস্থায়ী নয়, এই জন্য ইহা মূল্যহীন।[১৭৬]

অপর পক্ষে দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত যদি একটি মাটির কলসীও হয়, তবুও যেহেতু উহা চিরস্থায়ী, সেইজন্য উহার মূল্য অনেক বেশী। বুদ্ধিমান লোকমাত্রই ক্ষণস্থায়ী সোনার কলসীর চাইতে চিরস্থায়ী মাটির কলসীটিই গ্রহণকরা উত্তম বলিয়া মনে করিবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অবস্থা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন একটি ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী মাটির পাত্রবিশেষ এবং আখেরাত চিরস্থায়ী সুবর্ণপাত্র বিশেষ, তখন যে ব্যক্তি আখেরাতের সেই মহামূল্যবান সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের পিছনে ছুটে, সেই ব্যক্তিকে কি

১৭৫. প্রাগুক্ত
১৭৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিমান বলা যাইবে ? এই তথ্য যখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, একদিনের ন্যায়-বিচার ষাট বৎসরের এবাদতের সমতুল্য, তখন আমি আপনার সম্মুখে ন্যায় বিচারের একটি মওকা পেশ করিতেছি; তুস্ এলাকার প্রজা সাধারণের প্রতি সহৃদয় হউন, উহারা অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। প্রচণ্ড শীত এবং অনাবৃষ্টির দরুন ফসল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। শত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষও খরা কবলিত হইয়া মূলশুদ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। কৃষকদের শরীরে অস্থি ও চর্মটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। ইহাদের সন্তানেরা আজ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে ধুকিতেছে। এমতাবস্থায় ইহাদের শরীরের চামড়াটুকু টানিয়া ভোলার মত সুযোগ আর দিবেন না। এই সময় যদি ইহাদের নিকট হইতে রাজস্ব বাবদ কিছু আদায় করার চেষ্টা করা হয়, তবে ইহারা হয়ত পাহাড়-জঙ্গলে পালাইয়া গিয়া পাষাণে মাথা ঠুকিয়া মরিতে চেষ্টা করিবে।।

হে ইসলামের বাদশাহ! আপনার জ্ঞাতার্থে বলিতেছি, বর্তমানে আমার বয়স তিপ্পান্ন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি এলমের সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়াছি, ফলে আমার অনেক কথাই এই যুগের জ্ঞানী সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সুলতান শহীদের রাজত্বকালের বিশটি বৎসর আমি দেখিয়াছি। ইস্পাহান এবং বাগদাদে তাঁর প্রতিপত্তি দেখিয়াছি, একাধিকবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া তাহার দূত হিসাবে খলিফার দরবার পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। এলমে-দ্বীনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুন সত্তরটি কিতাব লিখিয়াছি, এই সমস্ত দিকের বিবেচনায় দুনিয়াকে যথার্থভাবে দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া বর্তমানে দুনিয়ার সঙ্গে, সম্পর্কবিহীন নিরিবিলি জীবন যাপন করিতেছি। বেশ কিছুকাল মক্কা শরীফ এবং বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করার পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজারে হাজির হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কোন বাদশাহর দরবারে আর যাইব না, কোন বাদশাহর কোন প্রকার বৃত্তি ভোগ করিব না। বহস- মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইব না। গত বার বৎসর যাবৎ এই প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। স্বয়ং খলিফা এবং অন্যান্য বাদশাহগণ এই নগণ্য আশীর্বাদককে অপারগ মনে করিয়াই আমার নিজের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পাইলাম, আপনি আমাকে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। আপনার ফরমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আমি শহীদ রেযা পর্যন্ত আসিয়াছি, কিন্তু হযরত ইবরাহীমের পবিত্র মাজারে বসিয়া কৃত প্রতিজ্ঞার কথা, স্মরণ করিয়া আপনার দরবার পর্যন্ত আসার ব্যাপারে আন্তরিক দ্বিধা অনুভব করিতেছি।[১৭৭]

হযরত ইমাম রেযা শহীদের এই পবিত্র শাহাদতগাহে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, হে প্রিয় বৎস! ইসলমের বাদশাহ! আমার উপদেশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার পিতৃপুরুষগণের গৌরব এবং মর্যাদার আসন পর্যন্ত নিয়া পৌঁছাইবেন। আখেরাতের জীবনেও হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের তুল্য মর্তবা ও মর্যাদা দান করিবেন। তিনি যেমন আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর ছিলেন, তেমনি বাদশাহও ছিলেন।আপনি আমাকে সুযোগ দিন, হযরত ইবরাহীমের (আঃ) পবিত্র মাজারে দাঁড়াইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার মর্যাদা যেন রক্ষা করিতে পারি। যে ব্যক্তির অন্তর দুনিয়ার ঝামেলা হইতে সরিয়া আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, তেমন লোকের মনে কষ্ট দিবেন না। আমি মনে করি, আমার রক্ত-মাংসের এই দেহটা আপনার সম্মুখে হাজির করার চাইতে আমার এই কথাগুলি আপনার নিকট অধিকতর পছন্দনীয় এবং কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার এই কথা যদি আপনার নিকট গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়, তবে ইহাই আমার ব্যাপারে সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত হইবে। আর যদি আপনার

১৭৭. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব সিদ্ধান্তই অটল থাকিয়া যায়, তবে আমার পক্ষে বাদশাহের নির্দেশ অনন্যোপায় হইয়াই পালন করিতে হইবে। আল্লাহ পাক আপনার অন্তর এবং যবানকে হেফাজত করুন যেন হাশরের ময়দানে আপনি লজ্জিত না হন। আপনার কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যই যেন ইসলামের পক্ষে ক্ষতির কারণ না হয়। আল্লাহর তরফ হইতে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।[১৭৮]

জানা যায়, পত্র পাঠ করিয়া সুলতান ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। দরবারীগণকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা, সামনা সামনি কথাবার্তা বলিয়া ইমাম সাহেবের ধ্যান-ধারণা এবং আকীদা বিশ্বাস যাচাই করি।বিরুদ্ধবাদীগণ এই সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের আশংকা হইল, সুলতানের সংগে যদি ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটে তবে তিনি হয়ত প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িবেন। এই জন্য তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিল যেন ইমাম সাহেব দরবারে না আসিয়া বাহিরেই কোথাও বিরুদ্ধপন্থী আলেমগণের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হন এবং এই ব্যাপারে সরকারী চাপ প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে একবার ইমাম সাহেবকে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ করিতে পারিলে হয়ত তাঁহাকে সহজে বদনাম করিয়া দেওয়া সহজ হইবে।তুসের জ্ঞানী-গুণীগণ এই ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করিতে পারিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, আমরা ইমাম সাহেবের শিষ্য-সাগরেদ, আপনারা যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক করিতে চান সেই সব বিষয় প্রথমে আমাদের সম্মুখে পেশ করুন, যদি আমরা সেই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে না পারি তবেই সেইগুলি ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করা হইবে। কারণ, আপনারা যে পর্যায়ের আলেম এই পর্যায়ের লোকের সঙ্গে ইমাম সাহেবের ন্যায় মহাজ্ঞানীর পক্ষে তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তুসের আলেমগণ কর্তৃক এই নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের ফলে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। সুলতান দেখিলেন, এইরূপে অর্থহীন তর্কবিতর্কের ফলে অর্থক সামাজিক শান্তি বিপন্ন এবং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ ছড়াইয়া পড়ার উপক্রম হইতে পারে। তাই সরাসরি ইমাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিতর্কমূলক বিষয়াদির মীমাংসা করিয়া নেওয়াই শ্রেয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলতান সজর উজিরে আজম মুঈনুল-মুলককে নির্দেশ দিলেন যেন ইমাম সাহেবকে সরাসরি দরবারে হাজির করা হয়।শেষ পর্যন্ত ইমাম সাহেব অনন্যোপায় হইয়া সুলতানের ছাউনীতে আগমন করিলেন এবং প্রথমে প্রধান উজির মুঈনুল-মুলক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মুঈনুল-মুলক অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুলতানের দরবার পর্যন্ত পৌঁছিলেন।সুলতান সন্জর দাঁড়াইয়া ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সিংহাসনের পাশে পূর্ব নির্ধারিত একটি সম্মানজনক আসনে বসাইলেন।ইমাম সাহেব প্রথম জীবনে অনেকবারই সুলতানগণের জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে যাতায়াত করিয়া দরবার সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তারপরেও সনজরের দরবারের শান-শওকত দেখিয়া কিছুটা হতচকিত হইয়া পড়িলেন। এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সুলতানের সম্মুখে তার মতামত ব্যাখ্যা করিয়া সুদীর্ঘ ওয়াজ করিলেন।

ইমাম সাহেবের ওয়াজ

আল্লাহ তা'আলার হামদ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম পৌছানার পর; আল্লাহ তাআলা মুসলমান সুলতানগণকে দীর্ঘ-জীবন দান করুন এবং সহীসালামতে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তওফীক দিন। বাদশাহ-সুলতানগণের সঙ্গে হাক্কানী আলেমগণের যে যোগসূত্র তা সাধারণতঃ দোয়া, উৎসাহ

১৭৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান, উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার মাধ্যমেই স্থাপিত হইতে পারে। আমার চিন্তাধারা হইতেছে, দূরে অবস্থান করিয়া রাতের অন্ধকারে গরজহীন অন্তর লইয়া যে দোয়া করা হয়, সেই দোয়া প্রকাশ্য দরবারে অন্যকে দেখাইয়া করার চাইতে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পাক দরবারে আন্তরিক নিষ্ঠা, গভীর হৃদয়াবেগ এবং পরিপূর্ণ আস্থাসহকারে পেশ করা না হইলে, সেই দোয়া সাধারণতঃ কবুল হয় না।আমার ন্যায় লোকের পক্ষে আপনার প্রশংসা বা উৎসাহ প্রদানের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। কোননা, ইহা সূর্যালোকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উহার ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করার নামান্তর মাত্র। তাই, আমি নছিহতের মাধ্যমে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। নসিহত এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, তার অন্যতম প্রধান পথ নির্দেশক খোদ রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফরমান। তিনি এরশাদ। করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে আমি দুইটি মূর্তিমান উপদেশ রাখিয়া যাইতেছি। একটি সবাক এবং অন্যটি নির্বাক। নির্বাক উপদেষ্টা মৃত্যু এবং সবাক উপদেষ্টা আল্লাহর কিতাব-কুরআন।" হে প্রিয় বৎস! প্রজা সাধারণের ব্যাপারে সাবধান হও, আল্লাহর গজব হইতে বাঁচিতে, চেষ্টা কর, আল্লাহকে ভয় কর।[১৭৯] যদি তোমরা জানিতে পাইতে আমরা কিরূপ সংকট এবং কেমন ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন, তবে বোধহয় তোমরা এক ওয়াক্তও পেট ভরিয়া খানা খাইতে বা জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে সাহস করিতে না। তোমাদের প্রজাগণের মধ্যে কোন একটি লোকও খাদ্য বস্ত্রে কষ্ট পাইত না। তোমাদের অধিকারে তো বিপুল সম্পদ রহিয়াছে। শেষ বিচারের দিন সেই সম্পদ এবং তোমাদের কার্যকলাপ পাশাপাশি রাখিয়া এই ধনরাশির এক একটা বিন্দুর ব্যবহার সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, "তোমাদের যে কেহ একটি অণু পরিমাণ সৎকাজ করিবে, সে তার প্রতিফল দেখিতে পাইবে এবং যদি কেহ একটি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করে, তবে তার পরিণামও সে দেখিতে পাইবে"।[১৮০] এই জীবনে যা ইচ্ছা হয় করিতে পার, তবে স্মরণ রাখিও সেই মহা বিচার দিনে সমস্ত কর্মের প্রতিটি অণুপরমাণুই নিজের চক্ষে দেখিতে পাইবে।

হাদিস শরিফে উল্লেখিত হইয়াছে, প্রত্যেকটি মৃত ব্যক্তির সম্মুখে প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে তিনটি ভাণ্ডার পেশ করা হয়:

(১) আল্লাহর রেযামন্দির ভাণ্ডার। বান্দা এবাদত-বন্দেগীতে যে সময়টুকু ব্যয় করিয়া গিয়াছে, এই সময়টুকুই উক্ত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আল্লাহর রেযামন্দিতে ভরা - এই সময়টুকু দেখার সময় বান্দার মনে এমন অস্বাভাবিক আনন্দ দেখা দেয় যে, সেই আনন্দের মোকাবেলায় আট বেহেশতের নেয়ামতরাশি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। কেননা, আল্লাহর আনুগত্যের কি প্রতিফল তাই এই সময়ে বান্দার সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়।

(২) দ্বিতীয় একটি ভাণ্ডার পেশ করা হয় যা একেবারে শূন্যগর্ভ। ইহা সেই সময়টুকু যেটুকু সে দুনিয়াতে নিদ্রা এবং অন্যান্য মোবাহ্ কাজ কর্মে ব্যয় করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বান্দার অন্তরে এমন আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

---

১৭৯. প্রাগুক্ত

১৮০. আল-কুরআন, ৯৯:৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

(৩) তৃতীয় একটি ভাণ্ডার এমন পেশ করা হয় যা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইহা সেই সময়টুকুর সমষ্টি, যা সে দুনিয়ার জীবনে গোনাহর মধ্যে ব্যয় করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বান্দার অন্তরে এমন ভীতি এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয় যে, সে তখন শুধু আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, হায় হায়! আমি যদি দুনিয়াতে জন্মই না নিতাম!হে রাজন! আপনি এই দুনিয়ার জীবনে সীমাহীন ধন-দৌলত, সৈন্য-সামন্ত এবং সাজ-সরঞ্জাম সঞ্চয় করিয়াছেন। এইসবের পাশাপাশি আখেরাতের জন্যও কিছু সঞ্চয়। করুন। আখেরাতের জীবন এবং তার স্থায়িত্বের কথা একটু চিন্তা করুন। দুনিয়ার জীবন তো হাতেগোনা কয়েকটি দিন মাত্র, তাও আবার একদিন এমন কি একটা নিঃশ্বাসের ভরসাও নাই।[১৮১]

অপরপক্ষে আখেরাতের জীবনের না কোন শেষ আছে, না কোন সীমারেখা। এই সাত আসমান-জমিন যদি শস্যকণা দ্বারা ভরিয়া দিয়া একটি পাখীকে প্রতি হাজার বছর পর পর এক একটি দানা খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সেই দানা একদিন শেষ হইবে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও আখেরাতের জীবনের একটি মুহূর্তও শেষ হইবে না। সুতরাং এই অনন্ত জীবনের সুখ সমৃদ্ধির জন্য কতটুকু প্রস্তুতি প্রয়োজন তা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।মনে রাখিবেন, মহা বিচার দিনে প্রত্যেকটি মানুষকেই দোজখের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সেই দিনের এক একটি মুহূর্ত হাজার বছরের চাইতেও দীর্ঘতর হইবে। একমাত্র সেই সমস্ত লোকই সুস্থ শান্তভাবে সেই পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে, যাহাদের ঈমান সুস্থ ও সুদৃঢ় থাকিবে। জানিয়া রাখুন, ঈমান একটি বৃক্ষ বিশেষ, আল্লাহর আনুগত্যের রস দ্বারাই ইহার প্রবৃদ্ধি সাধন হয়। ন্যায় বিচার হইতেছে সেই বৃক্ষের শিকড়। অবিরাম আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই উহা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যদি ঈমান বৃক্ষের পরিচর্যা করা না হয়, তবে মৃত্যু যন্ত্রণার ঝাপটাতেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেননা, যে বৃক্ষের শিকড় মজবুত নয়, ঝড়-ঝাপটার আঘাত সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা উহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে।[১৮২]

রাজন! আমার একটি উপদেশ গ্রহণ করুন। সর্বদা কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যবানে জারী রাখিতে চেষ্টা করুন। এমনভাবে তা উচ্চারণ করিতে থাকিবেন যা অন্য কেহ শুনিতে না পায়। আপনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকুন বা শিকারের জন্য বনে-জঙ্গলে অবস্থান করুন অথবা নিরিবিলিতে বিশ্রামরতই থাকুন এই ওজীফা হইতে যবানকে, অবসর দিবেন না। কেননা এই ওজীফা দ্বারা ঈমান মজবুত হয়।বাদশাহ নামদার! যদি আখেরাতের আজাব হইতে আপনি মুক্তি পান তবুও মহাবিচার দিনের কৈফিয়ত প্রদান হইতে কিছুতেই রেহাই পাইবেন না। কেননা, হাদীস শরীফে আসিয়াছে তোমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষমতার আওতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।"এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি আপনাকে সেই দিন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমি তো তোমাকে আমার অগণিত বান্দার উপর ক্ষমতাশীল করিয়া ছিলাম। তোমাকে কিছু সুন্দর অশ্বও দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে শ্যামল তৃণভূমিতে বিচরণরত অশ্বপালের পিছনেই নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলে; আমার বান্দাদিগকে তুমি তোমার সখের ঘোড়াগুলির সমান মর্যাদাও দাও নাই। অথচ সেইসব বান্দার মধ্যে আমার কত বিশিষ্ট আবেদ মুখলেছ বান্দাও তো ছিলেন। তাহাদিগকে তুমি একটি অশ্বের সমান মর্যাদাও দাও নাই। অথচ আমি বলিয়া দিয়াছিলাম মুমিন বান্দার অন্তর কা'বার চাইতেও অধিক মর্যাদাশীল। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ প্রশ্নের কি জবাব সেই দিন আপনি দিবেন? হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের অবস্থা ছিল এই ঃ

১৮১. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
১৮২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

একদিন এক দরিদ্র ব্যক্তির একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। খবর পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) অন্ধকার রাত্রিতে খালি পায়ে গলিতে গলিতে ঘুরিয়া সেই উটটি তালাশ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "যদি লোম উঠা তুচ্ছ একটি ছাগলছানার খোঁজ-খবর নেওয়ার দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়াও আমার দ্বারা ত্রুটি হইয়া যায়, তবে সেই সম্পর্কে আমাকে অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে।"জনৈক সাহাবী বার বৎসর পর হযরত ওমরকে (রাঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, দেখিতে পাইলেন, গোসল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করিয়াছেন। যেন কঠিন কোন কাজ শেষ করিয়া অবসর পাইয়াছেন।। সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিরুল মোমেনীন! আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? বলিলেন, দুনিয়া হইতে আমার বিদায় হওয়ার পর কত বৎসর কাটিয়াছে?" সাহাবী জবাব দিলেন, "বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।"বলিলেন, "এই পর্যন্ত আমাকে জবাবদিহি করিয়া কাটাইতে হইয়াছে। যদি আল্লাহ পাক অত্যন্ত মেহেরবান দয়ালু না হইতেন তবে আমার জবাবদিহির কাজ অত্যন্ত কঠিন হইত।"[১৮৩]

মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সুবিচারক শাসকের ব্যাপার যদি এইরূপ হয়, তবে সেই অনুপাতে আপনি আপনার দায়িত্ব ও পরিণতির কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অনেক রাজা-বাদশার সম্মুখেই আমি সুদীর্ঘ ওয়াজ করিয়াছি। আপনাকে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি জরুরী কথা বলিতে চাই। আমার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী সম্বলিত একটি লিখিত পুস্তিকাও আপনার সম্মুখে পেশ করিতে ইচ্ছা রাখি । উহাতে আপনি আপনার মহান পিতা মালেক শাহের চরিত্রের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। আপনার পিতা যেভাবে প্রজাপালন করিতেন, আপনি সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। দায়িত্বশীল কর্মচারীগণ যদি এমন কোন পরামর্শ দেয় যে, আপনার পিতা যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে দশ দেরহাম রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, আপনি সহজেই আজ তাহাদের নিকট হইতে দশ দীনার আদায় করিতে পারেন, তবে সেইরূপ পরামর্শ কখনও কবুল করিবেন না! আপনি বরং তাহাদিগকে বলিবেন, "আমার পিতা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিতেন আমি আল্লাহর ভয় হইতে দূরে সরিয়া পড়িব? আমার পিতা বুদ্ধিমান ছিলেন, তাহার নীতির খেলাপ করিয়া আমি কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিব? তিনি সুনাম এবং প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, আমাকে কি তোমরা সেই ভক্তি শ্রদ্ধার আসন হইতে বিচ্যুত করিতে চাও?"[১৮৪] পরামর্শ দাতারা যদি কোন একজন জ্ঞানী লোক সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য দেয় যে, এই লোকটি আল্লাহ মানে না, ইহাকে. দেশ হইতে তাড়াইয়া দিন, তবে শুধু ইহাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়াই সেইরূপ কোন নির্দেশ দিবেন না। বরং খোঁজ-খবর নিবেন, জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পিতার আমলদারীতে সেই লোক কোথায় ছিল? তাহার মতামত সম্পর্কে কোন কথা উঠিয়াছিল কিনা? সর্বোপরি সরাসরিভাবে তাহার মুখ বা কলমের মাধ্যমে এরূপ কোন কথা বাহির হইয়াছে কিনা?

সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, আপনার মহান পিতা ন্যায়-বিচার এবং সুশাসনের যে সুদৃঢ় ইমারত গড়িয়া গিয়াছেন, শুধু মন্ত্রণাদাতাদের মুখের কথাতেই সেই মর্যাদার ইমারতটি ধ্বসাইয়া দিবেন না। পিতার সুবিচারপূর্ণ শাসনব্যবস্থা ধ্বসাইয়া দিয়া তদস্থানে অবিবেচনাপ্রসূত কিছু করিয়া বসার পরিণাম মঙ্গলজনক হইবে না। আখেরাতেও এর দ্বারা শুধু অমঙ্গলই ডাকিয়া আনা হইবে। হে বাদশাহ! আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করুন। এই

১৮৩. প্রাগুক্ত,পৃ.২০
১৮৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ায় নেয়ামত সাধাণতঃ চারি ধরনের হইয়া থাকে। যথাঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান, ছহীহ এতেকাদ, বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠব এবং মনোরম চরিত্র মাধুর্য। প্রথম তিনটি নেয়ামত অবশ্য আল্লাহ তা'আলার দান, তবে শেষোক্তটি সম্পূর্ণরূপেই আপনার এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর তরফ হইতে প্রথমোক্ত তিনটি নেয়ামত উদার হস্তেই আপনাকে দান করিয়াছেন, তখন শেষোক্ত নেয়ামতটি অর্জন করার জন্য যে কোন চেষ্টা সাধনায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে পিছপা হওয়া কি আপনার পক্ষে সমীচীন হইবে? হুকুমতের আমিরগণের প্রতি আমার উপদেশ ও যদি তোমরা আন্তরিকভাবে কামনা। কর যে, হুকুমতের ভিত্তি সুদৃঢ় হউক, শান্তিপূর্ণ হউক, তবে তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া এবং তার যথার্থ কদর করা। স্মরণ রাখিও, তোমাদের বাদশাহ একজন নয়-দুইজন। একজন তো চোখের সম্মুখে এই খোরাসান অধিপতি; অন্যজন হইতেছেন এই আসমান-জমিনসহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের বাদশাহ।[১৮৫]

তিনিই তোমাদের এবং সকলের প্রকৃত বাদশাহ। কাল হাশরের ময়দানে তোমাদের নিকট তিনি কৈফিয়ত তলব করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদিগকে আমি ক্ষমতারূপ যে নেয়ামত দান করিয়াছিলাম, তাহা তোমরা কিভাবে ব্যবহার করিয়াছ? মনে রাখিও, শাসন কর্তৃপক্ষের অন্তর আল্লাহর তরফ হইতে ভাণ্ডারের আমানত স্বরূপ। দুনিয়াবাসীগণের উপর সুখ-দুঃখ যা আসে তার অধিকাংশই আসিয়া থাকে শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। তাহাদেরই মন-মস্তকের দ্বারা মানুষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমি আমার অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার তোমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলাম। তোমাদের যবানকে তার চাবিতে পরিণত করিয়াছিলাম। সেই আমানত কি তোমরা যথাযথভাবে হেফাজত করিয়াছিলে,না তার মধ্যে খেয়ানত করিয়াছিলে? তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি কোন মজলুমের অবস্থা বাদশাহর নিকট হইত গোপন করিবে, তার সেই কাজ আমানতে খেয়ানত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। যদি তোমরা আল্লাহর আজাব-গজব হইতে বাঁচিতে চাও, তবে আমার এই নছিহত খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং এই অনুযায়ী আমল করিতে চেষ্টা কর।"[১৮৬]

মাননীয় সুলতান! সর্বশেষে আমি আপনাকে আরও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। তন্মধ্যে পত্রে আমি তুস্ এলাকার সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। পর্যায়ক্রমিক নির্মম শোষণে আজ উহারা অস্থি-চর্মসার হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়া অবাক হই, উপর্যুপরি করভারে যখন গরীব মুসলমানদের গর্দান ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে তখন আপনার আস্তাবলের শখের ঘোড়াগুলির গলদেশ ভরিয়া উঠিতেছে সোনা-চাদির গলাবন্দের জৌলুসে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হইতেছে এই যে, গত বার বৎসর ধরিয়া আমি সংসার জীবনের সকল কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছি। ইতিমধ্যে উজির ফখরুল-মুলক আমাকে বার বার নিশাপুর আসার জন্য তাকিদ করিয়াছেন। প্রত্যেকবারই আমি তাঁহাকে জবাব দিয়াছি যে, বর্তমান যমানা আমার কথার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে। না। এখন কেহ যদি কোন হক কথা প্রকাশ করেন তবে লোকে দলবদ্ধভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। ফখরুল- মুলক আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে, বর্তমান বাদশাহ নেহায়েত সুবিবেচক। এতদসত্ত্বেও আপনার কোন কথায় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইলে আমি স্বয়ং তাহার মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এখানে আসার

১৮৫. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.২১
১৮৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পর, আপনার আশে পাশে যে সমস্ত লোক ভীড় করিয়া আছে, উহাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া আমি নিরাশ হইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার স্বপ্নে দেখিলে বোধ হয় আমি তা দুঃস্বপ্ন বলিয়া ভুলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতাম।যে সমস্ত বিষয় যুক্তিনির্ভর সেই সমস্ত বিষয়ে আমার মতামত সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোন মতান্তর হইলে কোন কথা ছিল না। কারণ, আমি এমন অনেক জটিল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যাহা সাধারণ মোটা বুদ্ধির লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা মোটেও সহজ নয়, অবশ্য আমি জটিল দার্শনিক বিষয়াদিও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছি। এতদসত্ত্বেও আমার কোন কথায় ভুলভ্রান্তি উপস্থিত হইলে তাহা সংশোধন করিয়া নেওয়া আমার পক্ষে কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমার সম্পর্কে যেসব ভীত্তিহনি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, সেই সম্পর্কে আমার কি বা বক্তব্য থাকিতে পারে? যেমন ধরা যাক, প্রচার করা হইতেছে যে, আমি ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করিয়া থাকি, ইহা নিছক মিথ্যা এবং আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে পারি যে, এই ধরনের অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি ইমাম আবু হানিফাকে উম্মতে মোহাম্মদীর (সাঃ) একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, এলমে ফেকাহর সূক্ষ্ম-তত্ত্বাদিতে তাহার প্রজ্ঞা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। আমার বিশ্বাসের বাহিরে যে সমস্ত লোক কোন কথা বা অপবাদ আমার উপর আরোপ করে অথবা আমার কোন বক্তব্যের কদর্থ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা মিথ্যাবাদী, প্রতারক। এহইয়াউ-উলুম কিতাবে উলামাগণের ফজিলত ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া ইমাম ছাদেক সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি যেসব কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাই আমার আকীদা। ইমাম আবু হানিফাকে এলমে ফেকাহর ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, মান্য করি। আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইতেছে অপপ্রচারকারীদের ঘৃণ্য কারসাজীর স্বরূপ উদ্ঘাটন। অতঃপর আমার আবেদন, আমাকে নিশাপুর, তুস্ অথবা অন্য কোন শহরে গিয়া শিক্ষকতার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য যেন পীড়াপীড়ি করা না হয়। আমি অবশিষ্ট জীবন নিরিবিলিতে কাটাইতে চাই। কারণ, আগেই বলিয়াছি, এই যুগের মনমানসিকতা আমার বক্তব্য হজম করিতে পারিবে না।

সুলতানের জবাব

ইমাম সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সুলতান সজর মুগ্ধ হইলেন, মন্তব্য করিলেন, "আজ ইরাক এবং খোরাসানের সমস্ত আলেম-উলামাগণ এইখানে উপস্থিত থাকিলে আপনার এই মূল্যবান বক্তব্য শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে আপনার মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিতেন। যা হউক, আপনি আজকের এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখিয়া আমার নিকট পেশ করুন, উহা দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করার ব্যবস্থা করিয়া আমরা আপনার সম্পর্কে প্রচারিত ভুল ধারণার অপনোদন করিব। এতদসঙ্গে আলেম ও সাধকগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি কতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করি, সেই সম্পর্কেও সাধারণ মানুষ সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ পাইবে।আপনাকে শিক্ষকতার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করিতে হইবে। আমি এই মর্মে নির্দেশ জারি করিতে চাই, যেন দেশের আলেম-ওলামাগণ অন্ততঃ বৎসরে একবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার খেদমতে আসিয়া হাজির হন এবং আপনার কোন বক্তব্য বুঝবার ব্যাপারে যদি কোন দ্বিধা বা সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে যেন সামনাসামনি আলোচনার মাধ্যমে তা ফয়সালা করিয়া নেওয়ার সুযোগ পান।"[১৮৭]

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা শেষে ইমাম সাহেব সুলতানের ছাউনী হইতে বাহির হইয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। শহরের সর্বশ্রেণীর লোক, পথে বাহির হইয়া অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে ইমাম সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। সমগ্র শহর যেন উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। পথে পথে হাজার হাজার মানুষ বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী তাহার যাত্রাপথে স্তুপিকৃত করিয়া রাখিল।শহরে পৌঁছিয়াই ইমাম সাহেব তাহার বক্তব্য লিখিত আকারে সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুলতান পুনরায় ইমাম সাহেবের সেই লিখিত ভাষণ পড়াইয়া শুনিলেন।কিছুদিন পর সুলতান শিকারে গেলেন। একটি শিকার উপহার স্বরূপ ইমাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুলতানের এহেন অনাবিল শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জবাবে ইমাম সাহেব সুবিচার, প্রজা বৎসলতা এবং সকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিত নসিহতুল-মুলক' অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিগণের প্রতি উপদেশ'[১৮৮] নামক কিতাবখানা নিজ হাতে লিখিয়া সুলতানের নিকট পাঠাইলেন।

ইমাম সাহেবের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন

সুলতান সন্জর কর্তৃক ইমাম সাহেবের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণ কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িলেও একেবারে অবদমিত হইল না। ইমাম সাহেব সসম্মানে তুসে ফিরিয়া আসার পর একদিন কয়েক ব্যক্তি তাহার খানকায় হাজির হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ইমাম সাহেব বলিলেন, আমি দর্শন এবং যুক্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব পথের অনুসারী। শাশ্বতঃ সত্য হিসাবে কোরআন আমার পথপ্রদশর্ক। ফেকাহর ক্ষেত্রে আমি কোন ইমামের মুকাল্লেদ বা অনুসারী নই। ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফী প্রমুখ কাহারও নয়। উপরোক্ত জবাব শ্রবণ করার পর বিরুদ্ধবাদীরা ইমাম সাহেবের লিখিত কিতাব 'মেশকাতুল-আনওয়ার'এবং 'কিমিয়ায়ে সাআদাত'-এর কিছু কিছু বিষয়বস্তু, যেগুলি সম্পর্কে তাহাদের আপত্তি ছিল, সেইগুলি প্রশ্নের আকারে লিখিতভাবে তাহার সম্মুখে পেশ করে। ইমাম সাহেব সেই সমস্ত প্রশ্নের নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত জবাব লিখিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহাদের আপত্তিগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

(এক) মেশকাতুল-আনওয়ার', 'কিমিয়ায়ে সাআদাত'[১৮৯] গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে,তওহীদে সাধারণ বিশ্বাস হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং বিশেষ স্তরের তওহীদ বিশ্বাস হইতেছে, লা হুয়া ইল্লাহু" অর্থাৎ একমাত্র সেই এক অনন্য সত্ত্বা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।তওহীদকে উপরোক্ত দুই পর্যায়ে বিভক্ত করার অর্থ কি?

(দুই) আল্লাহ তাআলার নূরে হাকিকী বলিতে আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

(তিন) লা- এবং ইল্লা (নাই এবং ব্যতীত) বলিতে আপনি কি বুঝেন?

(চার) "এই দুনিয়ার বুকে মানুষের রূহ সঙ্গিহীন এবং দুনিয়ার পরিবেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিধায় সর্বদা উহা উর্দ্ধজগতের সহিত আকৃষ্ট থাকে"- এই কথা দ্বারা আপনি কি প্রমাণ করিতে চান? এইরূপ বিশ্বাস তো খৃষ্টান এবং ভ্রান্ত দার্শনিকদের।

(পাঁচ) " খোদায়ী কোন ভেদ জানার পর তা প্রকাশ করিয়া দেওয়া কুফুরী,"- এই কথার তাৎপর্য কি? সেই ভেদ যদি যথার্থ হয় তবে তা প্রকাশ করা কুফুরী হইবে কেন? আর যদি সেই ভেদ যথার্থ না হয় তবে এর সঙ্গে "খোদায়ী ভেদ" শব্দের প্রয়োগ যথার্থ হয় কি করিয়া?

---

১৮৮. প্রাগুক্ত

১৮৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সাহেবের জবাব

শরিয়তের জ্ঞানসম্পর্কিত কোন জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সম্মুখে অন্তরের জটিল রোগ পরীক্ষার জন্য পেশ করার নামান্তর। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার অর্থ সেই রোগের সুচিকিৎসা করিয়া রোগীকে আরোগ্য করার চেষ্টা করা। যাহারা অজ্ঞ নিঃসন্দেহে তাহারা রোগাক্রান্ত, তাহাদের অন্তরের মধ্যে রোগ রহিয়াছে। আলেমগণ হইতেছেন অন্তর মধ্যস্থিত রোগের চিকিৎসক। সুতরাং যে সমস্ত আলেম অপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন বা অযোগ্য তাহাদের পক্ষে অন্যের চিকিৎসা করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। এলমে যাঁহারা কামেল তাহারাও আবার সব জায়গায় চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা শুধুমাত্র সেইসমস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, যে সমস্ত রোগীর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। রোগ যদি হয় পুরাতন এবং মজ্জাগত আর রোগী যদি হয় নির্বোধ, তবে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পক্ষে বিজ্ঞতার প্রমাণ হইবে রোগীকে সরাসরি বলিয়া দেওয়া যে, এই রোগ চিকিৎসার যোগ্য নয়। এই ধরনের রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১৯০] মূর্খতাজনিত রোগে আক্রান্ত লোক চারি প্রকার। এর মধ্যে একটি মাত্র শ্রেণীর রোগ চিকিৎসাযযাগ্য; অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর লোকের চিকিৎসা করার চেষ্টা একেবারেই পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম ঐ সমস্ত লোক- যাহারা হিংসার বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করে। হিংসা এমন একটি জটিল ব্যাধি যাহার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই ঐ সমস্ত লোকের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর যত যুক্তিসঙ্গত জবাবই দেওয়া হউক না কেন, এর দ্বারা তাহাদের হিংসার আগুনই শুধু বর্দ্ধিত হইবে, তাহাদের অন্তরে বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এই জন্য এই ধরনের লোকের প্রশ্নের জবাব না দেওয়াই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ। কবির ভাষায় বলিতে গেলে ঃ "সব শত্রুতাই শেষ হওয়ার আশা আছে, কিন্তু হিংসুকের শত্রুতা কোন দিনই শেষ হওয়ার মত নয়।"এইরূপ পরিস্থিতিতে হিংসুককে তার হিংসা নিয়া থাকার সুযোগ দেওয়া এবং উহাদের শত্রুতার কোন পরওয়া না করিয়া নিজের কাজ করিয়া যাওয়াই বিধেয়। কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে, "সে সমস্ত লোক আমার স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া, দুনিয়ার জীবনের আশা-আকাঙ্খকেই একমাত্র পরমার্থ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তুমিও উহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নাও। উহাদের জ্ঞানের পরিধিই এই পর্যন্ত। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদিগার ঐ সমস্ত লোক সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত আছেন, কাহারা তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং কাহারা হেদায়েতের উপর রহিয়াছে।"[১৯১] হিংসুকে যাহা কিছুই বলে, তাহাতে সে তাহার নিজের ঘরেই অগ্নি সংযোগ করিয়া থাকে। কেননা, হিংসায় নেকীসমূহ এমনভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে, যেমনভাবে আগুন শুকনা কাঠ ভষ্মীভূত করে। এই জন্য উহারা করুণার পাত্র, বহছ-বিতর্কের যোগ্য ইহারা নয়।

দ্বিতীয় ধরণের রোগী হইতেছে, যাহাদের রোগ বুদ্ধিহীনতা ও মূর্খতা-প্রসূত। এই শ্রেণীর লোকও চিকিৎসার যোগ্য নয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতকে জীবিত করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু আহম্মকের চিকিৎসা করিতে পারেন নাই। উহারা এমন। লোক, যাহারা দর্শন-বিজ্ঞান কোন দিন না পড়িয়াই এমন সব লোকের কথার মধ্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বসে যাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে সূক্ষ্মতম দার্শনিক আলোচনা এবং দর্শন বিজ্ঞানের জটিল সব গ্রন্থি উন্মোচন করার সাধনায়! এরা এতটুকু বুঝেনা যে, একজন সাধারণ লোকের অন্তরে যে সমস্ত প্রশ্ন উদিত

---

১৯০. প্রাগুক্ত

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

হইয়া থাকে, সেইসব প্রশ্ন উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরেও উদিত হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া ইহাও তো প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব কথা একজন জ্ঞানী আলেমের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই, তাহা একজন সাধারণ স্থূলবুদ্ধির লোকের পক্ষে জানা কিরূপে সম্ভব হইল? মুফাসসের, মুহাদ্দেস, আদীব, ফকীহ্ প্রমুখ এলেমের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণও অনেক সময় দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান রাখেন না। এমনকি দর্শন চর্চাকারীগণেরও অনেকেই বিষয়ের গভীরতায় পৌছিতে পারেন না, ভাসাভাসা জ্ঞান রাখেন মাত্র। সুতরাং দর্শনের সূক্ষ্মতম বিষয়াদিতে যে ক্ষেত্রে উপরোক্ত জ্ঞানীগুণীগণের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে যেসব লোক জ্ঞানের কোন শাখাতেই কোন দক্ষতা রাখেন না, দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের অর্থহীন সব প্রশ্নের জবাব কেমন করিয়া দেওয়া যায়।[১৯২]

কুরআন শরীফে হযরত মূসা ও হযরত খিজিরের যে ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারে সরাসরি পথ নির্দেশ পাওয়া যায়। সাধারণের মধ্যে কেহ যদি কোন এতীমের নৌকায় ছিদ্র করিয়া দেয় তবে তাহা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু একই কাজ যদি কোন কামেল আলেমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার উপর আপত্তি করা উচিত হইবে না। কেননা, এতীমের মালের হেফাজত করার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রতিটি লোক যেমন জ্ঞাত তেমনি একজন আলেমও তা জানেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন তিনি সেই নৌকা ছিদ্র করিয়া দেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, যে সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় ওয়াকেফহাল। সুতরাং স্থূলদৃষ্টিতে এই ধরনের কোন কামেল ব্যক্তির কোন আপাত সন্দেহজনক আচরণের সমালোচনা করা উচিত হইবে না। তাহার বিশেষ এলেম সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

আল্লাহ তা'আলার রাব্বানী রহস্যমালা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অনেকটা ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও স্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সঙ্গে তুলনীয়। কোন ব্যক্তি যদি ঘরেবসিয়া দুনিয়ার সকল প্রকার এলেম শিক্ষা করিয়া ফেলে, কিন্তু দেশ ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করিয়া বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহার পক্ষে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভ্রমণকারীর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আপত্তি উত্থাপন করা যেমন হাস্যকর হইবে, ইহাও তেমনি। ঠিক তেমনি একজন ভ্রমণকারী কোন একটি দেশ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাহার সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করিয়া সেইস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিনের সচেতন বাসিন্দার অভিজ্ঞতার সমালোচনা করাও হইবে অনধিকার চর্চা। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাহার ভাসা ভাসা জ্ঞানের যদি কোথাও বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে উচিত হইবে নিজের বোধীর স্বল্পতা অনুধাবন করিয়া বিশেষজ্ঞের কথা মানিয়া নেওয়া। এতটুকু বুদ্ধির পরিচয়ও যদি সেই লোক দিতে না পারে তবে সেই ধরনের লোককে উপেক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেয়। এইসব লোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।[১৯৩]

তৃতীয় শ্রেণীর রোগী হইতেছে ঐ সমস্ত লোক, যাহারা উদ্দিষ্ট মনজিলের তালাশ করিতেছে, সেই মনজিলে পৌঁছার জন্য তাহারা পথ প্রদর্শকের তালাশ করিয়া থাকে, কোন বিষয় তাহাদের বুঝে না আসিলে, নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতাজনিত বলিয়া মনে করে। অনর্থক বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়া প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করে, কাহারো নিকট প্রশ্ন করিলে তাহা কেবল নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই করে। কিন্তু যাহাদের

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.২২
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

মেধা দুর্বল, বোধ স্থুল, সূক্ষ্ম কোন বিষয় অনুধাবন করার মত মস্তিষ্কের শক্তি তাহাদের মধ্যে অনুপস্থিত।এই ধরনের লোক যদি কোন সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবে তাহাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "নবী-রসূলগণকে মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ অনুপাতে বক্তব্য রাখার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" অবশ্য এই কথার অর্থ এই নয় যে, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকজনের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলা যাইবে না; বরং এই কথার অর্থ হইল তাহাদের সঙ্গে এমন ভাষায় এবং এমনসব বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে হইবে, যাহা তাহার বুঝের আওতায় আসে। যেসব বিষয় বুঝবার মত শক্তি তাহার মধ্যে নাই সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা না করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত যে, এই সমস্ত ব্যাপার তোমাদের বুঝে আসিবে না। সুতরাং এইসব বিষেয়ের পিছনে পড়িয়া সময় নষ্ট করিও না। কেননা, কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করা হইলে সেই সম্পর্কে তাহার মনের সন্দেহ গাঢ়তর হওয়া ছাড়া আর কোন ফায়দা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত এই ধরনের লোক সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছ "واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قد يم" অর্থাৎ – "এবং যেহেতু এই সম্পর্কে তাহারা পথের সন্ধান পায় নাই; সুতরাং তাহারা ইহাই বলিবে যে, এই সমস্ত পুরাতন মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়।"[১৯৪] " যে সব বিষয় তাহারা অনুধাবন করিতে পারে নাই সেইগুলি সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসে। অথবা যেসব বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান তাহাদের নিকট পৌঁছে নাই সেইগুলিও তাহারা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করে।"

চতুর্থ শ্রেণীর রোগী হেইতেছে ঐ সমস্ত লোক, যাহারা হেদায়েত তালাশ করে এবং তৎসঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধিও রাখে। সম্পদ ও ক্ষমতার দাপট কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহারা বিভ্রান্ত নয়। শুধু এই এক শ্রেণীর লোকই চিকিৎসার যোগ্য। আমি এখন যে জবাব দিব, তাহা শুধুমাত্র ঐ এক শ্রেণীর লোকের জন্যই দিব। আমার এই জবাব পাওয়ার পর যদি এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ পাও, যাহার এই জবাবে তৃপ্তি হইতেছে না তবে তাহাতে আশ্চার্যান্বিত হইও না। কেননা, ঐ সমস্ত লোক হয়ত উপরোল্লেখিত চিকিৎসার অযোগ্য তিন শ্রেণীর মধ্য হইত কোন এক শ্রেণীর লোক হইয়া থাকিবে। অধিকাংশ লোকই অবশ্য সেই তিন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, চতুর্থ শ্রেণীর লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তওহীদের নূর তাহাকে শুধুমাত্র খাহেশাত বা দুনিয়ার সকল আকর্ষণ হইতেই মুক্ত করে না, আখেরাতের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ,সবকিছু হইতেও একেবারে বেখবর এবং মোহমুক্ত করিয়া একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়। দুনিয়াতে বসবাস করা সত্ত্বেও এই দুনিয়া সম্পর্কে তাহার মধ্যে কোন অনুভূতি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। সকল কিছুর উর্ধ্বে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সে তাহারই আনুগত্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়। দুনিয়া-আখেরাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়া তাহার সকল মনোযোগের কেন্দ্রভূমি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র যাতের মধ্যে গিয়া সমবেত হইয়া যায়। আল্লাহর 'যাত' ছাড়া অন্য সবকিছুর উপস্থিতি পর্যন্ত সে ভুলিয়া যায়। সবকিছু হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া যেমন সে নিজেকে আল্লাহর যা'তের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তেমনি তাহার নজর হইতেও অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আল্লাহর এবং একমাত্র আল্লহরই অস্তিত্ব সে সবকিছুতে অনুভব করে। হাদীস শরীফের মর্মানুযায়ী "বল, একমাত্র আল্লাহ আছেন এবং অন্য যা কিছু আছে সব ছাড়।"[১৯৫] এই কথার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া

১৯৪. আল–কুরআন, ৪৬:১১
১৯৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছু হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাহার হাল হয় "একমাত্র সেই সত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছু বিলীয়মান"।[১৯৬] এই বাণীর বাস্তবরূপ এই দরজাকে ফানা ফি-তাওহীদের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়া বলে। এই অবস্থায় পৌঁছার পর একমাত্র পরম সত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছু, এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাহার অনুভূতি হইতে বিলীন হইয়া যায়। যাহারা সেই পর্যন্ত পৌছার মত যোগ্যতা রাখে না, তাহাদের ধারণায় মানবীয় শক্তির পক্ষে এই স্তরে পৌঁছা মোটেও সম্ভবপর নয়।

তওহীদের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছেঃ- নফল এবাদতের মাধ্যমে বান্দা ক্রমান্বয়ে আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে আসে যখন আমি তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করি। আর আমি যখন কোন বান্দাকে ভালবাসিতে শুরু করি, তখন আমিই তাহার কানে পরিণত হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে; আমিই তাহার চক্ষুতে পরিণত হই, যদ্বারা সে দেখে এবং আমিই তাহার জিহ্বায় পরিণত হই, যদ্বারা সে কথা বলে।[১৯৭] পঞ্চম স্তরের ঈমানওয়ালাগণ নিজেরা দেখেন, শুনেন, বলেন এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু করেন, সব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, নিজের ভালমন্দ বিচার করিয়া কোন কিছুই করেন না। কিন্তু ষষ্ঠ স্তরের ঈমানওয়ালাগণ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেমন বেখেয়াল হইয়া যান , তেমনি তাঁহাদের দেখা-শোনা এবং বলা সবকিছুই নিজেদের এখতিয়ারের বহির্ভূত হইয়া আল্লাহর তরফ হইতে তাহা সম্পন্ন হইতে থাকে। সর্বত্র এবং সবকিছুতেই তাহারা। একমাত্র সত্তাকেই বিরাজমান দেখিতে পান।প্রথমোক্তগণ সবকিছু দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর মধ্যে এক তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু শেষোক্তগণের বক্তব্য হইল,যেখানে যা কিছু দেখি একমাত্র সেই পরম সত্তাকেই দেখি, অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই আর নজরে পড়ে না।[১৯৮]

প্রথমোক্তগণ বলেন,আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই মওজুদ নাই। যাহারা শেষোক্ত স্তরে আসিয়া পৌছিতে সমর্থ হন, তাহাদিগকে যেহেতু প্রথমোক্ত সবগুলি স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, সেইহেতু তাঁহাদের তুলনায় প্রথমোক্ত সবগুলি স্তরের ঈমানওয়ালাগণ তওহীদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আনাড়ি হিসাবে চিহ্নিত হইতে বাধ্য। ষষ্ঠ স্তরে যাঁহারা পৌছেন তাঁহারা সাধারণতঃ বাহ্য জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হইয়া যান। এই অবস্থায়ও সাধারণতঃ তাঁহারা দুই ধরনের ভুল করিয়া বসেন। কেহ কেহ মনে করেন, পরম সত্তার সঙ্গে তাঁহারা পরিপূর্ণরূপে একাত্ম একীভুত হইয়া গিয়াছেন, এমনকি নিজেরাই সেই সত্তায় পরিণত হইয়া গিয়াছেন, আল্লাহ এবং বান্দার সকল পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় একশ্রেণীর মধ্যে এমন এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, একীভুত হইয়া যাওয়া তো সম্ভব নয়, তবে পরম সত্তা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতেই তাঁহাদের যবান হইতে বে-এখতেয়ারী অবস্থায় বাহির হইয়া আসে যে, "আমিই পরম সত্তা আনাল হাক্ক।" কিন্তু এই বে-এখতেয়ারীর স্তর অতিক্রম করিয়া যদি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারেন, তবেই তাঁহার সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, যাহা তাহার জবান হইতে বাহির হইয়াছে, তা যথার্থ নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোন রক্ত-মাংসের শরীরে যেমন প্রবেশ করেন না, তেমনি এই দুনিয়ার কোন জড়-দেহের সঙ্গে একত্রীভুত হওয়ার কথাও তাঁহার জন্য ভাবা যায় না। এই ধরনের কথা

১৯৬. আল-কুরআন, ২৮:৮৮
১৯৭. প্রাগুক্ত
১৯৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বা অনুভূতি তওহীদের চরম স্তরে অগ্রসরমান। সাধকগণের সাময়িক একটা অনুভূতি মাত্র। যে অনুভূতি সাধক অন্তরে স্থায়ী হয় না আর একটু অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। মোটকথা হইল, যাহারা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদের অস্তিত্ব অনুভব করেন না, তাঁহাদের তুলনায়, যাহারা এক পরম সত্তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করেন না, তাহাদের দরজা তওহীদের ক্ষেত্রে অনেক উর্ধ্বে এবং এই দরজাই চরম সাফল্যের দরজা, পরম পাওয়ার স্তর। এই স্তরেই তওহীদ পরিপূর্ণতা লাভ করে, মা'বুদ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি লাভ হয়।

এই সমূস্ত অধীন দরিদ্র লোককে সাময়িকভাবে সাজাইয়া কৃত্রিম ধনীতে পরিণত করা হইয়াছিল মাত্র, বাদশাহর দেওয়া সাজ-পোশাকে কিছু সময়ের জন্য তাহাদের গায়ে ধনাট্যের চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, কিন্তু এই সাময়িক। সাজ-পোশাকে তাহাদের দারিদ্র দূর হইয়া যায় নাই, গোলামীর অভিশাপ হইতেও তাহারা মুক্তি পায় নাই। অধিকন্তু সাজ-পোশাকগুলিগোলাম নফরদের গায়ে শোভা পাইলেও এইগুলি ছিল বাদশাহর ঠাট-বাট এবং পোশাক-পরিচ্ছদেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে এইগুলি ব্যবহৃত হয় নাই। উপরোক্ত নজীরের আলোকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যদি একটু ধ্যান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, সৃষ্টির যাহা কিছু আমাদের চোখে পড়িতেছে, তাহার সবকিছুই সাময়িক, মৌল অস্তিত্বসম্পন্ন কোন কিছুই সৃষ্টি জগতে নাই। বরং যাহা কিছু আছে, সবই এক আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে, তাহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই স্থায়ী এবং চিরন্তন, অন্য সবকিছু সাময়িকভাবে তাঁহারই তরফ হইতে, তাহার সৃষ্টি কৌশলের প্রকাশ হিসাবে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, আবার সবকিছুই তাঁহারই নির্দেশে বিলীন হইয়া যাইবে। -যে ব্যক্তির জানা নাই যে, এই সবকিছুই সাময়িক, কৃত্রিম, তাহার দৃষ্টিতে এইসবের অস্তিত্ব অবশ্যই বাস্তব। কিন্তু যাহারা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল যে, "একমাত্র তাঁহার মহান সত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছুই ধ্বংসশীল[১৯৯] তাহাদের দৃষ্টিতে একমাত্র তাঁহার সেই সত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্যসব অস্তিত্বহীন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক।তাহা ছাড়া যেহেতু সব বস্তুর অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বল আলামীনের অস্তিত্বের সহিত সম্পৃক্ত এবং তাঁহারই এক বিন্দু ইচ্ছার মাধ্যমে অস্তিত্ববান, সুতরাং এই সবকিছুরই অস্তিত্ব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নয়। সে মতে এই তথ্যের আলোকে যদি কেহ বলেন। যে, একমাত্র রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কিছুই মওজুদ নাই, তবে তাঁহার সেই কথা ভুল হইবে কেন? এমতাবস্থায় লা-হুয়া ইল্লাহু' বলা শুধু ছহীহই নহে, যথার্থ হইবে। এখানে হু' শব্দের দ্বারা অস্তিত্ববান, সবকিছুর প্রতি ইশারা করা হইতেছে। যদি কেহ এইরূপ প্রত্যয় রাখে যে, এক মহাসত্তা ব্যতীত আর কোন হাকিকী বা মৌলিক সত্তার অস্তিত্ব রহিয়াছে, তবে তার পক্ষে লা হুয়া ইল্লাহু বলা দুরস্ত না হইতে পারে, কিন্তু যাহার বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার মহাসত্তা ব্যতীত আর যাহা কিছু চর্মচক্ষে দেখা যায়, সবকিছু গৌণ'অস্তিত্ব সম্পন্ন, একমাত্র সত্তা আল্লাহর ইচ্ছার উপর এইগুলি টিকিয়া আছে এবং তাঁহার ইচ্ছার মাধ্যমেই একদিন সবকিছু বিলীন হইয়া যাইবে, তবে তাহার পক্ষে 'লা-হুয়া ইল্লাহু' বলাই তৌহিদের শেষ মনযিল সম্পর্কে যথার্থ স্বীকৃতি হইবে।

---

১৯৯. আল-কুরআন,২৮:৮৮

Dhaka University Institutional Repository

নূরে-হাকিকী বলিতে কী বুঝায়?

আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে: "আল্লাহ, তিনিই নূর,"[২০০] এই কথা দ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? নূর বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা হইল, যে বস্তুর মধ্যে আলো রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে শিখাও দেখা যায়, কিন্তু আল্লাহর সম্পর্কে কি এই কথা খাটে?

জবাব

আমি আমার কিতাবের মধ্যে 'নূর' শব্দের তাৎপর্য ও নূরের স্বরূপ এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি, যে বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই সবকিছু সুস্পস্ট হইয়া যাইবে।নূর বলিতে শুধুমাত্র শিখাযুক্ত আলোকেই বুঝায় না। যদি তাহাই হইত, তবে স্বয়ং আল্লাহ, তাহার রসূল (সাঃ) এবং কোরআন মজীদ নূর' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত হইত না।[২০১] কেননা কুরআন বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো শিখাযুক্ত কোন আলো নন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, নূরে-হাকিকী বা আল্লাহর নূর আমাদের সাধারণ দৃষ্টিগ্রাহ্য আলোর সমপর্যায়ের কোন কিছু নয়। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। দৃষ্টিশক্তির জন্য আলোর প্রয়োজন, কিন্তু সেই আলো দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু নয়। তেমনি অন্তরের জন্যও আলোর প্রয়োজন, যে আলোরম মাধ্যমে সবকিছু অনুধাবন করা হয়। অন্তরের কোন বাহ্যিক চক্ষ নাই। তাই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির জন্য যে আলোর। প্রয়োজন, অন্তর দৃষ্টির জন্য সেই আলো প্রযোজ্য নয়। এই জন্যই বুদ্ধিকে অন্তরের নূর নামে অভিহিত করা হয়। কুরআন এবং আল্লাহর রসূল যেহেতু মানুষের বোধী এবং অনুভূতির জগতে পথপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেইজন্য এতদুভয়কেও 'নূর' বলা হইয়াছে। বাহ্যিক নূর বা জ্যোতির তবুও একটা রূপ আছে, কিন্তু যে জ্যোতি অন্তর জগতকে পথ দেখায়, তাহার কোন স্বরূপ নাই। কিন্তু সকলেই তাহা অনুধাবন করেন। বুদ্ধি মানুষ অনুভব করে, বুদ্ধির দ্বারা অনেক কিছু অনুধাবন করা হয়; কিন্তু বুদ্ধির কোন রূপ নাই। বুদ্ধিকে কেহ কোনদিন দেখে না। তেমনি অন্তর চক্ষুর জ্যোতি আল্লাহর নূরকে দেখা যায় না, কিন্তু তাহা বাস্তব, অন্তর জগতের সাধক মাত্রই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন।

দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে, তাহাকে অনুভব করার; বুঝবার একমাত্র মাধ্যম হইতেছে মানুষের অন্তর জগতের অনুভূতি, সেই অনুভূতির নূরই হাকিকী নূর। যাহার অন্তর জগত যত তীক্ষ্ণ, সে সেই নূর তত বেশী মোশাহাদা বা অনুভব করিতে সক্ষম। কুরআন-হাদীসে এই দিক লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে 'নূর' শব্দের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।আমার লিখিত কিতাব 'মেশকাতুল-আনওয়ারের' মধ্যে উপরোক্ত দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলাকে নূরে-হাকিকী' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইখানে যদি শব্দের প্রতি কোন আপত্তি থাকে, তবে জানা উচিত যে, এই শব্দ কুরআন মজীদে উল্লেখিত হইয়াছে," আল্লাহ তা'লাই আসমান-যমিনের নূর।"[২০২] হাদীস শরীফে আসিয়াছে মে'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করিতে যাইয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, আপনি কি সেই রজনীতে আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছেন? জবাব দিয়াছিলেন, আমি 'নূর' কিরূপে দেখিব? 'নূর' শব্দ এবং তাহার তাৎপর্য সম্পর্কে যদি ইহার পরও কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন এবং উপরে বর্ণিত আমার ব্যাখ্যার কোন পরওয়া না করিয়াই নানা প্রকার সন্দেহ পোষণ করিতে শুরু করেন, তবে বুঝিতে হইবে, এই ধরনের আপত্তি নিতান্তই মূখতাপ্রসূত। এমন মূর্খতা, যার চিকিৎসা নাই।

---

২০০. প্রাগুক্ত

২০১. আল-কুরআন, ৪:১৭৪

২০২. আল-কুরআন, ২৪:৩৫

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার পরিবেশে মানুষের রুহ অপরিচিত কেন?

প্রশ্ন করা হইয়াছে, মানুষের আত্মা এই দুনিয়াতে এক অপরিচিত আগন্তুক। সর্বাবস্থায় সে উর্ধ্বজগতে উড়িয়া যাওয়ার জন্য উন্মুখ থাকে, এই কথার অর্থ কী? এই ধরনের বিশ্বাস তো নাসারা এবং ভ্রান্ত দার্শনিকেরা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রশ্নের জবাবে তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঈসা রাসূলুল্লাহ এই কথাটি নাসারাদের, তাই বলিয়া কি কথাটি সত্য নয়? হযরত ঈসা কি আল্লাহর প্রেরিত রসূল নহেন? স্মরণ রাখিও, কোন বাতিলপন্থী লোক যদি হক কথা বলে, তবে বক্তার বাতিলপন্থী হওয়ার কারণেই তা বাতিল প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে না। এইরূপ মনে করা নিতান্ত মূর্খতা যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন একটি অন্যায় কথা একবার উচ্চারণ করার পর আর তাহার মুখ হইতে অতঃপর যাহা কিছু বাহির হইবে সবই বাতিল বলিয়া, বিবেচিত হইবে। প্রকৃত বুদ্ধিমানগণের রীতি হইল, কথাটি যথার্থ কি না তা যাচাই করিয়া দেখা। যেমন হযরত আলী(রাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহ তা'লাকে মানুষের মাধ্যমে চিনবার চেষ্টা করিও না,বরং প্রথমে পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা কর, তাঁহার সম্পর্কে জানা হইয়া গেলে কাহারা হকপন্থী তাহাদের পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই হইয়া যাইবে।"[২০৩]

মানুষের রূহ এই দুনিয়ার পরিবেশে সত্যসত্যই অপরিচিত। তাহার প্রকৃত ঠিকানা এই দুনিয়ায় নয়, তাহার আসল ঠিকানা উর্ধ্বজগতে বেহেশতের মধ্যে। এই জন্যই তাহার আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বেহেশতের তথা উর্ধ্বজগতের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কোরআন শরীফের পাতায় পাতায় এই সত্যের সমর্থন এবং সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন যদি, কোন খৃস্টান বা ভ্রান্ত দার্শনিক এই একই কথা বলিয়া থাকে, তবে কি এই কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে? কোরআন এবং হাদীসে বরং প্রমাণের মাধ্যমে এই সত্য প্রমাণিত, সতরাং একই কথা কোন আহলে বাতিলের মুখ হইতে বাহির হইলেই তাহা বাতিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইবে না। কেহ যদি অর্ন্তদৃষ্টি একটু প্রসারিত করিয়া আত্মার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, রূহের একমাত্র প্রবণতাই হইতেছে মহান পরওয়ারদিগারের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার একাগ্র আকাংখা। সেই মহান সত্তার জ্যোতিই হইল তাহার পক্ষে প্রকৃত শক্তির আধার। অবশ্য দুনিয়ার কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গেও রূহের কিছুটা একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়,তবে তাহা নিতান্তই গৌণ; সেই মহান সত্তার সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁহারই প্রতি ধাবিত হওয়া ব্যতীত সে প্রকৃত অর্থে তৃপ্ত হইতে পারে না। মারেফাতে ইলাহীর অমৃত সুধা পান করিয়াই তাহার প্রাণ-প্রাচুর্য লাভ হয়, এই অমৃতের তালাশেই সতত সে উন্মুখ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, মারেফাতে ইলাহীর অমৃত সন্ধান করিয়াই তাহার জীবন প্রবাহ আবর্তিত হইতেছে এবং সেই মকসুদের পথে অগ্রসরমান অবস্থাই তাহার প্রকৃত প্রাণবন্ততার লক্ষণ। এহইয়াউ-উলুম এবং কিমিয়ায়ে-সাআদাত[২০৪] কিতাবে রূহের এই অবস্থা চিরন্তন প্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কেহ যদি এই সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে চায়, তবে তাহার উচিত সেই দুইটি কিতাব গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। অপরপক্ষে যদি কেহ নিছক বিদ্বেষবশতই সমালোচনা করিতে শুরু করে, তবে যেহেতু উপরোক্ত দুইটি কিতাবের বিস্তারিত আলোচনা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই,—এই সামান্য জবাব তাহার বিদ্বেষতাপে তপ্ত অন্তর শান্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তাই এই শ্রেণীর আপত্তি উত্থাপনকারীগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়া বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য যদি কোন প্রকৃত সত্যান্বেষী ব্যক্তি কিতাব পাঠ করিয়া

২০৩. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.২২
২০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে সমর্থ না হইয়া থাকেন এবং সত্যই এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে চান, কিন্তু যথেষ্ট ধীশক্তির অভাবে প্রকৃত সত্যের গভীরতায় পৌঁছিয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তাহার পক্ষে উচিত সরাসরি আমার সম্মুখে হাজির হইয়া পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করিতে চেষ্টা করা। কেননা, উলামাগণের যবানীতে যে এলেম হাছিল করা হয়, সেই এলেমই মজবুত এবং যথার্থ হইয়া থাকে। অবশ্য আমি আমার রচিত কিতাবসমূহে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করি নাই,যা যে কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানান্বেষী, এবং যাহাদের অন্তর বিদ্বেষ বিষে জর্জরিত নয়, এমন লোকের সম্মুখে প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হই নাই। তবে এমন লোককে আমি কোন দলীল প্রমাণ দ্বারাই বুঝাইতে সমর্থ হইব না, যাহাদের সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রকৃত সত্য অনুধাবন করা হইতে আমি তাহাদের অন্তরে পর্দা দিয়া রাখিয়াছি। আর তাহাদের শ্রবণ শক্তি আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে শক্ত আবরণে, যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়েতের পথে আহ্বান কর, তবে তাহা কখনও তাহারা শুনিতে পাইবে না।" তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ যে, এই ধরনের জটিল বিষয়গুলি যেন ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। মনে রাখিও, আমার কোন কিতাবেই এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই যা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি লোকের পক্ষেই এই সমস্ত বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যে সমস্ত লোক যথাযথ ধীশক্তিসম্পন্ন নয়, এই সমস্ত বিষয় পাঠ করিয়াও বুঝে না, তাহাদের সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে, তাহারা আমার সম্মুখে আসিয়া যেন প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম বিষয় মীমাংসা করিয়া নেয়। আমার কথাবার্তা শুনিয়া এবং আমার সংগে সরাসরি আলোচনা করিয়া এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা ব্যতীত তাহাদের পক্ষে আর কোন পথ দেখি না। মূর্খলোক কখন কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিবে তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার।[২০৫]

সুতরাং তাহাদের জন্য পূর্ব হইতে কোন জবাব লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। মূর্খতাজনিত বুঝের অভাব, অন্তরের রোগ এবং তাহার কারণসমূহ বিচিত্রধর্মী। একটির সঙ্গে অপরটির অনেক সময় কোন সম্পর্ক থাকে না। অন্তরের রোগ যে কত প্রকার তাহা নির্ধারণ করাও সম্ভবপর নয়। সেই দিকে লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। এই ধরনের রোগে আক্রান্তদের ব্যাধি সারাইতে হইলে কোরআন শরীফের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। অবশ্য মূর্খদের এতেরাজ সমূহ কোরআন শরীফের দ্বারাও অনেক সময় দূর করা যায় না। ইহাদের অন্তরে অহর্নিশি এমন অসংখ্য শোবা-সন্দেহের উদ্রেক হইতে থাকে যাহার কোন চিকিৎসা নাই। এদের মনোজগতের সব রোগ সরানোর আশা করাও বৃথা। কেননা, "যে ব্যক্তির জিহ্বার স্বাদই বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে সুপেয় মিষ্টি , পানিও তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়।"আমার বক্তব্যের মধ্যে যেসব রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে তন্মধ্যে তকদীর এবং রূহের কথা ধরা যাইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানী উলামাগণ এই দুইটি বিষয়েরই হাকীকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহারা মুখে তা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকেন। কেননা, সাধারণ মানব সমাজের পক্ষে সেই সম্পর্কিত তত্ত্ব অনুধাবনেরও শক্তি নাই। তাই এমন লোকজনের সম্মুখে সেইসব তত্ত্ব প্রকাশ করিতে শুরু করিলে অল্প -জ্ঞানসম্পন্ন বহু লোকের পক্ষেই শেরেকী এবং কুফুরীতে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়ার ভয় রহিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে, তক্বদীর আল্লাহর একটি গুপ্ত রহস্য, তোমরা উহা প্রকাশ করিয়া দিও না।"[২০৬]

---

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪
২০৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্ত রহস্যাবলী জানা এবং অনুভব করা যায়, কিন্তু তা প্রকাশ করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। কারণ উপযুক্ত জ্ঞান এবং অনুভূতিহীন মানুষের পক্ষে এত সমস্ত আলোচনার পিছনে পড়িয়া পদে পদে গোমরাহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভাসা জ্ঞান ও সাধারণ যুক্তির আয়নায় এইসব বিষয় অনুধাবন করার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম মাত্র। যেমন ধরা যাক, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ আলোচনা করিতে গিয়া যদি কোন স্কুলবুদ্ধির লোকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া বসে যে, আল্লাহ কোন দিকে আছেন? রূহ মানুষের শরীরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, কিন্তু শরীরের কোন অংশে তাহার অবস্থান এই তথ্য যেমন নির্ণয় করা যায় না, তেমনি আল্লাহ তা'আলা কোন দিকে আছেন, এই দুনিয়ার ভিতরে আছেন, না বাহিরে কোথাও, দশদিকের মধ্যে কোন দিকে তাঁহার অবস্থান, না কি সর্বদিকে তিনি ব্যাপৃত, যুক্তির জাল বিস্তার করিয়া এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে যাওয়া গোমরাহীর ফাঁদে পা দেওয়ারই নামান্তর মাত্র। কারণ, রূহানিয়াতের জ্ঞান যাহাদের মধ্যে অনুপস্থিত, তাহারা শুধু যুক্তির পিছনে যুক্তি খাড়া করিয়া চলিবে এবং অনুভূতির অভাবে শেষ পর্যন্ত হয়ত আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিয়া বসিবে। কারণ, স্থল যুক্তিতে বলে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মধ্যে যাঁহার অবস্থানই নির্ণয় করা যায় না, তাঁহার অস্তিত্ব মানা যায় কিরূপে? ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসার উপক্রম হয়। এই বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনি তাহা সাহাবীগণের সম্মুখে সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। রূহানীয়াতের জগতে স্থলযুক্তি সর্বস্বতা কিভাবে মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলিয়া নিতে থাকে, তাহার একটি নজীর উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ

- এক শ্রেণীর ভ্রান্ত দার্শনিক মনে করে যে, আমাদের এবাদত এবং যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খুশী হন কিংবা গোনাহ করিলে ক্রুদ্ধ হন, এইরূপ ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কেননা, আল্লাহ তা'লা এমন এক সত্তা যে কোন অবস্থায় যাহার কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার ভয় নাই। ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্রোধ সৃষ্টি হয় না, তাহা ছাড়া কাহারো মধ্যে ক্রোধ তখনই উদ্রেক হইতে পারে, যখন অন্য কোন ব্যক্তি তার মর্জির খেলাফ কোন কিছু করিয়া বসে।[২০৭] কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজেই যেখানে সবকিছুর প্রকৃত নিয়ন্তা, তাহার দস্তে-কুদরতের বাহিরে যেখানে অন্য কাহারো অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না, সেখানে কাহার উপর তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার সেই রাগ প্রশমিত করার পাত্রই বা হইবে কে? সন্তুষ্টির ব্যাপারটিও অনেকটি অনুরূপ। অন্যের দ্বারা কাহারো কোন আকাংখা পূর্ণ হওয়ার পর তাহার অন্তরে খুশীর উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার কোন আকাংখাই নাই, আকাংখারূপ ক্ষুদ্রত্ব হইতে যিনি পরিপূর্ণরূপে মুক্ত, তাঁহার পক্ষে খুশী হওয়ার কথা কল্পনা করা কি বৃথা নয়? সর্বোপরি তাহার ইচ্ছার বাহিরে যখন কোন কিছু হওয়ার মোটেও কোন সম্ভাবনা নাই, তখন নিজের ইচ্ছার প্রতিই খুশী হওয়া অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার।

মোটকথা, রাব্বানী রহস্যাবলী সাধারণ্যে আলোচনার বিষয় নয়, এইগুলি নিছক অনুভব করার বিষয়। সুতরাং এই ব্যাপারে অর্থহীন আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সাধারণ মানুষের ঈমান বরবাদ করার নামান্তর মাত্র। তাই রূহ, তকদীর প্রভৃতি রহস্যপূর্ণ বিষয়াদির ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। কারণ, তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই কোরআন শরীফে রূহ সম্পর্কে খোদা রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহে ওয়া সাল্লামকে,-"বলুন, রূহ আমার পালনকর্তার একটি রহস্য" এইটুকুর বাহিরে কিছু বলার অনুমতি দেন নাই। একই কারণে আমাদের পক্ষেও ইহার চাইতে বেশী কিছু বলার অধিকার নাই। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন লোকের নিকটই তো ইহা অবিদিত নয় যে, রূহের হাকীকত সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। কেননা, রূহের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া কাহারো পক্ষে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা শুধু অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারই নহে অনেকটা অসম্ভবও বটে।

অনুচ্ছেদ-২

উজির বা মন্ত্রিগণের উদ্দেশ্যে

উজিরগণের প্রতি লিখিত পত্রাবলীঃ

উজিরগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ইমাম গাজালির মোট বারটি পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি নেজামুদ্দিন ফখরুল মুলককে লিখিত, একটি উজির আহমদ ইবনে নেজামুল মুলকের লিখিত একটি পত্রের জবাব, তিনটি শেহাবুল ইসলামকে ওজারত গ্রহণ করার পূর্বে এবং তিনটি শহীদ মুজিরুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত।প্রত্যেকটি পত্রই শরীয়তের সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং মারেফাতের একটি অমূল্য ভাণ্ডার হিসাবে জ্ঞানীগুণী সমাজ কর্তৃক সযতনে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম পত্র ঃ নেজামুদ্দিন ফখরুল মুলককে লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমীর, নেজাম এবং ইত্যাকার যে সমস্ত সম্মানসূচক শব্দ উচ্চপদস্থ লোকদের নামের প্রথমে যুক্ত করা হয়, এই সবই আনুষ্ঠানিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে আছেঃ আমি এবং আমার উম্মতের পরহেজগার লোকেরা সর্বপ্রকার স্কুল আনুষ্ঠানিকতা হইতে মুক্ত।[২০৮] আমীর শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা এবং ইহার যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপলব্ধি। যে ব্যক্তির ভিতর এবং বাহির উভয়ই আমীর শব্দের তাৎপর্য অনুধাবনজনিত উপলব্ধিতে সজ্জিত সেই প্রকৃত আমীর; সাধারণ মানুষ এই ধরনের লোককে আমীর শব্দের দ্বারা অভিহিত করুক আর নাই করুক, তাহার কিছু আসে যায় না। যে সব লোক স্বীয় চরিত্রকে উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত করিতে সক্ষম নহে, সে প্রকৃত পক্ষে আমীর নহে, দুনিয়ার সকল মানুষ তাহাকে আমীর বলিয়া সম্বোধন করিলেও নহে।

যাহার নির্দেশ অধীনদের মধ্যে বিনা বাক্য ব্যয়ে কার্যকরি হয়, সাধারণতঃ তাহাকে আমীর বলা হইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তা তাঁহার অপার কুদরতের হাতে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে সমস্ত মৌলিক শক্তি দান করিয়াছেন, সেইগুলি প্রতিটি মানুষের ভিতরকার ফওজ বিশেষ। এই সমস্ত ফওজ অনেক প্রকারের। বলা হইয়াছে, "তোমার পরওয়ারদিগারের কত ফওজ রহিয়াছে, তিনি ছাড়া আর কেহ জানে না।"[২০৯] এই সমস্ত ফওজের মধ্যে নেতৃস্থানীয় তিনটি। তন্মধ্যে প্রথমটি কাম', ইহা মানুষকে অশ্লীলতা এবং ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত করে। দ্বিতীয়টি ক্রোধ', ইহা অপরের উপর হামলা, প্রহার এবং হত্যা করিতে উদ্বুদ্ধ করে। তৃতীয়টি হইতেছে মোহ', উহা লোভ, অন্যায়,উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লালসার জন্ম দেয়। ফলে মানুষ নানা প্রকার ধোকা, ষড়যন্ত্র এবং অসদাচরণের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়। উপরোক্ত

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬
২০৯. আল-কুরআন, ৭৪:৩১

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি বিষয়কে যদি প্রাণীতে রূপান্তর করা যাইত, তবে প্রথমটি হইত শূকর, দ্বিতীয়টি কুকুর এবং তৃতীয়টি শয়তানের আকৃতি প্রাপ্ত হইত। মানুষের মধ্যে দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণী হইল, যাহারা উপরোক্ত তিনটি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে এবং উহাদের উপর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার নির্দেশাবলী। প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই শ্রেণীর লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে আমীর এবং বাদশাহ্।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেছে, যাহারা নিজেরাই উপরোক্ত শক্তিগুলির নির্দেশে পরিচালিত, দিবারাত্রি ঐগুলির হুকুম মান্য করার ব্যাপারে সদা ব্যস্ত এবং ঐগুলির পরিতৃপ্তির জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত রাখে। এই সমস্ত লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে দাস এবং বন্দী বলিয়া বিবেচিত। যাহারা প্রকৃত বাদশাহগণকে ফকীর-মিসকীন বলিয়া অভিহিত করে এবং ইতর দাস প্রকৃতির লোককে বাদশাহ নামে সম্বোধন করে, এই দুনিয়াতে উহারাই প্রকৃত অন্ধ। উহারা অন্ধকারকে আলো, কাঁটাকে কুসুম এবং মরুভূমিকে কুসুমকুঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করিতে যাইয়া মোটেও লজ্জিত হয় না। অথচ তত্ত্বজ্ঞানী মাত্রই এই সত্য সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, দুনিয়াটা একটা প্রহেলিকা মাত্র, ইহা অন্য এক জাহানের ছায়া ব্যতীত আর কিছু নয়। সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াকে দুইভাগে সৃষ্টি করিয়াছেন, একটি তাহার তাত্ত্বিক দিক অপরটি উহার ছায়া মাত্র। তাত্ত্বিক দিকটিকে "আলমে হাকীকত" বা 'আলমে-মালাকুত' বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অভিহিত করা হয় 'আলমে-ছুরত' নামে।

সৃষ্টি-জগতের যাহা কিছু আমাদের স্পর্শ ও দৃষ্টির আওতায় রহিয়াছে সেইগুলিই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমরা যাহা কিছু দেখিয়া থাকি এসবই প্রহেলিকাবৎ, তাত্ত্বিক অর্থে এইগুলির কোনই অস্তিত্ব নাই, তবে ছুরত আছে, অস্তিত্বের রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও এই সবই অস্তিত্ববিহীন। অপরপক্ষে, হাকীকতের যে দুনিয়া, উহাই প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন। প্রকাশ্যতঃ অস্তিত্ববিহীন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে তাত্ত্বিক দিকটিই আসল এবং অক্ষয়। জীবৎকাল পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিশক্তি উহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় না। মৃত্যুর মুহূর্তে যখন এই জড় চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে হাকীকতের দুনিয়া উন্মোচিত হইয়া যায়। দুনিয়ার সকল আচরণ তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া যাওয়ার পর সে সবকিছু অন্য রকম দেখিতে শুরু করে। এতদিন চক্ষু যেগুলিকে অস্তিত্ববান দেখিত, তখন সেই সমস্তই অস্তিত্বশূন্যরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। আর, যেসব বিষয়কে অস্তিত্ববিহীন মনে হইত, সেই সব দৃষ্টির সম্মুখে বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, "পরওয়ারদিগার! ইহা কি দেখিতেছি? সবকিছুই যে, আজ উল্টা মনে হইতেছে!" জবাব দেওয়া হয়- "তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সকল পর্দা অপসারিত হইয়াছে। আজই তোমার দৃষ্টি যথার্থ অর্থে তীক্ষ্ম হইল।"[২১০]

বান্দা মিনতি করিয়া বলিবে, "পরওয়ারদিগার! প্রকৃত রহস্যের জগত দেখিলাম, শুনিলাম, এখন আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া যাইতে দাও যেন সৎকাজ করিয়া আসিতে পারি।"[২১১] জবাব দেওয়া হয়, "আমি কি তোমাকে উপদেশ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট হায়াত দেই নাই? তোমাদের নিকট কি আমার তরফ হইতে ভীতি প্রদর্শনকারী পৌঁছে নাই? আজ তোমার কর্মের প্রতিফলজনিত স্বাদ গ্রহণ কর।[২১২] জালেমের জন্য আজ আর কোন সাহায্যকারী

২১০. আল-কুরআন, ৫০:২২
২১১. আল-কুরআন, ৩২:১২
২১২. আল-কুরআন, ৩৫:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নাই।" ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবেন, "কোন ধু ধু মরুভূমিকে পিপাসার্ত মানুষ যেমন পানি বলিয়া ভ্রম করে এবং নিকটে পৌছিয়া কিছুই পায় না, দুনিয়ার জীবন ছিল তোমাদের জন্য তেমনি, আজ একমাত্র আল্লাহকেই নিকটে পাইবে, তিনি সকল হিসাব চুকাইয়া দিবেন"।[২১৩] কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, অস্তিতৃরূপী-অস্তিত্বহীনতা এবং অনস্তিতৃরূপ- অস্তিত্ব বুঝে আসিল না। দুর্বল বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য এই কথার তাৎপর্য একটি মিসালের মাধ্যমে পেশ করা হইতেছে । মনে কর, ঘূর্ণীবায়ুর সাহায্যে যে ধূলিবালির কুণ্ডলী সৃষ্টি হয় তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে একটি ঋজু মিনারের আকৃতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হইতে থাকে। যে কোন দিন উহা দেখে নাই, ইহার তাৎপর্য সম্পর্কে যাহার পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই, প্রথম দর্শনে তাহার মনে হইবে, ধূলিবালি বোধ হয় আপনা হইতেই ঘুরপ্যাচ খাইয়া এমনভাবে অগ্রসর হইতেছে। বাতাসের সংমিশ্রণে ধূলিকণার এই অবস্থা হইয়াছে-দূর হইতে দেখিয়া তাহা মনে হইবে না।

বাতাস যেহেতু দর্শকের দৃষ্ট গোচর হয় না, এবং ধূলিবালিই তাহার চোখে পড়ে, তাই তাহার পক্ষে এই তথ্য অনুধাবন করা সহজ হয় না যে, কুণ্ডলীটির আসল উপকরণ বাতাস, ধূলিকণা নহে। সুতরাং এখানে ধূলিকণা অস্তিত্বের আকারে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন, এবং বাতাস অস্তিত্বহীন রূপেই প্রকৃত অস্তিত্ববান। কেননা, ধূলিকণাগুলি নিজের শক্তি বা ইচ্ছায় নহে, বাতাসের শক্তি এবং গতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া ঘুরপ্যাচ খাইতে বাধ্য হইতেছে। এখানে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বাতাসের আয়ত্বাধীন যদিও বাতাসের অস্তিত্বই চোখে পড়িতেছে না। ইহার চাইতে আরও ঘনিষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে আমাদের শরীর এবং রূহের কথা ধরা যাইতে পারে। রূহ অদৃশ্য তাই অস্তিতুবিহীন রূপে অস্তিত্ববান রূহের উপর কাহারো কোন কর্তৃত্ব খাটে না, অথচ রূহই হইতেছে মানব দেহের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী বাদশাহ বিশেষ। দেহ হইল তাহার আজ্ঞাবহ দাস, অবশ্য রূহ যাহা কিছু দেখে দেহের মাধ্যমেই দেখে, কিন্তু দেহের মধ্যে তাহার কোন অনুভূতি হয় না।

আরও একটু অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যাইবে, এই দুনিয়া যাহার ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার সত্তাও উপরোক্ত তত্ত্বের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। সমস্ত মখলুকের বেলায় সমস্ত সৃষ্টিজগতের সেই নিয়ন্তা অস্তিত্বহীন রূহে অস্তিত্ববান রহিয়াছেন। কেননা, সৃষ্টি কর্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গেই প্রকৃত নিয়ন্তার অস্তিত্বও জ্ঞাতভাবে জড়িত এবং বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃত হাকিকত হিসাবে মওজুদ রহিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিটি অস্তিত্ববান বস্তুর টিকিয়া থাকার ক্ষমতা পরম নিয়ন্তার তরফ হইতেই আহরণ করা হইয়াছে। কোরআনে পাকে এই সত্যটির প্রতি ইশারা করিয়াই বলা হইয়াছে, "যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।"[২১৪] এখন যদি কেই আবার মনে করিয়া বসে যে, তাঁহার সঙ্গে থাকার বিষয়টি দৈহিক, দেহের সঙ্গে দেহের সংযোগ, তবে তাহা ভুল করা হইবে। সঙ্গে থাকা শুধুমাত্র দৈহিক নয়, অন্যভাবেও হইতে পারে। অনস্তিত্বরূপ অস্তিত্বের মাধ্যমেই তিনি রহিয়াছেন, সর্বত্র আছেন, সর্বভূতে বিরাজমান অবস্থায় আছেন। যাহারা এই সুক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নহে তাহারা হয়ত তাঁহাকে তালাশ করিয়া পাওয়ার ব্যর্থ। প্রয়াস শুরু করে, কিন্তু পরিণামে ব্যর্থতা বরণ করা ছাড়া তাহাদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। যাহারা এই সঙ্গ' সম্পর্কে ওয়াকেফহাল,তাঁহারা তা বাস্তব সত্য হিসাবেই উপলব্ধি করিতে পারেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই

২১৩. আল-কুরআন, ২৪:৩৯
২১৪. আল-কুরআন, ৫৭:০৪

Dhaka University Institutional Repository

তাহাদের যবান হইতে বাহির হইয়া পড়ে যে 'একজন পরম নিয়ন্ত্রক ব্যতীত কোন কিছুর পক্ষেই অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব নয়। সেই পরম সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার পর অনেকেই নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই তাহার দৃষ্টি হইতে গায়েব হইয়া যায়।এই সূক্ষ্ম আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহা এমনই একটি নাজুক প্রসঙ্গ, যা আন্দাজ-অনুমান বা চিন্তা-গবেষণার বিষয় নহে। কথায় কথায় কলমের মুখে আসিয়া গিয়াছে।প্রকৃত নিয়ন্ত্রক সত্তাকে তালাশ করার মত যোগ্যতা যাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহাদের বোধী সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক উন্নত হইয়া থাকে। সর্বদা তাহারা বুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তি বৃদ্ধির আকাংখা নিয়া আল্লাহ রাব্বল আলামীনের সাহায্য ভিক্ষা করিতে থাকেন। কেননা বুদ্ধির অপরিপক্কতার দরুন বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ জান্নাতবাসীগণের মধ্যে সরল-সোজা মানুষেরই আধিক্য হইবে বটে, তবে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মাকামে বুদ্ধিমান বান্দাগণই পৌছতে সক্ষম হইবেন।

মানুষের মধ্যে তিনটি শ্রেণীভেদ আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক হইতেছে সাধারণ মানুষের ঐ অংশ যাহারা আহলে হক-এর অনুসরণ করিয়াই তুষ্ট থাকে, নিজের তরফ হইতে আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কম বা বেশী কিছু করার কথা চিন্তা করে না। সব সময় যোগ্য লোকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোক উচ্চতর মর্যাদা না পাইলেও নিঃসন্দেহে নাজাত পাইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইল যথার্থ অর্থে জ্ঞানী-গুণীগণের দল। ইঁহারাই ইল্লীন বা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তবে প্রত্যেক যমানায় ইঁহাদের সংখ্যা দুই-চারিজনের বেশী থাকে না।

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে ঐ সমস্ত লোক, যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া শরীয়তের নির্দেশের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকগুলিই সাধারণত ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন একজন চিকিৎসক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখেন, রোগীগণ তাহার দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে, যদি সেই ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কোন প্রকার কম-বেশী বা নিজের তরফ হইতে কোন কিছু জুড়িয়া না দেওয়া হয় তবে রোগের চিকিৎসা এবং আরোগ্য হওয়ার আশা থাকে, কিন্তু কোন রোগী যদি অতি চালাকীর আশ্রয় নিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে উলট-পালট করিয়া ব্যবহার করিতে শুরু করে, তবে তাহার অবস্থা হাতুড়ে কবিরাজের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরূপ হইতে বাধ্য, এই ধরনের লোকের পক্ষে ধ্বংস হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ থাকে না।

এই ধরনের অতিচালাক লোক ইবলিসের অনুগামী। প্রয়োজনাতিরিক্ত চালাকী এবং অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইবলিস বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই সে বলিতে সাহস করিয়াছিল যে,আমি আদমের চাইতে উত্তম, আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে মাটির দ্বারা।[২১৫] হযরত হাসান বসরীর নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ইবলিস কি অত্যন্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন? জবাব দিলেন, নিশ্চয়, যদি সে অত্যধিক বুদ্ধিমানই না হইত, তবে এত জ্ঞানী লোককে বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইত না। প্রকৃত বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী লোকের নিদর্শন হইল, শয়তান তাহাদের উপর কোন "প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। এই সম্পর্কে ইশারা করিতে যাইয়াই আল্লাহ তা'আলা, এরশাদ করিয়াছেন; -(ইবলিস!) "আমার প্রিয় বান্দাগণের উপর তোমার কোনই আধিপত্য চলিবে না।"[২১৬] সুতরাং যাহারা প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হইয়া আল্লাহর

২১৫. আল-কুরআন, ০৬:০২

২১৬. আল-কুরআন, ১৭:৬৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশের খেলাফ কাজ করিতে শুরু করে, তাহারা শয়তানের সাগরেদ ও প্রতিনিধিতে পরিণত হইয়া যায় । আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন" শয়তানকে তোমরা দুশমন হিসাবে গণ্য কর। সে তাহার অনুসারীদিগকে জাহান্নামী হাওয়ার পথে প্ররোচিত করিতে থাকে।"[২১৭]

হে আমীর! আখেরাতের জীবনে যদি আপনি সৌভাগ্যবান হইতে চান, তবে আল্লাহর ফরমানকেই একমাত্র পথ-প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করুন। আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্যে আশ্রয় তালাশ করার পরিবর্তে অন্য কোন বাতিল পন্থা কোন সময়ই তালাশ করিবেন না। কোন তাগুতী জীবনব্যবস্থার অনুসরণও করিবেন না। যদি আপনার অন্তর সুদৃঢ় হইয়া না থাকে, যদি শান্তি ও স্বস্তির অভাব অনুভব করেন অথবা প্রকৃত সত্যপথ সম্পর্কে যদি আপনার পিপাসা থাকিয়া থাকে, তবে আমার কিতাব 'কিমিয়ায়ে সাআদাতের মধ্য হইতে প্রকৃত শান্তির পাথেয় সংগ্রহ করুন। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোন একজন হাক্কানী লোকের সাহচর্য গ্রহণ করুন, যিনি শয়তানের থাবা হইতে মুক্ত, যেন তিনি আপনাকেও শয়তানের কবলমুক্ত করিতে পারেন।।

দ্বিতীয় পত্র :

বিচারের তাৎপর্য এবং বিচার বিভাগে দায়িত্বশীললোক নিয়োগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার উচ্চ পদমর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক! যেন দুনিয়ার কাজকর্মে আপনার প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝিয়া নিতে পারেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "এবং তুমি দুনিয়াতেও তোমার হিস্যা বুঝিয়া নিতে ভুলিও না।"[২১৮] প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ার প্রকৃত হিস্যা হইল এখান হইতে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করা। প্রতিটি মানুষই আল্লাহর পথের মুসাফির। আল্লাহর আদালতের পানেই প্রত্যেকের অব্যাহত যাত্রা চলিতেছে। সেই চলার পথে দুনিয়া হইতেছে কণ্টকাকীর্ণ একটি প্রান্তর সদৃশ। এখানে পাথেয় সংগ্রহে অনীহা মুসাফিরের মিছাল হইল সেই হজ্জযাত্রীর মত, যে ব্যক্তি বাগদাদ পর্যন্ত পৌছিয়াই আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত হইয়া পড়িল।যদি কোন ব্যক্তি পাথেয় সঙ্গে না নিয়াই মরু-বিয়াবানের পথ ধরিয়া অগ্রসরও হয় এবং ভাবিতে থাকে যে, সে কাবার পানেই চলিয়াছে, তবে তাহার পক্ষে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে। কেননা সে তো পাথেয়বিহীন অবস্থায় মরুপথে পা রাখিয়া নিশ্চিত ধ্বংসের কবলে পতিত হইতে যাইতেছে। এই অনন্ত যাত্রার পাথেয় হইতেছে তাকওয়া বা খোদাভীতি আর, তাকওয়ার ভিত্তি হইতেছে দুইটি। এক, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন। দুই. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা।

কোন বাদশাহ যদি তাঁহার রাজ্যের ওজারত কিংবা শাসকের দায়িত্ব কোন যোগ্য অকর্মণ্য লোকের হাতে ছাড়িয়া দেন, তবুও তাহাতে হয়ত তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি নাও হইতে পারে, যতদূর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বিচারকের দায়িত্বে কোন অমার্জিত অসৎ লোককে নিয়োগ করার মধ্যে। কেননা, কোন এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা এবং ওজারতের কাজ হইতেছে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপার। এই দায়িত্ব কোন ঠেট দুনিয়াদার মানুষের হাতে পড়িলে সে হয়ত তাহা কোন রকমে সামলাইয়া নিতে পারে, কিন্তু, বিচারকের মসনদ যেহেতু নবুওতের মসনদের

২১৭. আল-কুরআন, ৩৫:০৬

২১৮. আল-কুরআন,২৮:৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার, সেইহেতু বিচারকার্য আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই সমাধা করিতে হইবে। কেননা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করিয়াছেন যে, "যেন আপনি আল্লাহর তরফ হইতে নাযিল করা বিধান মোতাবেক বিচারকার্য করিত পারেন।"[২১৯]

সুতরাং বিচারকার্য আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ ব্যতীত পরিচালনা করা বৈধ হইবে না। তাই যে ব্যক্তির অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও থাকে, সে তাঁহার সেই উত্তরাধিকারের মসনদে ঐ সমস্ত লোককেই নিয়োজিত করিবে, যাহাদের কার্যকলাপের দরুন হাশরের ময়দানে কোনরূপ লজ্জার সম্মুখীন হইতে না হয়।উপরোক্ত নীতির প্রতি যদি বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য না রাখা হয়, তবে আল্লাহর নির্দেশের তাযীম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি তাযীমেরই নামান্তর মাত্র।বিচারের মসনদে খোদাভীরু যোগ্য লোক নিয়াগ না করার দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ পরিহার করা। কেননা, দুশ্চরিত্র লোকের হাতে বিচারের দণ্ড চলিয়া যাওয়ার অর্থই হইতেছে নিরীহ জনগণের ইজ্জত-আবরু এবং জান-মাল বিপন্ন করিয়া তোলা। যদি কোন শাসক উপরোক্ত পাপে জড়িত হইয়া যায়, তবে তাহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত আখেরাতের জীবনের জন্য সে কি সঞ্চয় করিতেছে। বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব হইতেছে এতীমের সম্পদের হেফাজত করা। সুতরাং কাজী যদি খোদাভীরু না হয়, তবে এতীমের সম্পদের উপর জায়গীরদারীসুলভ হস্তক্ষেপ শুরু হইবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "যারা জুলুম করিয়া এতীমের সম্পদ গ্রাস করে, তাহারা জ্বলন্ত আগুনের দ্বারা উদরপূর্তি করিতেছে এবং পরিণামে তাহারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।"[২২০]

যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত কঠোর সাবধানবাণী শ্রবণ করার পরও সতর্ক না হয়, তবে তাহার দ্বারা খোদাদ্রোহিতার যে কোন কাজ করা অত্যন্ত সহজ বলিয়া আমি মনে করি।অপরপক্ষে বিচার বিভাগে যদি দ্বীনদার পরহেজগার লোক নিয়োগ করা হয় তবে সেই সমস্ত লোকের দ্বারা মুসলমানদের জান-মাল এবং ইজ্জত-আবরুরই শুধু হেফাজত হইবে না, অধিকন্তু সর্বশ্রেণীর নাগরিক সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে সমর্থ হইবে। দেশে কাহারা এলেম ও তাকওয়ার বিচারে কাজী পদে বরিত হওয়ার যোগ্য তাহা আপনার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের পক্ষে অজানা থাকার কথা নহে। ইহার পরও সাধারণ নাগরিকগণ যে সমস্ত লোকের জ্ঞান-গরিমা এবং খোদাভীরুতা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা পোষণ করে সেই শ্রেণীর লোক খুঁজিয়া বাহির করা আপনার পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নহে।যাহা হউক, আপনার দ্বারা দ্বীন ও মিল্লাতের উপকার বৈ অপকার হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অবশ্য কল্যাণকর যাহা কিছু হওয়ার তাহা আল্লাহর তওফীক শামিল হইলে পরই সম্ভব । আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন ।

তৃতীয় পত্র ঃ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত

এই পত্রে ইমাম সাহেব কঠোর ভাষায় প্রজাসাধারণের প্রতি ইনসাফ এবং তুস এলাকার জনগণের উপর হইতে রাজস্বের বোঝা হালকা করার সুপারিশ করিয়াছেন। সর্বশেষে উজিরকে স্বীয় পিতা নিজামুল মুলক এর পদাংক অনুসরণ করিয়া দৃঢ় হস্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। পত্রের উপরে লেখা ছিল, "স্বাদে কটু হইলেও উপকারী শরবত প্রেরণ করা হইল, যেন উহা পান করিয়া নিরিবিলিতে কিছুটা চিন্তা করার সুযোগ হয়। উপকারী কটু শরবত অকৃত্রিম হিতাকাংখী বন্ধুর হাতই পরিবেশন করিয়া থাকে। বন্ধুবেশী শত্রুদের তরফ হইতে যা পরিবেশন করা হয় তাহা অত্যন্ত সুমিষ্ট হইলেও ভিতরে লুক্কায়িত থাকে মারাত্মক হলাহল।"

---

২১৯. আল-কুরআন, ০৫:৪৭

২২০. আল-কুরআন, ০৪:১০

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাসূলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "আমি এবং আমার পরহেজগার উম্মতগণ অর্থহীন লৌকিকতার বোঝা হইতে মুক্ত।"

নানা প্রকার আকর্ষণীয় খেতাব এবং সম্মানসূচক উপাধির সমাবেশ ঘটাইয়া কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা লৌকিকতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করারই নামান্তর মাত্র। আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কল্যাণকামিতার প্রেরণায় অন্তরের তীক্ষ্ণ অনুভূতিস্নাত অভিব্যক্তিকে গতানুগতিকতার ক্লেদস্পর্শ হইতে দূরে রাখাই বিধেয়। যোগ্যতা এবং পদমর্যাদা উচ্চতর সীমায় পৌছার পর তাহার মধ্যে আরও কতগুলি খেতাবের তালি সংযোগ করা শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, হাস্যাস্পদও বটে। আদবের খাতিরে হইলেও এই ধরনের লৌকিকতাকে আমি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। প্রকৃত সৌন্দর্য কোন সময়ই জমকালো সাজ-পোশাকের মুখাপেক্ষী থাকে না।[২২১]

ইমাম আবু হানীফা[২২২], ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ উম্মতের মহাজ্ঞানী প্রাতঃস্বরণীয় ব্যক্তিগণের নামের পূর্বে 'খাজা, সংযোগ করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করা যেমন সকলের কানেই অপ্রাসঙ্গিক শুনাইবে, তেমনি আপনার ন্যায় যেসব গুণবান ব্যক্তি স্বীয় গুণের মাহাত্ম্যেই সর্বশ্রেণীর জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে, তাহাদের নামের আগে জবরজং ধরনের কিছু খেতাবাদির সংযোগ ঘটানোও ঠিক তেমনি অনভিপ্রেত বলিয়া আমি মনে করি। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানিফার সরল সহজ নাম দুইটির সহিত পরিচিত নয়, এমন কোন মুসলমানের অস্তিত্ব মাশরেক হইতে মাগরের কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ইহাদের নামের সঙ্গে 'খাজা বা অনুরূপ কোন প্রকার খেতাব সংযোগ করাকে হাস্যাস্পদ এই জন্য মনে হইবে যে, মাহাত্ম্য চরম পর্যায়ে পৌঁছার পর তাহার মধ্যে নতুন হাশিয়া চড়ানোও ক্ষতিকর। জাগতিক মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে আপনার স্থান এমন এক স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে যে, এখন খেতাববিহীন ভাবে আপনাকে সম্বোধন করা হইলেও তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার মোটেও সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, দুনিয়ার জীবনে আপনি সাফল্যের যে স্তরে অবস্থান করিতেছেন দ্বীনী জীবনেও সেইরূপ উন্নত মর্যাদা যাহাতে আপনি লাভ করিতে পারেন সেই দিক লক্ষ্য করিয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

চিন্তা করিয়া দেখিবেন, বয়সের দিক দিয়া বর্তমানে আপনি জীবনের শেষ স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত দ্বীনের কাজে আপনার মধ্যে সেই উৎসাহ আমি দেখিতেছি না, যাহা হওয়া দরকার ছিল।

আল্লাহ তাআলা এইরূপ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এরশাদ করিয়াছেন, "হিসাব দেওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ মানুষ এখনও গাফলতিতে ডুবিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিতেছে।"[২২৩] রাজা-বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহগণের প্রত্যেকেই সব ক্ষমতার আসন সুদৃঢ় করিয়া নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী হন। রাজ্যের সীমান্ত এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা মজবুত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানা প্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটাইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইতে চেষ্টা করেন। কেহ হয়ত ধন-দওলতের জোরে মজবুত দুর্গ, সুরক্ষিত প্রাচীর-পরিখা এবং শাস্ত্রী-সিপাহী বসাইয়া স্বস্ব ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিতে সচেষ্ট হন। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা ফকীর-

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২২২. হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর প্রকৃত নাম নো'মান, পিতার নাম সাবিত, কিন্তু তিনি তাঁর কন্যা হানিফার নামে আবু হানিফা নামেই অধিক পরিচিত।

২২৩. আল-কুরআন, ২১:০১

Dhaka University Institutional Repository

দরবেশ এবং দ্বীনদার মুসলমানদের দোয়ার সাহায্যে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও দৃঢ়তার প্রত্যাশী হন। শেষোক্ত শ্রেণীকে পরিপূর্ণ সাফল্য দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর সম্মুখে এমন এক জ্বলন্ত নজীর পেশ করিয়া থাকেন, যেন সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, সৈন্য-সামন্তের জৌলুস এবং অস্ত্রশস্ত্রের ঝংকার আসমানী আজাব-গজব প্রতিহত করিতে পারে না।

তুসের বর্তমান শাসকের সাম্প্রতিক অবস্থার দ্বারা দ্বিতীয় দলের ধর্মপন্থাকে। এমনভাবে ভুল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যেন সে অনুভব করিতে পারে যে, মজবুত দুর্গের লৌহকপাট এবং ধন-সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার আসমানী আপত দূর করিতে সমর্থ হয় না বরং এইগুলিতে অনেক সময় বিপদ ও ধ্বংসই ডাকিয়া আনে। কোরআন শরীফে এই বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, "ইহারা সম্পদ সঞ্চয় করিয়া গণনা করিতে থাকে, মনে করে এই সম্পদই তাহাকে চিরকাল টিকাইয়া রাখিবে। না, এইরূপ কখনও হইবে না, খুব শীঘ্রই উহাদিগকে ভস্মকারক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। তোমরা জান কি সেই ভস্মকারী কি বস্তু? উহা আল্লাহর তরফ হইতে প্রজ্জ্বলিত এমন এক ভয়াবহ অগ্নিশিখা, যা অন্তর্দেশ পর্যন্ত গিয়া প্রবেশ করিবে এবং তীব্র বৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে।"[২২৪]

অন্যত্র বলা হইয়াছে, "হায়! আমার সম্পদ আমার কোনই কাজে আসিল না, আমার ক্ষমতার দাপট আজ আমা হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"[২২৫] আরও বলা হইয়াছে, "মৃত্যু আসিবার পর তাহার সহায়-সম্পদ কোনই কাজে লাগিবে না।" খোরাসানের বর্তমান শাসকের নীতিকে পূর্বোল্লিখিত তৃতীয় পর্যায়ের লোকদের একটি বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার এখানেই দেখা যাইতে পারে যে, দরবেশের শুকনা রুটির টুকরা সেই কাজ করিয়া দিতে পারে, যা লক্ষ লক্ষ ঘোড়সওয়ার বা দীনার দ্বারাও করা সম্ভব হয় না। দরবেশের আহাজারী, শেষ রাত্রের ক্রন্দন ও মুনাজাতে মারণাস্ত্রের ঝনৎকার স্তব্দ করিয়া দেয়, অশ্বখুরের বুক কাঁপানো আওয়াজের চাইতে দরবেশের আহাজারী অনেক বেশী প্রাণরস সিক্ত, অনেক বেশী, প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির অধিকারী।

আমার এই কথার সমর্থন পাওয়া যাইবে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসে। এরশাদ করিয়াছেন, "দোয়া বিপদ-আপদের গতি ফিরাইয়া দেয়।"[২২৬] আরও বলিয়াছেন, "দোয়া এবং আপদ-বিপদ একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।"[২২৭] যে ব্যক্তি তাহার শাসন ক্ষমতা কর্মচারীর হাতে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তিনি শান্ত নির্বিরোধ হইতে পারেন, তবে যোগ্য নন। আপনার মরহুম পিতা একবার শুনিতে পাইলেন যে, কেরমানের বাদশাহ অনেক দান-খয়রাত করিয়া থাকেন, এই খবর শুনিয়া তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি সদকা-খয়রাত পছন্দ করিতেন না, এমন নয়, বরং তাহার ধারণা ছিল পূর্ব-পশ্চিমে এমন কোন রাজা-বাদশাহ বা আমীর-ওমরাহ নাই, যিনি দয়ায়-দাক্ষিণ্যে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন।

একমাত্র দ্বীনি ব্যাপার ব্যতীত আর কোন ব্যাপারেই হিংসা জায়েয নাই। তবে দ্বীনি ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক হিংসা অনেক সময় ওয়াজেব হইয়া যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "শুধু দুই

২২৪. আল-কুরআন, ১০৪:২-৬
২২৫. আল-কুরআন,৬৯:২৯
২২৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৩৬
২২৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর লোকের জন্যই পরস্পর হিংসা করার অনুমতি আছে। প্রথম ঐ শ্রেণীর লোক যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা মাল দিয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহর রাস্তায় সেই মাল খরচ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই সমস্ত লোক যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়াছেন, তাহারা সেই এলেম অনুযায়ী আমল করে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদিগকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করে।"[২২৮]

তুসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল হওয়া দরকার। জুলুম-অত্যাচার এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া সমৃদ্ধ সেই জনপদটি বর্তমানে উজাড় হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত আপনি স্বয়ং এই এলাকার দেখাশোনা করিতেন, ততদিন সমাজ-শত্রু ধরনের লোকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া চলিত। কৃষকেরা শস্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে বাজারে চলিয়া আসিত। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ছিল না। অত্যাচারীরা শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকদিগকে তোয়াজ করিয়া পথ চলিত। কিন্তু আপনি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পর শাসন ব্যবস্থার সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। কৃষকদের ঘরে এবং শস্যের গোলায় রীতিমত লুটেরাদের হামলা শুরু হইয়াছে। বাজারের গুদামসমূহে রাতের বেলায় ডাকাতপড়া এখন একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। লোকেরা পরোক্ষভাবে অবশ্য শহরের শানসকর্তাকেই এই সব অনাচারের জন্য দায়ী করিতেছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রকৃত অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যাপারে ব্যর্থতা এমন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, নিরীহ দরবেশগণ পর্যন্ত কল্পিত অভিযোগের শিকারে পরিণত হইয়া লাঞ্ছনার সম্মুখীন হইতেছেন।

এই এলাকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার এই বর্ণনা হইতে ভিন্নতর অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা যদি আপনার নিকট পৌছে এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অন্ধকারে রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তবে মনে রাখিবেন, ঐ সমস্ত লোক আপনার দ্বীন-ধর্মের দুশমন বৈ কিছু নয়। আমার উপদেশ হইতেছে, প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। নিজের আত্মার উপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহর বান্দাদিগকে এইভাবে ধ্বংস হইতে দিবেন না। দরবেশদের দীর্ঘশ্বাস এবং শেষরাতের আহাজারীকে ভয় করুন। বর্তমান অবস্থা যদি আপনার হাত দিয়া সংশোধিত হয়, তবে উহা আপনার জন্যও খুবই মঙ্গলজনক হইবে। অন্যথায় জনগণের এই হাহাকার আপনাকেও দগ্ধীভূত করিতে ছাড়িবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "আমিই কল্যাণ সৃষ্টি করিয়াছি এবং কল্যাণের উপকরণও সৃষ্টি করিয়াছি। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাহাকে আমি কল্যাণকর কাজের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছি এবং যাহার হাত দিয়া কল্যাণ বিস্তারলাভ হয়। অন্যদিকে ঐ সমস্ত লোকের জন্য আক্ষেপ, যাহারা অনাচারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং অনাচার যাহাদের হাত দিয়া বিস্তার লাভ করিতেছে"। (হাদীসে কুদসী)[২২৯] যদি কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন পরিস্থিতিতে জড়িত হইয়া পড়ে তবে তাহার প্রতিকার একমাত্র অনুশোচনার অশ্রু দ্বারাই হইতে পারে, দ্রাক্ষারসের দ্বারা নহে। আপনার ইয়ার-দোস্তরা মজলুম প্রজাসাধারণের এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর হইয়া আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত রহিয়াছে। আপনার জানা দরকার যে, তুসবাসীদের নেক দোয়া এবং বদদোয়া উভয়ই পরীক্ষিত।

---

২২৮. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতিবে তিবরিয়ি(রহ.):*মিশকাতুল মাসাবিহ*,হাফেজ মাওলানামুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত:(ঢাকা:আল-কাউসার প্রকাশনী, তা.বি.খ.১, পৃ.১০

২২৯. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

আমি শাসনকর্তাকে এই ধরণের উপদেশ অনেক দিয়াছি, কিন্তু সে তাহা কবুল করে নাই। আজ সে অন্যের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সামগ্রীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মহাপুরুষগণের বাক্যে আছে, প্রত্যেক জালেমের গলদেশে অপর জালেমশক্তি আসিয়া জড়াইয়া পড়ে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা উভয়ের উপর হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহা বাস্তব সত্য যে, এই দুনিয়ায় কেহই ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক নহে। যেসব লোক টাকা-পয়সা, এবং বিষয়-সম্পত্তির মোহে পড়িয়া অন্তর জ্বালাইয়া দেয়, অতি অবশ্যই উহারা সেই বিষয়-সম্পত্তির বিচ্ছেদজনিত জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। অবশ্য এই জ্বালারও তিনটি স্তর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর সৌভাগ্যসূচক। সৌভাগ্যসূচক এইরূপে যে, সেইসব ভাগ্যবানদের সময় থাকিতেই বোধাদয় হয় এবং স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁহারা টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, মজলুমদের পাওনা মিটাইয়া দেয় এবং গরীব-মিসকীনদের মধ্যে খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিষয়-সম্পদের এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ইচ্ছাকৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে জ্বালা উপস্থিত হয়, তবে ধীরে ধীরে তাহার পক্ষে সেই জ্বালা গা সওয়া হইয়া যায়। কোরআনের ভাষায় ঃ যাহারা সদকা খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ইহারা তাহাদেরই পর্যায়ভুক্ত হইবেন।[২৩০]

দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক হইল, যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া টাকা-পয়সা রোজগার করে সম্পদের পিছনে জীবন পাত করিয়া দেয়, তবে টাকা হাতে আসিলে তদ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও আল্লাহর আজাব-গজব হইতে রক্ষা পাওয়ার পথ তালাশ করে। সকল প্রকার পাপের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার উদ্দেশেও সাধ্যমত খরচ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোককে কোরআন শরীফে মধ্যপন্থী সাবধানী লোক হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে।

তৃতীয় স্তরের লোকেরা হইতেছে, যথার্থ অর্থে হতভাগ্যদের শ্রেণীভুক্ত। কেননা, ইহারা জীবন থাকিতে সম্পদ ছাড়িতে চায় না। আল্লাহর পথে কিছু দেওয়া তাহাদের ধাতে সয় না। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ফয়সালার ভার মালাকুল মউতের হাতে চলিয়া যায়। আল্লাহ পানাহ! এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, এই শাস্তি কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আখেরাতের আজাব কঠিনতম, হায় উহারা যদি তাহা জানিত এই শ্রেণীর লোকেরাই জালেম এবং প্রকৃত অনাচারীদের শ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিবেচ্য। তাই বলা হইয়াছে, দুনিয়াতেই যেইসব লোক অন্যায় করিয়া সাজাপ্রাপ্ত হইয়া যায়, মনে করিতে হইবে, তাহারা সৌভাগ্যবান, নেকবস্তুত আপনি চেষ্টা করুন, যেন সদকা-খয়রাতের ক্ষেত্রে সকলের অগ্রণী হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন।

এই উপকারী তিক্ত কথাগুলি এমন এক ব্যক্তির যবান হইতে শ্রবণ করুন যে, যাহার সকল প্রকার চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক দুনিয়ার সমগ্র রাজা-বাদশাহ এবং আমীরওমরাহগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার পরই এই ধরণের উপদেশ প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। আপনি এই উপদেশগুলির মূল্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করুন। মনের মধ্যে এই কথা উত্তমরূপে গাঁথিয়া রাখুন যে, যদি কেহ আসিয়া আমার বর্ণনা করা উপরোক্ত বিষয়গুলির বিরোধী কোন তথ্য আপনার সম্মুখে তুলিয়া ধরে, তবে তাহা হইবে এইজন্য যে, প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিবার পথে তাহার ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং কিছু পাওয়ার আশাই সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে।

---

২৩০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনার মহান পিতার কথা স্মরণ করুন। অদ্য রাত্রেই সমগ্র জগৎ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িবে, তখন আপনি উঠিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাক কাপড় পরিধান করুন, অজু করুন এবং নিরিবিলি একটি পবিত্র স্থানে গিয়া দুই রাকাত নামায পড়ুন, সালাম ফেরানোর পর পুনরায় ললাটদেশ জমিনে ঠেকাইয়া সেজদারত রোরুদ্যমান অবস্থায় মুনাজাত করুন।[২৩১]

'হে আসমান-জমিন এবং দুনিয়া জাহানের মালিক! তোমার অপার ক্ষমতার রাজ্যে তো কোন সময়ই ভাটার সম্ভাবনা নাই। হে মালিক! তুমি এমন এক শাসকের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাহার রাজ্য দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার দেশবাসীকে গাফলতির নিদ্রা হইতে উদ্ধার কর। প্রজাসাধারণের যথার্থ কল্যাণ করিবার তওফীক দান কর। এইরূপে কাতরভাবে দোয়া করার পর কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আজকের দুর্ভিক্ষপীড়িত আইন-শৃংখলা বিবর্জিত দেশের মধ্যে প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তা করুন; কিভাবে উহাদের অবস্থার উন্নতি করা যায় সেই সম্পর্কে কোন একটা পরিকল্পনা স্থির করার চেষ্টা করুন। দেখিবেন, সৌভাগ্যের সকল রুদ্ধদ্বার আপনার সম্মুখে আপনা হইতেই খুলিয়া যাইতে থাকিবে, কল্যাণ এবং বরকত চারিদিকে হইতে সমবেত হইতে শুরু করিবে। গায়েবী সাহায্যে আপনার সকল সমস্যার সুসমাধান হইতে থাকিবে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

চতুর্থ পত্র

[উজারতের পদ লাভ করার পর ফখরুল-মুলককে মোবারকবাদ প্রদান উপলক্ষে ইমাম গাজালি এই পত্র লেখেন। পত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব, প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধন এবং সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করার পর সেই যুগের প্রখ্যাত আলেম ইমাম ইবরাহীম মোবারককে শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুপারিশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, ইবরাহীম মোবারকের ন্যায় একজন এবাদত গোযার মোত্তাকী পরহেজগার আলেম কোন একটি শহরে থাকিলে সেই শহর এলেম, তাকওয়া এবং আল্লাহর নূরে আবাদ হইয়া যাইবে।]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

দোয়া করি, মহাত্মনের সৌভাগ্যরবি আরও উজ্জ্বল হউক। প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি আরও সুবিস্তৃত হউক। সঙ্গে সঙ্গে আপনার অন্তরদেশও পবিত্র নূরের স্পর্শে উজ্জ্বলতর হউক, এমন নূর, যে নূরের প্রভাবে মানব হৃদয়ের সকল সংকীর্ণতা দূর হইয়া প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে হেদায়েত প্রদান করিতে চান, তাহার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন। আর যাহার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, সেই ব্যক্তি তাহার পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে হেদায়েতের নূরের উপর কায়েম রহিয়াছে।"[২৩২]

কাহারো অন্তরের মধ্যে এই নূর সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ হইল, সে যখন দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন দুনিয়ার সবকিছু সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তাহার দৃষ্টিতে এর অভ্যন্তরভাগ নানা প্রকার জঞ্জালে পরিপূর্ণ দেখিতে পায়। চলমান জীবন মানুষের যতই সুখী-সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহার দৃষ্টিতে এই সমস্ত লোকের আখেরাতের জীবন অত্যন্ত সংকটপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মৃত্যুকে যেখানে দুনিয়ার মানুষ ভবিষ্যতের একটি ব্যাপার বলিয়া গণ্য

২৩১. প্রাগুক্ত
২৩২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করিতে অভ্যস্ত, সেখানে খোদায়ী নূরের আলোকে আলোকিত অন্তর-বিশিষ্ট লোকেরা তাৎক্ষণিক বিষয় তথা যে কোন মুহূর্তে হাজির হওয়ার মত বাস্তব সত্য বলিয়া গণ্য করেন। "তাঁহারা জানেন, যাহা অবশ্যই আসিবে সেই মৃত্যু নিকটেই রহিয়াছে।" -"তোমাদের প্রত্যেকরই মৃত্যু তাহার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটে রহিয়াছে।"[২৩৩]

দুনিয়ার জীবন যাত্রায় সাধারণ মানুষ যেখানে নিত্য-নতুন আশা-আকাংখায় উদ্বেল, ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর, সেখানে খোদায়ী নূরে উদ্ভাসিত অন্তরবিশিষ্টগুণ আখেরাতের ভয়াবহ চিত্র এবং সুনিশ্চিত বিপদ আশংকায় ক্রমাগত প্রকম্পিত হইতেথাকে। নিজেকে সম্বোধন করিয়াই সে বলিতে থাকে যে, "তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, (দুনিয়ার এই জীবন) কয়েকটি বৎসর মাত্র ফায়দা গ্রহণ করার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহার পরই সেই অঙ্গীকারকৃত (মৃত্যু) তাহার নিকট আসিয়া হাজির হইবে। যেসব বিষয় দ্বারা তাহারা এতদিন ফায়দা হাসিল করিয়াছে তাহার কিছুই সেই দিন কোন কাজে আসিবে না।"[২৩৪]

উজিরে আযম! আপনাকে আল্লাহর তরফ হইতে উপরোল্লিখিত আলোকিত অন্তর প্রদান করা হইয়াছে কি না, তাহা জানার উপায় এবং লক্ষণ হইল, অন্তরকে একটি পরিষ্কার তক্তিতে রূপান্তরিত করুন। আপনার চোখের সম্মুখে যে সমস্ত আমীর-ওমরাহ গত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের যশমান এবং জীবন কাহিনীর প্রত্যেকটি দিক সেই তক্তিতে অংকিত করিয়া নিন। তাঁহাদের শেষ পরিণতির কথা তক্তিতে অংকিত যশ-গাথার পাশাপাশি রাখিয়া একবার গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকার ভাবেই না এইরূপ চিন্তা করার নির্দেশ দিয়াছেন। বলা হইয়াছে, "ইহারা কি ঐসব ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না? ইতিপূর্বে এক এক যুগের কত লোককেই তো আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ী-ঘরে ইহারা হাঁটিয়া বেড়ায়। এইসব ঘটনার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাবান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রহিয়াছে।"[২৩৫] "পূর্ববর্তীগণকে কি আমি ধ্বংস করি নাই, এবং পরবর্তীগণকেও কি করি নাই তাহাদের অনুবর্তী?" রাসূলে মকবুল (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "লোক সকল! মৃত্যু পূর্ব নির্ধারিত বাস্তবসত্য। ইহার যেসব হক রহিয়াছে, সেইগুলি ওয়াজেব-এর অন্তর্গত। প্রতিদিনই জানাযার আকারে আমাদের মধ্য হইতে লোক চলিয়া যাইতেছে। ইহারা আর কোনদিন আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না।যখন তোমরা উহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ভোগ করিতে যাও, তখন এমনভাবে ভোগ কর, যেন তাঁহাদের পর তোমরা অনন্তকাল এখানে বসবাস করিতে। তোমরা প্রত্যেক উপদেশ দানকারীর উপদেশ ভুলিয়া যাইতেছ, প্রত্যেকটি সৎলোকের প্রতি অপবাদ আরোপ করিতেছ।"

একের পর এক উজির ক্ষমতাসীন হইয়াছেন এবং ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়া বিদায়। হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই অন্যের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ছিলেন। ফলে দেশের যাহা পরিণতি হওয়ার তাহাই হইয়াছে। সবাই সেই দৃশ্য দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের কাহরো এতটুকু জ্ঞান হয় নাই যে, যে কাজের ভিত্তি দুর্বল হয়, উহার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা সেই কাজ করেন, তাঁহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ তা'আলা এই সত্যটিই এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "যে সমস্ত লোক আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়িয়া অন্য অভিভাবকের শরণাপন্ন হয়, তাহাদের মিছাল হইল যেমন : মাকড়শা জাল বুনিয়া বাসস্থান তৈরী করে, মাকড়শার সেই ঘর তো অত্যন্ত

২৩৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল: আস-সহীহ; সম্পাদনা: ড. মুস্তাফা আদীব আল-বাগা (বৈরুত; দারু ইবনি কাসীর আল-ইয়ামামাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ ইং)
২৩৪. আল-কুরআন, ২৬;২০৫
২৩৫. আল-কুরআন, ২০;১২৮

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বল ক্ষণভঙ্গুরই হইয়া থাকে। হায়! তাহারা যদি এই সত্যটুকু অনুধাবন করিতে পারিত।"দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা উজিরে আযমকে অন্তরদৃষ্টির দওলত দ্বারা মণ্ডিত করুন, যেন তিনি তাহার কর্মপদ্ধতির গভীরতা ও প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শুধু বাহ্যিক কাজকর্মের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখে আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মূল উৎস দুইটি অভ্যাস, একটি সুবিচার এবং অপরটি ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, নিজের মধ্যে বান্দাসুলভ এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি করিতে হইবে, যে অনুভূতি সর্বাবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে বান্দাসুলভ বিনয় এবং তাঁহার দেওয়া দায়িত্বের হক সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত রাখে।[২৩৬]

সুবিচার অর্থ হইতেছে, নিজেকে একজন শাসিত প্রজা হিসাবে কল্পনা করিয়া আপনি শাসকের নিকট হইতে যেইরূপ ব্যবহার আকাংখা করিবেন, প্রজাসাধারণের সঙ্গে যেন আপনি সেইরূপ ব্যবহারই করেন। সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, এই দুইটি আদেশকে আপনি জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করুন। বান্দার প্রতি আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। ন্যায় বিচারক, সুশাসকমাত্রই এই দুইটি আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন যোগ্য শাসকের পক্ষেই প্রজাসাধারণের দুরবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা কাম্য হইতে পারে না। কেননা, শাসিত জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য কাল মহাবিচার দিনে শাসককুলকে অবশ্যই যে জবাবদিহীর সম্মুখীন হইতে হইবে, কোন সচেতন শাসকই তাহার মোকাবেলা করিতে পছন্দ করিবেন না। আমি বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত মিলামিশা এবং পত্রালাপের সম্পর্ক সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছি। বর্তমানে তাহা আর নতুন করিয়া বিস্তৃত করিতে চাহি না। এই কয়টি কথা উজির পদে আপনার নিয়োগ উপলক্ষে মোবারকবাদ প্রদান, বিশেষতঃ দ্বীনদার মুসলমানগণের প্রতি আপনার দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত হইল। এতদসঙ্গে আরও দুই একটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞাত করাইয়া দেওয়া হইল মাত্র। সুতরাং আমার পক্ষ হইতে প্রেরিত এই মোবারকবাদী পয়গাম নজরানা-উপঢৌকন শূন্য নয়। নেক দোয়ার পর উলামাগণের তরফ হইতে জনগণের কল্যাণ, এসলাহ সম্পর্কে রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমরাহগণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং যথার্থ পথ প্রদর্শনই হইতেছে সর্বোত্তম নজরানা! জুরজান শহর বেশ কিছুকাল হইতে এমন একজন আমলধারী যোগ্য আলেম হইতে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, জনগণের উপর যাহার চরিত্রের সুপ্রভাব পড়িতে পারে। সম্প্রতি মুসলিম জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামী বিশিষ্ট আলেম ইবরাহীম মোবারক এই শহরে আগমন করায়, তাহার এলেম, তাকওয়া' এবং মারেফাতের আলোতে চারিদিকে নতুন জীবনের স্পন্দন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার ওয়াজ-নসিহত এবং শিক্ষাদানের প্রভাব দূরদূর পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই ব্যাপক সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে। এই ব্যক্তি দীর্ঘবিশ বৎসর আমার সাহচর্যে থাকিয়া তুস, নিশাপুর, বাগদাদ, শাম,হেজায প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে আমি সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা, তাকওয়া-পরহেজগারী এবং নিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার ক্ষেত্রে তাহার মত কোন শিক্ষার্থী আমার নজরে পড়ে নাই। যে জনপদে তাহার ন্যায় একজন হাক্কানী আলেম অবস্থান করিবেন, উহা নিঃসন্দেহে আবাদ হইয়া যাইবে। খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কিছু ঈর্ষাকাতর দুশমনেরও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত লোক নানা ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা অভিযোগের জাল বিস্তার করিয়া কর্তৃপক্ষের সম্মুখে তাঁহার মর্যাদাকে ছোট করিয়া দেখানোর অপচেষ্টা করিতে পারে।

আমি মনে করি, এই আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ আলেমকে পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং ইহার নেক দোয়াকে দুনিয়া-আখেরাতের পাথেয় রূপে গ্রহণ করার চেষ্টা করা উজিরে আযম হিসাবে আপনার অন্যতম প্রধান দ্বীনী দায়িত্ব।

---

২৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহপাক আপনার দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহান কল্যাণ ও সৌভাগ্যে ভরিয়া দিন। দরবারের মোসাহেব শ্রেণীর দুষ্কৃতিতে সচরাচর যেসব বিপদাপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, হাক্কানী আলেমগণের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে সেইসবের গতিরোধ করিয়া দিন। আমীন!

পঞ্চম পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "কিছু সংখ্যক খাস বান্দাকে আল্লাহ পাক বিশেষ বিশেষ নেয়ামত দান করিয়াছেন। সেই নেয়ামতের দ্বারা সাধারণ লোকদের কল্যাণ করা তাহাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহারা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তবে বুঝিতে হইবে আল্লাহর তরফ হইতেই এক একজন কর্মী হিসাবে তাঁহারা সেই কাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে। তাহাদের পরিণাম হইবে অত্যন্ত ভাল। দুষ্কৃতকারী গোনাহগারদিগকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেন। সেই দানের উদ্দেশ্য হইতেছে কিছুটা ঢিল দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাহাদিগকে পাকড়াও করিব যে, তাহারা তা জানিতেই পারিবেনা। তাহাদিগকে কিছুটা অবসরও দিব, নিঃসন্দেহে আমার কর্মধারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত।"[২৩৭]

যাহারাই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বা বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হইবেন, তাহাদের অবস্থা হইবে দুই রকম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি পথ দেখাইয়াছি, অতঃপর হয় তাহারা শোকর গোযার হইবে; অন্যথায় কুফুরী করিবে।"[২৩৮] আল্লাহর নেয়ামত, তাঁহার দেওয়া রাজপাট এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে তাহার তরফ হইতে রকমারী সাহায্য-সহযোগিতার শোকরগোযারী হইতেছে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পতাকাকে সমুন্নত করার চেষ্টা করা, সত্য-ন্যায়ের বাণীকে উন্নতশির এবং জুলুম-নির্যাতনের উৎখাত করিয়া সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ও সহানুভূতির পরিবেশ গড়িয়া তোলার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।

নিমোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক এই কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন, "হে দাউদ! আমি তোমাকে এই দুনিয়ার বুকে খেলাফত দান করিয়াছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর; আর কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তাহা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে।"[২৩৯] দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নেয়ামত-দওলত যেসব লোকের পক্ষে দুর্ভাগ্য এবং মন্দ পরিণতির কারণ হয়, তাহাদের লক্ষণ হইল, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দ্বারা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও বর্ধিত হইতে থাকে।এই বিষয়টি কোরআন পাকে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, "আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে এইভাবেই ধ্বংস করি নাই, এবং তাহাদের অনুবর্তীগণকে? পাপীদের সঙ্গে আমি অনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি।"[২৪০] উহাদের মন-মস্তিষ্কে অকৃতজ্ঞতা এবং উপেক্ষা এমনভাবে আসিয়া বাসা বাঁধিবে যে, আজাব নামিয়া আসার পর তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইবে "হায়! আমি তো ধারণাই করিতে পারি নাই যে, এইসব এমনভাবে ধ্বংস হইতেপারে"।

---

২৩৭. আল-কুরআন, ৬৮;৪৫

২৩৮. আল-কুরআন, ৭৬;০৩

২৩৯. আল-কুরআন, ৩৮;২৬

২৪০. আল-কুরআন, ৭৭;১৬-১৮

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে যাহাদিগকে দুনিয়ার নেয়ামত-সম্পদ দান করিয়া সৌভাগ্যবান করা উদ্দেশ্য হয়, তাহাদের আলামত হইল, আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং কল্যাণকর কাজে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ হইতেই তাহাদিগকে তওফীক প্রদান করা হয়। তীক্ষ্ণ অনুধাবনশক্তি, দ্বীনের প্রতি যথার্থ মহব্বত এবং কর্তব্যপরায়ণতার অনুভূতিতে ঐ সমস্ত লোককে এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হয় যে, কোথাও লোভ-লালসা, অন্যায়-অনাচার প্রভৃতি যে কোন প্রতিকূল পরিবেশ দেখা দিক না কেন, ঐ সমস্ত লোক সেইমত পরিস্থিতিও নির্ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতা মূলশুদ্ধ উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। সর্বপ্রকার বেদাত, কুসংস্কার এবং অর্থহীন লোকাচারের সকল জঞ্জালও উৎখাত করিয়া ফেলে । তাহাদের পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর মাখলুকের প্রতি উদার এবং মমতাপরায়ণ হইতে থাকে। এইভাবে তাঁহারা সৌভাগ্যের এমন এক স্তরে গিয়া উপনীত হন, যেখানে অবস্থান করিয়া তাঁহারা বিরামহীনভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের দ্বারা সিক্ত হইতে থাকেন। আল্লাহ পাক আপনার চরিত্রে উপরোক্ত সকল গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটান এবং চরিত্র-মাধুর্যের মাধ্যমেই আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সৌভাগ্যের অধিকারী করুন। আমীন!

উজীরগণের পত্র

প্রসঙ্গ কথা:

জীবনের এক পর্যায়ে আসিয়া হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালির অন্তর দুনিয়ার সকল সম্পর্ক হইতে দূরে সরিয়া গভীর আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। বাগদাদের প্রখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকার এই সময়ে তিনি পরম আকাংখিত মহা সত্তার ডাক অনুভব করিলেন এবং ছাট ভাই আহমদ গাজালিকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া হজ্জের সফরে বাহির হইয়া গেলেন। এই যাত্রা তাহার অনন্ত যাত্রায় পরিণত হইল। হজ্ব শেষ করার পর বাগদাদ ফিরিয়া আসার পরিবর্তে পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া তিনি দরবেশের জীবন যাপন করিতে শুরু করিলেন। বাগদাদ হইতে ইমাম সাহেব, চলিয়া যাওয়ার পর নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িল। বাগদাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র যেন উজাড় হইয়া গেল। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইমাম সাহেবকে দ্বিতীয়বার আসিয়া নিজামিয়ার পরিচালনা ভার গ্রহণ করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষ পরামর্শ শুরু করিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের উজিরগণের মধ্যে এই ব্যাপারে পত্রালাপ হয়। শেষ পর্যন্ত ইরাকের উজিরে আযম খোরাসানের উজিরকে ইমাম সাহেবকে বাগদাদে পুনরাগমন করার ব্যাপারে সম্মত করানোর জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন।নিম্নে উজিরগণের লিখিত দুইটি পত্র এবং সর্বশেষে ইমাম সাহেবের জবাব উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ইমাম সাহেবের প্রতি ইরাকের উজিরের পত্র –

প্রখ্যাত উজির বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নেজামুল মুলক-এর পুত্র নিজামুদ্দিন আহমদ ইমাম তাবারীর ইন্তেকালের পর হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালিকে নিজামিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করিয়া নিম্নোক্ত পত্রটি লিখিয়াছিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মহামান্য ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে ব্যক্তি ও গুণের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া এবং প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া বিশ্ববাসির প্রত্যেকের উপরই অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ, শুকুর আদায় করা ব্যতীত অন্যকোন পথে সম্ভবপর হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কিতাবে বলিয়াছেন, "যদি তোমরা শুকুর আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই নেয়ামত বাড়াইয়া

Dhaka University Institutional Repository

দিব" ।[২৪১] আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেন তন্মধ্যে এলেমের দৌলতের চাইতে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ আর কিছুই হইতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "যাহাকে ইচ্ছা তিনি প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাহাকে প্রজ্ঞার নেয়ামত দান করা হয়। তাহাকে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী করা হয়।[২৪২] সুতরাং এই মহামূল্যবান নেয়ামত দ্বারা যাহাকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে, উহার শুকরিয়া আদায় করা তাহার উপর সর্বাধিক বড় দায়িত্ব। জ্ঞান পিপাসুগণের তৃষ্ণা নিবারণ এবং মুসলমান সাধারণের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা ব্যতীত এলেমের শুকরিয়া আর কি হইতে পারে?

আপনাকে আল্লাহ তাআলা এলেম ও প্রজ্ঞার একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছেন। এত জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি এই ক্ষেত্রে সারা মুসলিম দুনিয়ার একক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাজ্ঞানী ইমাম হিসাবে আপনি সকল মহলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নজিরবিহীন বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদার যাকাত প্রদান করাও আপনার উপর ফরয বৈ কি। এলেমের প্রসার এবং জ্ঞান পিপাসুগণের পথ প্রদর্শনই এলেমরূপ মহা সম্পদের প্রকৃত যাকাত বলিয়া আমাদের ধারণা। এই যুগ আপনার সুপ্রভাবে গৌরবান্বিত। যেখানেই আপনি অবস্থান করুন না কেন মুসলিম জনগণ আপনার জ্ঞানের রশ্মিতে আলোকিত হইতে থাকেন। তবে এই সত্য আপনিও অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, আপনার ব্যক্তিত্ব যেমন সুউচ্চ, আপনার প্রভাব যেমন সর্বব্যাপী, তেমনি আপনার অবস্থান স্থলও ইসলামী মিল্লাতের কেন্দ্রভূমিতেই হওয়া উচিত। যেন দুনিয়ার সকল এলাকা হইতে জ্ঞানপিপাসুগণ সহজে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করার উদ্দেশ্যে সমবেত হইতে পারেন। আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, বাগদাদ ব্যতীত বর্তমান মুসলমান দুনিয়ার সেই কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন শহর আর দ্বিতীয়টি নাই। দীর্ঘকাল হইতে বাগদাদবাসিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে এখানে আগমনের জন্য বিনীত দাওয়াত পেশ করিতেছে। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সকলের এই আরজু পূর্ণ করেন, তবে তাহা আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর এবং সঙ্গে সঙ্গে পারত্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রধান উসিলা হিসাবে পরিগণিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাগদাদ সফরের সিদ্ধান্ত এই সময়ে অত্যন্ত উপকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রশংসার ও কৃতজ্ঞতার কারণ হইবে।

উজিরে আজমকে লিখিত ইমাম গাজালির জবাবী পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই কোন না কোন একটি লক্ষ্য রহিয়াছে, যেদিকে তাহারা মুখ ফিরাইয়া থাকে। তোমরা বরং সৎকর্মে অন্যান্যদের সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সচেষ্ট হও।"[২৪৩] এই আয়াতের দ্বারা প্রত্যেকেরই জীবনের এমন একটি স্থির লক্ষ্য থাকে, যাহা সম্মুখে রাখিয়া সে জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তার সকল আকাংখা সেই লক্ষ্যস্থলের চারিদিকেই আবর্তিত হইয়া থাকে।"তোমরা সৎকর্মে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হও।" এই কথা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তোমরা জীবন পথে একটি সর্বোত্তম লক্ষ্য স্থির কর এবং সেই লক্ষ্যে পৌছার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাক।মানুষ সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবনের যে লক্ষ্যস্থল স্থির করে, তাহা তিন প্রকার হইতে পারে।

---

২৪১. আল-কুরআন, ১৪;০৭

২৪২. আল-কুরআন, ০২;২৬৯

২৪৩. আল-কুরআন, ০২;১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রকার ঐ সমস্ত সাধারণ মানুষ যাহারা গাফেল।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবিগণ অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকারের মধ্যে ঐ সমস্ত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন লোকজনকে শুমার করা হয়, যাহারা তীক্ষ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

গাফেল শ্রেণীর লোকেরা দৃষ্টির সম্মুখে পতিত স্থুল ক্ষণস্থায়ী মঙ্গলটুকুই শুধুমাত্র লক্ষ্য করে। তাহারা মনে করে, দুনিয়ার এই জীবনটাই সর্বোত্তম নেয়ামত। দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ এবং বিলাস সামগ্রীকেই সবকিছু মনে করিয়া তাহারা জীবনের সকল মনোযোগ এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পিছনেই স্থিরিকৃত করিয়া ফেলে। দুনিয়ার সাফল্যকেই পরম পাওয়া মনে করিয়া তৃপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "একটি নিরীহ মেষপালের মধ্যে দুই দুইটি বাঘের আবির্ভাবে যে সর্বনাশের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার চাইতেও অনেক গুণ বেশী সর্বনাশ সাধন হয় মুসলমানের দ্বীনি জিন্দেগিতে সম্পদ এবং পদমর্যাদার লালসায়।"

আত্মভোলা গাফেলেরা সেই ক্ষুধার্ত দুইটি ব্যাঘ্রের রক্তচক্ষু দেখিয়াও নিজেকে রক্ষার কথা ভাববার মত অবকাশ পায় না। গভীর খাদে পড়িয়া থাকিয়াও ইহারা মনে করে যে, সুউচ্চ মর্যাদার আসনেই তাহারা সমাসীন রহিয়াছে। ইহাদের এহেন অধঃপতনের প্রতি ইশারা করিয়াই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের পূজারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।" তেমনি, যারা লেবাসের দাস, প্রবৃত্তির দাস, কিছু পাইলে খুশী হয় এবং না পাইলে ক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এই শ্রেণীর লোকও নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনামূলক নিরীক্ষা করার পর আখেরাতকেই দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। কুরআন শরীফের এই আয়াত তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে যে, "নিঃসন্দেহে আখেরাতই উত্তম এবং চিরস্থায়ী।"[২৪৪]

তাহাদের প্রজ্ঞা এবং অনুধাবন শক্তি এই সিদ্ধান্তই প্রদান করিয়াছে যে, চিরঅক্ষয় অনন্ত জীবনে ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই তাহারা দুনিয়ার জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আখেরাতকেই জীবন পথের লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া নিয়াছেন। আপাতত: মধুর দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আখেরাতের স্বার্থকেই তাঁহারা পরিতৃপ্তির উপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকেরা অবশ্য সর্বোচ্চ কল্যাণময় মাকাম তালাশ করিলেন না বটে, তবে দুনিয়ার মোকাবেলায় নিঃসন্দেহে উত্তম বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। সর্বোচ্চ স্তরের খাস লোকেরা যাঁহারা আহলে বছিরত বা অন্তরদর্শি সম্পন্ন বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের নিকট অবশ্য এই সত্য প্রকাশিত যে, দুনিয়ার মোকাবেলায় আখেরাতে যাহা লাভ হইবে, তাহাই পরম পাওয়া নয়। দুনিয়াতে যাহা কিছু আনন্দোপকরণ রহিয়াছে, এইগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের আনন্দোপকরণ স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুনিয়ার জীবনে মানুষ যেমন খানা-পিনা, ভোগ-সম্ভোগ ইত্যাদিকে আনন্দোপকরণ হিসাবে গণ্য করিয়া থাকে, তেমনি আখেরাতের জীবনেও খানা-পিনা, ভোগ-সম্ভোগ রহিয়াছে বলিয়া খবর দেওয়া হইয়াছে। ভোগ-সম্ভোগের এই সমস্ত স্থুল উপকরণ পশুসুলভ ভোগস্পৃহার সহিত সাদৃশ্য বিহীন নয়। কিন্তু এই সমস্ত স্থুল আনন্দোপকরণের তুলনায় দুনিয়া-আখেরাতের স্রষ্টা মহান সত্তার একান্ত সান্নিধ্য এই সবকিছু হইতেও বহু উর্ধ্বের চরম ও পরম পাওয়া একান্তভাবে সেখানে গিয়াই সমাপ্ত হয়। আল্লাহ

২৪৪. আল-কুরআন, ৮৭;১৭

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোত্তম ও অবিনশ্বর।" এই মহাবাণীর নিগুঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াই তাহারা, "জান্নাতের অধিবাসিগণ সেইদিন ভোগ আনন্দে মত্ত থাকিবেন"[২৪৫] এই পর্যায় হইতে আরও উর্ধ্ব-'মোত্তাকীগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর বাদশাহর সন্নিকটবর্তী সেদ-এর মাকামে অবস্থান করিবেন'[২৪৬] সেই চরম ও পরম স্তরকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। শুধু তাই নয়, বরং তঁহাদের সম্মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর হাকীকত পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তাহারা জানিতে পারে যে, যে লোক যে জিনিসের খেয়ালে মত্ত হইয়া যায়, সে সেই বস্তুরই গোলাম-বান্দায় পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সেই বস্তুই তাহার পরম আকাংখিত মাবুদে রূপান্তরিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই বিষয়টির প্রতি ইশারা করিয়াই সম্পদের পূজারীগণকে "দেরহামের বান্দা" হিসাবে। অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত লোকের শেষ লক্ষ্য আল্লাহ রাম্বুল আলামীনের পরম সত্তা নয়, তাহাদের ঈমান পরিপূর্ণ হইতে পারে না। এইরূপ ঈমান পরোক্ষ শেরেকী হইতে মুক্ত নয়।

এই সমস্ত লোক জীবনের সবকিছুকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটিকে অপরটির মোকাবেলায় দাঁড় করাইয়া থাকেন। এর একভাগে আল্লাহ এবং অন্যভাগে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু। অতঃপর দুইটি দিককে পাল্লার দুইদিকে রাখিয়া অন্তরকে সেই পাল্লার কাটায় পরিণত করেন। অন্তর যখন উত্তম দিকের প্রতি ঝুঁকিতে দেখেন তখন তাহারা উহাকে নেকীর পাল্লা ভারী বলিয়া অভিহিত করেন। অপরদিকে পাল্লা অন্যদিকে ভারী হইতে দেখিলে বলিয়া ফেলেন যে, বদীর পাল্লা ভারী হইয়া গিয়াছে। তাহারা অনুভব করেন যে, এই দুনিয়ায় তাঁহাদের সেই পাল্লার ভারসাম্যের সঙ্গেই কেয়ামতের ওজন নির্ভর করিবে । নেকী এবং বদীর পাল্লার ভারসাম্য যদি এই দুনিয়াতে রক্ষিত না হয়, তবে আখেরাতেও তাহা রক্ষিত হইবে না। সুতরাং দ্বিতীয় স্তরের লোকদের দৃষ্টিতে প্রথম স্তরের লোকেরা যেমন আনাড়ী অজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হয়, তেমনি তৃতীয় স্তরের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা অজ্ঞ আনাড়ী হিসাবে বিবেচিত হইবেন। আনাড়ীরা কখনও খাছ লোকদের কথা বুঝেনা। এই কথাও বুঝিতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি অনাবিল মনোযোগ কাহাকে বলে? উজিরে আজম (আল্লাহ তাঁহার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন) আমাকে যখন অনুন্নত একটি স্থান হইতে উন্নততর স্থানে চলিয়া আসার দাওয়াত দিতেছেন, তখন আমিও তাঁহাকে "আছফালে ছাফেলীন" বা সর্ব নিকৃষ্ট স্তর হইতে "আ'লা ইল্লিয়্যিনে" বা সর্বোচ্চস্তরে পৌছার দাওয়াত দিতেছি। কেননা, আছফালে ছাফেলীন পূর্বোল্লেখিত প্রথম স্তরের লোকদের স্থান এবং "আ'লা ইল্লিয়্যিন" তৃতীয় স্তরের লোকদের।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করিবে, তুমি তাহার উত্তম বদলা দাও।" আমি যেহেতু আপনার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে অপারগ, তাই আপনাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পথে দাওয়াত পেশ করিতেছি, যেন আপনি খুব শীঘ্র সাধারণ মানুষের পর্যায় হইতে উন্নীত হইয়া খাস লোকদের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন।আল্লাহর দৃষ্টিতে তুস বাগদাদ কোন বস্তুই নয়, সমগ্র দুনিয়ার পথই বরাবর। তাঁহার নিকট কাছে বা দূরের কোন পার্থক্য নাই। আপনার জানিয়া রাখা উচিত যে, আপনার দ্বারা যদি শরীয়তের কোন একটি ফরয আদায় হওয়ার ব্যাপারেও কোন ত্রুটি থাকিয়া যায় অথবা কোন একটি কবীরা গোনাহও হইয়া যায়, কিংবা একটি রাত্রিও আপনি গাফেলের নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন অথবা একটি

২৪৫. আল-কুরআন, ৩৬:৫৫
২৪৬. আল-কুরআন, ৫৪:৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মজলুম বিপদগ্রস্ত লোকের পূর্ণ খবরগিরীর দায়িত্বও পালন করার ব্যাপারে আপনার দিক হইতে কোন ত্রুটি হইয়া যায়, তবে আপনার স্থান গোমরাহীর গভীর খাদ ব্যতীত অন্য কোথাও হইবে না। আপনি তখন সর্বোচ্চস্তরের গাফেলদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন। যাহারা এই দুনিয়ায় আত্মভোলা গাফেলদের জীবন-যাপন করিবে, আখেরাতের জীবনে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে গাফলতের নিদ্রা হইতে সজাগ করিয়া দেন, যেন সবকিছু হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার আগেই আপনি ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। এখন আমি বাগদাদের মাদরাসায় ফিরিয়া আসার প্রসঙ্গে কিছু বলিতে চাই এবং এই ব্যাপারে আমার ওজর পেশ করিতেছি। আমার ওজর হইতেছে, রাজধানীতে ফিরিয়া আসার উদ্দেশ্য হয় দ্বীনি জীবনের উন্নতি, অন্যথায় দুনিয়ার জীবনের আয়-উন্নতির আকাংখা। কিন্তু দুনিয়ার জীবনের উন্নতি এবং সম্পদ ও পদমর্যাদার আকাংখা আল্লাহর অনুগ্রহে অনেক আগেই অন্তর হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অন্তরকে পুনরায় দুনিয়ার স্বার্থ ও পদমর্যাদার মোহে নিয়োগ করা দ্বিগুণ মুছিবত ডাকিয়া আনারই নামান্তর হইবে। কেননা, বর্তমানে আমি যে কাজে লিপ্ত আছি, কোন পদমর্যাদার ঝামেলায় পতিত হইলে সেই কাজ অসমাপ্ত এবং সমস্ত সাধনা বেকার হইয়া যাইবে।[২৪৭]

অবশ্য দ্বীনি উন্নতি এবং এলেমের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে এখান হইতে বাগদাদ চলিয়া আসাই আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। কারণ, শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষার্থী সেখানে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী রহিয়াছে। কিন্তু আমার পক্ষে দ্বীনি জীবনের এই উন্নতির পথেও অনেক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উভয় প্রকারেরই। বাগদাদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করিলে এখানে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করা সম্ভব হইবে না। কেননা, বর্তমানে এখানে অনুমান দেড়শত অত্যন্ত যোগ্য এবং নিবেদিত প্রাণ শিক্ষার্থী আমার শিক্ষাধীনে রহিয়াছে। ইহাদের পক্ষে বাগদাদ স্থানান্তরিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইবে। অন্যস্থানে শিক্ষার্থী বেশী পাওয়ার আশায় এই সমস্ত লোককে নিরাশ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে যদি দশটি এতিম শিশু লালিত-পালিত হইতে থাকে, তবে এই অবস্থায় অন্য স্থানের বিশটি এতিম পাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় এই দশটিকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়ার মতই হইবে আমার এই পদক্ষেপ।[২৪৮]

দ্বিতীয়ত:

যখন মরহুম উজির নেজামুল মুলকের আহ্বানে আমি বাগদাদের মাদরাসায় যোগ দিয়াছিলাম, তখন আমার পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ছিল না। বর্তমানে আমি পরিবার-পরিজনের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত নয়, ইহাদিগকে মনে কষ্ট দিয়া ফেলিয়া যাওয়াও জায়েয হইবে না।

তৃতীয়ত: আজ হইতে প্রায় পনের বৎসর পূর্বে আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র মাজারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই পবিত্র স্থানে বসিয়া আমি-তিনটি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যা আজ পর্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছি। অঙ্গীকারগুলি হইতেছে,

এক. কোন বাদশাহর দরবারে যাইব না,

দুই .কোন বাদশাহর মাল ভোগ করিব না,

---

২৪৭. প্রাগুক্ত

২৪৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তিন. কখনও বহস-মুনাযারা করিব না।

এখন যদি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে যাই তবে মনমস্তিষ্ক আহত হইয়া যাইবে। এই আহত মানসিকতায় কোন দ্বীনি কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেওয়া সম্ভব হইবে না। বাগদাদে বহস-মুনাযারা ব্যতীত টিকিয়া থাকার উপায় নাই। তাহা ছাড়া সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে খলিফার দরবারে হাজির হইতে হইবে- যা আমি কোন অবস্থাতেই পছন্দ করি না। ইরাক ও শাম হইতে ফিরিয়া আসার পর আমি আর কোন সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে খলিফার দরবারে যাই নাই। সবচাইতে বড় ওজর হইতেছে, আমি কোন বেতন বা ভাতা কবুল করিতে পারিব না। বাগদাদে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তিও নাই। আয়-আমদানীর অন্যসব পন্থা আমি বহু আগেই নিজ হাতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। তুসে আমার যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহাতে পরিবার-পরিজনদের মোটামুটি ভরণ-পোষণ হইয়া যায়। আমার অনুপস্থিতিতে এই যৎসামান্য সম্পত্তিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতেছে বাগদাদ আসার পথে আমার সম্মুখে দ্বীনি অন্তরায়। অন্যেরা হয়ত এইসব বিষয়কে নিতান্ত মামূলী মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে কারণগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনসূর্যও যেহেতু বর্তমানে অপরাহ্নের আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে, বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং এই সময় ইরাক সফরের নয়। সে মতে জনাবের বরাবরে এইরূপ আশা করিব, যেন উপরোক্ত ওজরসমূহ কবুল করিয়া নেওয়া হয়। মনে করুন, গাজালি এক পথে বাগদাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অন্যপথে যদি আল্লাহর ফরমান আসিয়া হাজির হয় তবে তো নিরুপায় হইয়া আপনাদিগকে অন্য শিক্ষক তালাশ করিতে হইবে। সুতরাং এইরূপ সম্ভাবনার কথা মানিয়া নিয়াই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করি। আল্লাহ পাক উজিরে আজমকে ঈমানের হাকীকত দ্বারা উদ্ভাসিত করুন, যেন দুনিয়া এই ঈমানের রওশনীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।[২৪৯]

উজির সেহাবুল ইসলামকে লিখিত ইমাম সাহেবের পত্রাবলী

(উজির সেহাবুল ইসলামকে ইমাম গাজালি যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন সেইগুলিতে আত্মার রোগ এবং তাহার চিকিৎসা, আত্মা যে সমস্ত কারণে ব্যাধিগ্রস্ত হয় সেইসব কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকার উপদেশ এবং সাধক শ্রেণীর লোককে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, বিশেষতঃ সাধক আল্লাহ ওয়ালাগণের সহিত গভীর সম্পর্ক গড়িয়া তোলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে)

প্রথম পত্র :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার ওজারতের দরবার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণে ভরপুর হউক। কালের কুটিল প্রবাহ, ক্ষতিকারক সকল প্রভাব এবং শয়তানের মকর-ফেরেব হইতে আপনার অন্তর নিরাপদ হউক। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "সদকা-খয়রাত তোমাদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ। সাধারণ মানুষের ধারণায় এই হাদীস দ্বারা শারীরিক রোগ-ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু খাস লোকেরা হাদীসের আসল ইশারা অন্তরের রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শারীরিক ব্যাধি এবং আত্মার রোগের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। অন্তরের রোগ যেমন জটিল তেমনি ব্যাপকও। কেননা, হাজার মানুষের মধ্যে একজন শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। আর হাজার জনের মধ্যে একটি অন্তরও ব্যাধিমুক্ত দেখা যায় না। এই রোগের আক্রমণ হইতে শুধুমাত্র সেই সব লোকই

২৪৯. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপদ হইতে পারে, যাহাদিগকে আল্লাহ পাক শুদ্ধ অন্তর দান করিয়াছেন। শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকদের মধ্যে যেমন বিশেষ বিশেষ খাদ্য বা পানীয়ের। প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, তেমনি আত্মার ব্যাধির আলামত হইতেছে, আত্মার প্রিয় খাদ্য হইতে বিতৃষ্ণা ও অনীহার সৃষ্টি। আত্মার সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতেছে আল্লাহ রাব্বল আলামীনের যিকির। উপযুক্ত খাদ্য ব্যতীত যেমন শরীর টিকে না, তেমনি আত্মাও তার প্রয়োজনের অনুকূল খাদ্য না পাইলে সুস্থ এবং সতেজ থাকিতে পারে না। এই সত্যের প্রতি ইশারা করিয়াই বলা হইয়াছে, "অবগত হও। আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তরের পূর্ণ স্বস্তি লাভ হইয়া থাকে।"। আল্লহর যিকির ব্যতীত যেসব লোক জীবন-যাপন করিতেছে, উহাদের অন্তর মৃত। বলা হইয়াছে, "কুরআনের মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহাদের অন্তর রহিয়াছে। আত্মার হাকীকত সম্পর্কে সকলে জ্ঞাত থাকে না। অন্যথায় তাহার পুষ্টিকর খাদ্য এবং ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্যে তাহারা তফাত করিতে সমর্থ হইত। বলা হইয়াছে, আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং তাহার অন্তরের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন।রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা মৃত লোকদের মজলিসে বসিও না। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাঃ) ঐ সমস্ত লোক কাহারা?জবাব দিলেন, "ধনবান সম্প্রদায়।" ধনের মালিকেরাই কিন্তু প্রকৃত ধনী নয়। প্রকৃত সম্পদশালী ঐ সমস্ত লোক যাহাদের অন্তর ঐশ্বর্যময়। এই সমস্ত লোক নিজেরাই অন্তরের রোগের চিকিৎসা করিতে পারেন।মাল সদকা দিয়া রোগের চিকিৎসা করার অর্থ এখানে শুধু সম্পদ ব্যয় করা নয়। আত্মার রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এমন একজন দক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি অন্তর-রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং নিজে রোগাক্রান্ত নহেন। এই যুগেও সৌভাগ্যবশতঃ এই ধরনের দক্ষ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[২৫০]

অন্ত-লোকের বিভিন্ন মাকামাতের মধ্যে তওহীদের দরজা, সবার মৌলিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই দরজা হাসিল হয় না। মারেফাত এবং ঐকান্তিক আগ্রহ বা জযবা এর মাধ্যমেই তাহা হাসিল হইতে পারে। যে কোন একজন আরেফ মজযুবকে দেখিয়াই এই সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। আৱেফ তিনিই, যাহার মারেফাত, তাকওয়া ও যুহদের নূর কখনও নির্বাপিত হয় না। সেই অনির্বাণ শিখা সদাজাগ্রত রাখিয়াই তিনি সর্বদা পথ চলেন।[২৫১]

এই ধরণের একজন যাহেদ আরেফকে আপনার নিকট পাঠনো হইল। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া তিনি সম্প্রতি এখানে আগমন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাহার কোন কোন প্রিয় বান্দার উপর কঠিন দারিদ্রের বোঝা চাপানোর পিছনেও একটি সূক্ষ্ম রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সমস্ত দারিদ্রগ্রস্ত মহান ব্যক্তিগণের খেদমত করার সুযোগ লাভ করিয়া সম্পদশালী এবং তৎসঙ্গে সৌভাগ্যবান বান্দাগণ এই উসীলায় পরম সৌভাগ্যের মনজিলে পৌঁছিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের পথ-পরিক্রম সহজতর হয়।আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত আছেন। তিনি কখনও কখনও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে মুখাপেক্ষিতার আগুনে জ্বালাইতে থাকেন। এই প্রক্রিয়াতেই তাহাদিগকে সর্ব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির পংক হইতে পরিচ্ছন্ন করিয়া নেন। এমন কোন দারিদ্রগ্রস্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দার খেদমত করার মত সুযোগ যদি কোন ধনবান ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে, তবে তাহাকে চরম সৌভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

২৫০. মুহিউদ্দীন খান: *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭
২৫১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জনাবের প্রতি আবেদন, এই আল্লাহর বান্দার অসুবিধা দূর করার জন্য সচেষ্ট হউন। বিশেষতঃ একান্তে বসিয়া ইহার মূল্যবান কথাবার্তা শ্রবণ করিবেন। আশা করা যায়, ইহার উপদেশাবলী আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং সৌভাগ্যসূচক হইবে।

দ্বিতীয় পত্র ঃ

(শায়খ আবু বকর আবদুল্লাহর নির্দেশক্রমে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি জনৈক বয়োঃবৃদ্ধ আলেমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার জন্য উজির শেহাবুল ইসলামের নামে এই পত্রটি প্রেরণ করিয়াছিলেন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিপূর্ণ নেয়ামত ভাণ্ডার দান করুন এবং শাসন। কর্তৃত্বের ছায়া সর্বদা আপনার উপর কায়েম থাকুক। আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত নেয়ামতরাশির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নেয়ামতের হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার তওফীক হউক। পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করার অর্থ হইতেছে, এই দুনিয়ার সকল সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়ার পর আখেরাতের জীবনেও সকল বাদশাহর বাদশাহ মহান আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে মর্যাদার আসন লাভ হওয়া। যদি এই উভয়বিধ নেয়ামত দ্বারা মণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য হাসেল হয়, তবে উহাই হইবে চরম সৌভাগ্য, নেয়ামতের পরিপূর্ণতা লাভের লক্ষণ। বান্দার ভাগ্যে দুই ধরনের মাকাম লাভ হইয়া থাকে। একটি মাকামে সেদক এবং অন্যটি মাকামে যুর। যাহারা সব কাজে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সকল আকাংখা নিবেদন করিয়া তৃপ্ত, তাহারা মাকামে সেদকে অবস্থান করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গী এবং বন্ধুতে পরিণত হই, যে আমাকে একান্তভাবে স্মরণ করে।"[২৫২]

অপর পক্ষে, যে মহামহিম আল্লাহর নিদের্শাবলী হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্যকিছু তালাশ করে, আমি তাহার পিছনে একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া রাখি, সেই শয়তানই তাহার সঙ্গী বন্ধুরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। একমাত্র আল্লাহকেই যাহারা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "তোমরা যখন সেখানে দৃষ্টিপাত করিবে তখন অফুরন্ত নেয়ামতরাশি এবং বিশাল রাজ্য দেখিতে পাইবে। আর যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন শক্তিকে সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে, তাহাদের নজির হইতেছে মরুভূমির মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়, সচরাচর যাহা পানি বলিয়া ভ্রম হয়, নিকটে আসিলে আর কিছুই দেখা যায় না। জীবন তাহাদের সেই মরুভূমিসম প্রতিপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর সান্নিধ্য ব্যতীত আর তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না, যে আল্লাহ সর্বকর্মের হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দক্ষ দ্রুতগতি সম্পন্ন।[২৫৩]

উন্নত রুচিসম্পন্ন সৎসাহসী লোকদের পক্ষে মহত্বের বস্তু ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্টকে গ্রহণ করা সাজে না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ সম্পর্কে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে হাজার টাকা মূল্যের মোলায়েম পোশাকও তাঁহার নিকট অমসৃণ বলিয়া মনে হইত! আর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পাঁচ টাকা মূল্যের পোশাকও তাঁহার কাছে বেশী মোলায়েম বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ রুচি পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তিনি জবাব দিয়াছিলেন, "প্রথম হইতেই আমার রুচি এত উন্নত ছিল যে, সর্বোত্তম বস্তু হাতে পাইয়াও নাফছ তৃপ্ত হইত না। দুনিয়ার জীবনে চাওয়া-পাওয়ার শেষস্তর বিশাল খেলাফতের স্বাদ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া নাফছের

২৫২. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.২৮
২৫৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সেই অতৃপ্ত কামনা কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারও উপরের দরজা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়াই উন্নততর রুচির শেষস্তর বলিয়া আমার মনে হইতেছে।[২৫৪]

আপনাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই এখন আরও বড়, মানবীয় সৌভাগ্যের চরমতর স্তরের প্রতি অগ্রসর হওয়াই আপনার পক্ষে সমীচীন হইবে। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুনিয়ার জীবনের চরম সৌভাগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করার অধিকারী হওয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মহান দাতা, অপরিসীম করুণাময়। আজকের এই পত্র লেখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে, একজন বৃদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা। দীর্ঘকাল তিনি মহান সাধক সমাজের সঙ্গে থাকিয়া একাধারে এলেমের খেদমত এবং সাধক জীবন-যাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া কর্মশক্তিহীন দুর্বল হইয়া পড়ার কারণে পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমান যুগশ্রেষ্ঠ সূফী-সাধক শায়খ আবু বকর আবদুল্লাহ আমাদের অনেককেই উপরোক্ত বৃদ্ধ বুযুর্গের নিকট হাজির হইয়া উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এতদসঙ্গে বর্তমানে রুজী-রোজগার করিতে অক্ষম এই বুযুর্গ সম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমার প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন । মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করিয়া মুনাজাত করি, আল্লাহ পাক যেন আপনার দৃষ্টিতে দুনিয়াকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া উর্ধ্ব জগতের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার তওফীক দান করেন। আপনার অন্তরদৃষ্টি যেন প্রসারিত করিয়া দেন! আপনার প্রতি সালাম।

তৃতীয় পত্র :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার সৌভাগ্যরবি চির অম্লান হউক। রাজকীয় মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী হউক। দুশমনের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া আপনার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। শয়তানী ধোকা এবং দুশমনের হিংসার আগুন হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সহি-সালামতে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ চির অক্ষয় হউক। দীর্ঘ সফরের তকলিফ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরিবার-পরিজনের মধ্যে সহী-সালামতে ফেরৎ আসা এবং পুনরায় সরকারী গুরুদায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়ার এই আনন্দঘন সময়টিতে আমার পক্ষ হইতে আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এই গুলির কুপ্রভাব হইতে আল্লাহপাক আপনাকে মুক্ত রাখুন। নেককারগণের আন্তরিক দোয়ার বরকতে এই পর্যন্ত আপনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরম সাফল্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ভবিষ্যতেও আপনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর খাস ও মদদ পাইতে থাকিবেন। আমার একান্ত আকাংখা, আপনি এমন এক উচ্চ মর্যাদায় গিয়া পৌঁছিয়া যান, সেখানে দুনিয়াদারীর কোন বিপর্যয়ই আপনাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই পর্যায়ে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন দুনিয়ার হিংসা-দ্বেষ এবং অর্থহীন আকাংখার পিছনে জীবনপাত করার মনোভঙ্গি হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি। সুতরাং আপনিও দুনিয়াদারীর সকল আবিলতা হইতে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া একান্তভাবে এবাদত-বন্দেগির মধ্যে মশগুল হইতে চেষ্টা করুন। এলেমের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। আমার ধারণায় এলেমের প্রসারের চাইতে উত্তম এবাদত আর কিছু হইতে পারে না।[২৫৫]

অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর স্থির করিয়া রাখুন। আপনি বলুন, একমাত্র আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতেছ, তাহা হইতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

২৫৪. প্রাগুক্ত

২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

বহুগুণে শ্রেয়।[২৫৬] এতদিন মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতি আপনি নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন। এর কী পরিণতি তা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুরআন শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে, "আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহারা অন্য কাহাকেও বন্ধু অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, তাহার মিসাল হইল, মাকড়সার জালে ঘর বাধার মত। অথচ সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঘর হইতেছে মাকড়সার বাসস্থান। হায়; এই সত্যটুকু যদি উহারা অনুভব করিতে পারিত! একমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর ভরসা করিতে পারিলে দেখিতেন, সমগ্র সৃষ্টি অনুগত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি পর্যন্ত আপনার সর্বকর্মে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইতেছে। অপর পক্ষে যে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ভরসা করিলে পর, তাহা এমন একটি অসার ইমারতে পরিণত হইবে, যে ইমারতের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে সমুদ্রের ঢেউ-এর উপর। কেননা বর্তমান যুগ নানা ফেতনা-ফাসাদের যুগ। অস্থিরচিত্ততা এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্বে মানুষের অন্তরে যেমন স্থিরতা ছিল, বর্তমানে তা খুবই বিরল। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সৃষ্টির প্রতি ভরসার বিড়ম্বনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া আল্লাহর উপর পূর্ণমাত্রায় ভরসা করার তওফীক দান করুন। তওফীক একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ এবং বিশেষ দানের উপরই নির্ভরশীল!

উজির মুজিরুদ্দীনকে লিখিত পত্রাবলী

প্রথম পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাকে আল্লাহপাক যা কিছু দান করিয়াছেন, তদ্বারা আখেরাতের উত্তম আবাসের আকাংখী হও। এতদসঙ্গে দুনিয়ার জীবনে তোমার যাহা পাওনা, তাহার কথাও ভুলিয়া যাইও না। তোমার প্রতি আল্লাহ পাক যেমনভাবে এহসান করিয়াছেন, তুমিও তেমনভাবেই আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি এহসান কর।"[২৫৭] মাননীয় উজির মুজিরুদ্দীন! আপনার পক্ষে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত কালামের প্রতি গভীর চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কেননা, আল্লাহর প্রত্যেকটি কালামই এক একটি সমুদ্রবিশেষ এবং এই সমুদ্রে অসংখ্য মহামূল্যবান মণিমুক্তা লুকায়িত রহিয়াছে। দ্বীনি-বছিরত বা অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমেই সেই সমূদ্রে ডুব দিয়া মুক্তা আহরণ করা সম্ভব। দুনিয়ার ধ্বংসশীল এই যৎসামান্য নেয়ামতের মধ্যেই যাহাদের দৃষ্টি ডুবিয়া গিয়াছে, অথবা যাহারা ক্ষণস্থায়ী হিসাবে গ্রহণ করিয়া সম্ভোগকেই জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা আল্লাহ তাআলার উপরোক্ত কালামের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন– "যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার জীবন এবং তাহার সাজ-সজ্জার প্রতিই একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, তাহাদের সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল এই দুনিয়ার জীবনেই পরিপূর্ণভাবে চুকাইয়া দেওয়া হইবে। দুনিয়ার জীবনে তাহাদিগকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। উহারা ঐ সমস্ত লোক, আখেরাতের জীবনে জাহান্নাম ব্যতীত যাহাদের আর কোন প্রতিদান থাকিবে না। তাহারা দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করিবে, সবই মিসমার করিয়া দেওয়া হইবে।" অপর পক্ষে যাহারা সম্পদ সঞ্চয় এবং দুনিয়ার জীবনের প্রাচুর্য সংগ্রহের মধ্যেই সর্বক্ষণ লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষেও- "দুনিয়ার জীবনে তোমার হিস্যার কথা ভুলিও না।" এই আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব হইবে না। কেননা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই হিস্যার বন্টন সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন। সম্পদের মধ্যে তোমাদের হিস্যা শুধুমাত্র ঐটুকুই, যেটুকু ব্যয় করিলে, সেইটুকুই সঞ্চিত হইয়া রহিল।

২৫৬. আল-কুরআন, ১০;৫৮
২৫৭. আল-কুরআন, ২৮;৭৭

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া অন্য যেকোন কিছুতেই নিবদ্ধ হউক না কেন, তাহা যদি জান্নাতুল ফেরদাউসও হয় এবং সেই বস্তুকেই যদি সে তার জীবন-সাধনার লক্ষ্যস্থল হিসাবে স্থির করিয়া নেয়, তবে তাহার অন্তর এবং আল্লাহ তাআলা যেমনভাবে তোমার প্রতি এহসান করিয়াছেন তুমিও তেমনিভাবে তাহার বান্দাদের প্রতি এহসান করুন এই আয়াতের মর্মার্থ পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইবে না।

রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সম্মুখে এহসান শব্দের ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন,হযরত জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,- এহসান কী? জবাব দিলেন, "এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ।" যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহরাশি বর্ষণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহার উপর সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। শুকরিয়ার তরিকা হইতেছে, সর্বপ্রথম নেয়ামতদাতা আল্লাহর শান' সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার চেষ্টা করা। দুনিয়ার জীবনে যৎসামান্য যে নেয়ামতটুকু হাসিল হইয়াছে তাহার উপরে আরও যে অফুরন্ত নেয়ামত রহিয়াছে, যেগুলি অর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, সেইগুলি অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, এই সম্পদে পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া না থাকা। যে ব্যক্তির মধ্যে মহত্তর নেয়ামতরাশি হাসিল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহার অন্তরে সেই নেয়ামতের পরিচয় ক্রমে ক্রমে গভীরতর হইবে এবং সেই পথে মেহনত করার আগ্রহও বর্ধিত হইতে থাকিবে । ইহাই হইতেছে শুকুরের হাকীকত এবং এই সম্পর্কে ইশারা করিতে গিয়াই কুরআন পাকে বলা হইয়াছে যে, "যদি শুকুর আদায় কর, তবে নেয়ামত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"[২৫৮] হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শুকুর আদায় করার এই প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ভোগ-বিলাসের আধিক্য এবং প্রাপ্তির পর যুহদের জিন্দেগী গ্রহণ করিয়াও অস্থির থাকার মধ্যে যে মানসিক বিপ্লব লক্ষ্যণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রকৃত শুকুর আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার নেয়ামতরাশির শুকুর সেই ব্যক্তিই পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারে, যে দুনিয়াকে ঐ সমস্ত লোকের মাধ্যমে চিনিতে পারিয়াছে, যাহাদের এই দুনিয়ার জীবনে কোন পদমর্যাদা নাই, কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিও নাই; কিন্তু জীবন-দৃষ্টি তাহাদের এত উচ্চ যে, সবকিছু হইতেই তাহারা বেপরওয়া। যাহাদের অনেক কিছু আছে, তাহাদের ধারে কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তাহারা কখনও অনুভব করে না। দুনিয়ার সম্পদের প্রতি, পদমর্যাদার প্রতি কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি কোন লোভও তাহাদের অন্তরে ছায়াপাত করিতে পারে না। দুনিয়াদারদের মোকাবেলায় তাহারা অফুরন্ত প্রভাব রাখে, আত্মমর্যাদা তাহাদের আকাশচুম্বি। দুনিয়ার সবকিছু হইতে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাহাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর হইতেছে–

ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা দুনিয়ার ঝামেলা, দুনিয়াদারদের নীচতা, দুনিয়ার জীবনের অসারতা এবং অস্থায়ী জীবনের মোহে আবদ্ধ হওয়ার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন। ত্যাগীগণের মধ্যে এই সমস্ত লোক সর্বনিম্ন স্তরের বলিয়া বিবেচিত। তবে গাফেল দুনিয়াপুরস্তদের তুলনায় এই স্তর অনেক উন্নত।

২৫৮. আল-কুরআন, ১৪;০৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় স্তর হইতেছে–

ঐ সমস্ত লোকের, যাহাদের অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ার পর তাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। এখানকার ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যদি সকল ঝঞ্জাট হইতে মুক্ত ও পবিত্র হইত, তথাপি আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় দুনিয়ার উপর তৃপ্ত হওয়া উৎকৃষ্টতর বস্তুর মোকাবেলায় নিকৃষ্টতর বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করারই নামান্তর। এই ধরনের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের সম্মুখে আল্লাহর কালাম "এবং নিশ্চয় আখেরাতই উত্তম ও স্থায়ী।"[২৫৯] পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে যে, যদি অস্থায়ী এই দুনিয়া স্বর্ণনির্মিত হইত আর আখেরাত হইত নিছক মাটির টিবি-তথাপি অস্থায়ী এই দুনিয়া চিরস্থায়ী আখেরাতের তুলনায় গ্রহণযোগ্য হইত না। বুদ্ধিমান মাত্রই ক্ষণস্থায়ী মহামূল্যবান বস্তুর মোকাবেলায় চিরস্থায়ী স্বল্পমূল্যের বস্তুকেই বেশীমূল্য দান করিবেন। কিন্তু আসলে যেহেতু দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন এবং আখেরাত চিরস্থায়ী এবং অমূল্য, তখন কোন বুদ্ধিমানের পক্ষেই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য অমূল্য আখেরাতকে বরবাদ করার প্রশ্নই আসিতে পারে না।

তৃতীয় স্তর হইতেছে –

ঐ সমস্ত লোকেরা, যাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইয়া দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় হইতেই মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। "আল্লাহ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।[২৬০] "এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সেই পরম সত্তার তালাশেই সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন। সেই মহাপরাক্রমশালী পরম আকাংখিত সত্তার সন্তুষ্টির স্তরে অবস্থান করার মাহাত্ম তাহাদের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবন- সাধনার সেই চরম ও পরম পাওয়ার স্তর সম্পর্কে বাস্তবভাবে ওয়াকেফহাল হওয়ার পর তাহাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, জান্নাতের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে নাফছের পরিতৃপ্তি এবং ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার সামান সম্পর্কেও খবর দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভোগ-বিলাস, খানা-পিনা, আমোদ- আহলাদ প্রভৃতি এমনসব বিষয়ও সেখানে রহিয়াছে, যে সবে চতুষ্পদ জন্তুর পক্ষেও আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং ভোগ-বিলাসে পূর্ণ জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এক ধরনের জান্তব অনুভূতি ভিন্ন আর কিছু নহে। তাই এই শেণীর লোকেরা জান্তব নীচতার স্তর হইতে উত্তরিত হইয়া ফেরেশতাদের দুনিয়ায় পা রাখিয়া অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছেন। ইহাদের বিদগ্ধ আত্মা সেই পরম সত্তার একান্ত সান্নিধ্য সেজদা ও তসবীহর মধ্যেই পরম তৃপ্তির সন্ধান পাইবেন। এই স্তরই মানবরূপী কাফেলার শেষ মনজিল, "তোমার রবের সান্নিধ্যই মনজিলের শেষ"।[২৬১] এই আয়াতের মর্মার্থ। সেই পরম পাওয়া, মনজিলের পানে অবিরাম চলার সাধনা, যে চলার কোন শেষ নাই, যে আকাংখার কোন তুলনা নাই, সেই সাধনার আড়ালে এমন সব রহস্যাবলী লুকায়িত রহিয়াছে, যা বর্ণনা করার অনুমতি যবান বা কলম কাহারো নাই। মাননীয় উজির মুজিরুদ্দীনকে আল্লাহ পাক এমন তওফীক দান করুন, যেন তিনি পরিপূর্ণতার সেই স্তরে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত পরিতৃপ্ত না হন।[২৬২]

উপরোক্ত কথা কয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখার মত তওফীক হওয়ার জন্যও আমি দোয়া করি। কেননা, এই পথের প্রতিটি স্তর এমন সব সূক্ষ্ম বিষয়ে ভরপুর, যা সাধারণভাবে উপলব্ধি করার মত আলেমই খুঁজিয়া

২৫৯. আল-কুরআন, ৮৭;১৭
২৬০. আল-কুরআন, ২০;৭৩
২৬১. আল-কুরআন, ৫৩;৪২
২৬২. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া কঠিন। সুতরাং এই বিষয়ের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছার মত জ্ঞানীলোক কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জনাবের সঙ্গে বাগদাদে সাক্ষাত লাভ করার পর হইতে আমি শাম, হেজায, ইরাক প্রভৃতি এলাকা সফর করিয়াছি। সর্বত্রই আপনার অপরিসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ হইতে দোয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে আমি সবকিছু ছাড়িয়া একান্ত নিরিবিলির জীবন বাছিয়া নিয়াছি। সুলতানগণের দরবারে হাজিরা দেওয়া এবং পত্র যোগাযোগ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার যবান ও কলম এই ব্যাপারে কঠিন সংযম পালন করিয়া আসিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে অভ্যাসের বিপরীতে আপনার নিকট এই পত্র প্রেরণের কারণ দুইটি।

প্রথমতঃ

আপনার ন্যায় সকর্মশীল মহপ্রাণ ব্যক্তির ওজারত পদে বরিত হওয়ার সংবাদে দেশবাসির অন্তরে যে আনন্দ-হিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ঢেউ লাগিয়া আমার কলমের সংযমের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনার সঙ্গে এই সময় সাক্ষাৎ করাই আমার পক্ষে সমীচীন ছিল, কিন্তু কৃজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের আদর্শ নষ্ট হওয়ার ভয়ে পত্রের মাধ্যমেই কর্তব্য সমাধা করিতে হইল।

দ্বিতীয়তঃ

বর্তমানে এই এলাকায় অনেকগুলি সমস্যা পুঞ্জিভূত হইয়া গিয়াছে। জনাবের ওজারত লাভ করার পর এই শহরের শাসকও বাগদাদ হাজির হইয়া মোবারকবাদ পেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই ব্যক্তির আনুগত্য, কর্মদক্ষতা এবং ঈমানদারী সম্পর্কে আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে, এই যুবা বয়সেই সে যেমন এবাদত ও তাকওয়া-পরহেজগারীতে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দ্বারা হুকুমত বা প্রজাসাধারণের কোন প্রকার অকল্যাণ হওয়ার আশংকা নাই, সেই জন্য শহরকে অরক্ষিত রাখিয়া বাগদাদ না যাওয়ার জন্য আমিই তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার সেই হাজিরা না দেওয়ার বিষয়টিকেই কদর্থ করিয়া কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লোক আপনার খেদমতে নানারূপ পত্র প্রেরণ করিতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সেই কারণে বোধহয় নতুন হুকুমতের তরফ হইতে আজ পর্যন্ত তুসের শাসনকর্তার নামে কোন ফরমান আসিয়া পৌঁছিতেছে না।

উজির মোহতারাম! আপনার সঙ্গে আমার পুরাতন সম্পর্ক এবং পারস্পরিক আস্থার উপর নির্ভর করিয়া আপনি এই ব্যক্তির নিয়োগপত্র নবায়ন করিয়া বিনাদ্বিধায় ফরমান পাঠাইতে পারেন। এই ব্যক্তি পূর্ববর্তী ওজারতের সময়ে এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সময় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। তাহার সততা, কর্মদক্ষতা এবং পারিবারিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করিয়া পূর্ববর্তী মহা উজির এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে এই দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। আপনিও আর দেরী না করিয়া ইহার নিয়োগের ফরমান প্রেরণ করুন। কেননা, দুদোল্যমান অবস্থার কারণে বর্তমান শাসনকার্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।[২৬৩]

স্মরণ রাখিবেন, তুস এমন একটি শহর যেখানে দ্বীনদার দরবেশ, যাহেদ শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করিয়া থাকেন। ইহাদের নেক দোয়া মজবুত দুর্গের সমতুল্য। বর্তমানে এখানকার শাসনকার্য পরিচালকগণের মধ্যে কিছু উচ্চাভিলাসী লোক নানা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা কাতর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে স্বার্থের টানাপোড়নে পড়িয়া সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িতেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র ফরমান জারী করিয়া এই খানকার আল্লাহওয়ালা সাধারণ মানুষের আন্তরিক দোয়া লাভ করিতে সচেষ্ট হউন।

২৬৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিলে ঝরণাধারার ন্যায় সকলের নেক দোয়া সর্বদা আপনাকে স্নাত করাইতে থাকিবে।আল্লাহ পাক মুসলমান প্রজাসাধাণের নেক দোয়া কবুল করুন। আমীন।

দ্বিতীয় পত্রঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ পাক বলেন, "সেই কঠিন দিন আসার আগেই তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের নির্দেশ মান্য কর; যেদিনটি আল্লাহর তরফ হইতে ফিরিবে না। সেই দিন তোমরা কোথাও আশ্রয় পাইবে না। আল্লাহর সেই নির্দেশ প্রতিহত করারও কোন উপায় থাকিবে না। যদি তাহারা অবাধ্যতা দেখায়, দেখাক। আপনাকে উহাদের রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করি নাই। আপনার দায়িত্ব পৌছাইয়া দেওয়া। যেদিন ফিরিবে না, সেই দিন হইতেছে মৃত্যুর দিন। সেইদিন আক্ষেপ-অনুশোচনা কোন কিছুই কোন কাজে আসিবে না। বলা হইয়াছে, "আমার আযাব যখন তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তখন আর কোন কিছুই তাহাদের কোন কাজে আসিবে।" বুদ্ধিমান তাহারাই, যাহারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া মৃত্যুর পর যে দুনিয়া আসিবে, সেই জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। অপরপক্ষে মূখ-নাদান ঐ সমস্ত লোক, যাহারা প্রবৃত্তির আনুগত্য করিয়া জীবনপাত করে। মকবুল হওয়ার আলামত হইতেছে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ হওয়া। সর্বদা সেই পথের সাধনায় লিপ্ত থাকার মত মানসিক প্রস্তুতি বজায় থাকা। ঐ সমস্ত লোক দুনিয়ার জীবনে ততটুকুই সংগ্রহ করিয়া তৃপ্ত হয়, যতটুকু সামান একজন ঘোড়সওয়ার যাত্রী সঙ্গে নিয়া পথ চলে। আখেরাতের পাথেয় হইতেছে, সর্বপ্রথম নিজের আত্মার ফরিয়াদ শ্রবণ করার শক্তি অর্জন করিয়া সেই ফরিয়াদের প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া। অতঃপর আল্লাহর বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করা এবং প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হওয়া। আজ আল্লাহর বান্দারা জালেমদের কবলে পর্যদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের ফরিয়াদ শ্রবণ করিয়া প্রতিকারার্থে অগ্রসর হইবে, ঊর্ধ্বজগতে তাহার উপাধি হইবে, মুজিরুদ্দৌলা বা রাষ্ট্রের আশ্রয় দাতা। প্রকৃতপক্ষে খেতাব-লকব ঊর্ধ্বজগতেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করিয়া তৎপ্রতি আমল করে এবং অন্যদিগকে সেই এলেম শিক্ষা দেয়, ঊর্ধ্বজগতে তাহার মর্যাদা হইবে অপরিসীম।[২৬৪] প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই তাহার অবস্থার অনুপাতে ঊর্ধ্বজগতে এক একটি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সেই নামই তাহার প্রকৃত নাম এবং তাহার অবস্থার সঠিক দর্পণ হিসাবে বিবেচিত হইবে। দুনিয়ার উপাধি নিতান্তই সাময়িক ও মূল্যহীন। । স্বীয় আত্মার ফরিয়াদ শ্রবণ করা ও তাহার প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়ার অর্থ প্রবৃত্তির হামলা যথাঃ লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি ঘৃণ্য প্রবণতা হইতে নিজের আত্মাকে হেফাজত করা।

জুলুম করিতে করিতে সেই জুলুম স্বীয় আত্মার উপরই হউক বা অপর লোকের উপরই হউক মানুষ শয়তানের লশকরে পরিণত হইয়া যায়। আর বিবেক-বুদ্ধিরূপ খোদায়ী লশকর সেই শয়তানী লশকরের হাতে বন্দী হইয়া যায়। সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শয়তানী ইচ্ছার খেদমত করিতে লাগিয়া পড়ে। প্রবৃত্তির আকাংখা পূরণ এবং ক্রোধ-কাম লোভের প্রেরণা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। যদি কেহ স্বীয় বিবেক- বুদ্ধিকে শয়তানী লশকরের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে, তবেই সে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহার রবুবিয়তের মাহাত্ম অনুধাবন করার যোগ্য হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ

২৬৪. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল: *মাজালিসে গায্যালী* (ঢাকা, রশীদ বুক হাউস), তা.বি. পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছেন, "শয়তান যদি বনী-আদমের অন্তরে স্থানলাভ না করিত, তবে তাহারা ঊর্ধ্ব জগতের সকল মাহাত্ম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইত। যদি কেহ উপরোক্ত অপশক্তিগুলির প্রভাব হইতে স্বীয় আত্মাকে মুক্ত করাইতে পারে তবে তাহার পক্ষেই কেবল এই সৌভাগ্য লাভের সুযোগ হইতে পারে।[২৬৫]

মাননীয় উজির! আপনার ব্যক্তিত্ব বর্তমান যুগে অনন্য। অন্যান্য আমীর-উমরাহ হইতে আপনার মর্যাদা স্বতন্ত্র। তাই সঙ্গতভাবেই আমি আশা করি যে, আপনি স্বীয় আত্মাকে সকল কু-প্রভাব হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে যত্নবান হইবেন। আমি যে কথাগুলি বর্ণনা করিলাম, তাহার মর্ম উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট প্রজ্ঞা আপনার রহিয়াছে। বলিয়া আমার বিশ্বাস। এতদসঙ্গে আশা করি, মৃত্যুর সেই সুনিশ্চিত প্রহরটি আসার পূর্বেই আপনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বজগতের জন্য তৈরী করিয়া নিতে সমর্থ হইবেন। মৃত্যু প্রত্যেকের অতি সন্নিকটেই রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ শ্রবণ করা এবং সেই সবের প্রতিকার চেষ্টার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দায়িত্ব প্রত্যেকের উপরই ওয়াজেব। বর্তমানে জুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি অন্যায়-অত্যাচারের এই দৃশ্য দেখিয়া প্রায় এক বৎসর পূর্বে তুস হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম, যেন জালেম শাসক সম্প্রদায়ের চেহারা কখনও আর দেখিতে না হয়। জরুরী কাজে পুনরায় তুসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইতেছি, জুলুম-নির্যাতন। আগের মতই অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত হইয় উঠিয়াছে। আপনি অনতিবিলম্বে সাধারণ মানুষকে এই অত্যাচারের যাঁতাকল হইতে মুক্ত করুন। কেননা, আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার দুনিয়ার জীবনে অসম্মান এবং আখেরাতের জীবনে কঠিন আযাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অত্যাচার-অনাচার দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া জেহাদে আকবর, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। যাহারা এই জেহাদে জয়যুক্ত হয়, তাহারা মর্যাদার দিক দিয়া রাজা-বাদশাহর উপরে স্থান লাভ করে।

কেহ যদি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চায়, তবে তাঁহাকে সরল-সহজ জীবনের অনুসারী হইতে হইবে। জমকালো পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত লোকেরা সেবামূলক কাজের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে না। মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আত্মম্ভরিতা এবং আরাম প্রিয়তার আলামত। এই ধরনের লোক পুরুষের বেশে স্ত্রীলোক বৈ আর কিছু নয়।কেহ যদি নিজেকে আচার-আচরণে অথবা বেশ-ভূষায় এমন স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়া দেয় যে,রণ মানুষ তাহার সেবা করিতে লাগিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে, সে অহংকার-আত্মম্ভরিতার হাতে বন্দীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে আসিয়া যেহেতু তাহার পক্ষে আর সাধারণ মানুষের সেবাকরা সম্ভব নয়, সুতরাং সে জনগণের জন্য এমনকি নিজের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিছুসংখ্যক লোক আছে, যাহারা সেবক বেশে উজিরদের আশ-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। উজিরে আজমের পক্ষে এই ধরনের লোকের সেবা ও আনুগত্য লাভে মর্যাদার কিছু নাই। কেননা, ইহারা কখনও উজিরের সেবাকরে না, ইহারা মাথানত করে নিজ নিজ লোভ ও উচ্চাকাংখার সম্মুখে। ইহাদের খেদমত উজিরে আজমের প্রতি নিবেদিত নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব স্ব লোভ-লালসা এবং উজিরের তরফ হইতে যেসব নগদ স্বার্থ লাভ হয়, সেই সবেরই খেদমত করিয়া থাকে। উজিরকে ভুল ধারণার মধ্যে ডুবাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে ইহারা সম্মুখে বসিয়া তারিফ করে। বন্ধুত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের বন্ধুত্ব কিন্তু তুচ্ছ কয়েকটি টাকার ডুরিতে বাঁধা থাকে মাত্র। কয়টি মুদ্রা হাসিল করার উগ্র লালসায় তাড়িত হইয়াই এই সমস্ত লোক বন্ধুত্বের তসবীহ মুখে নিয়ে সর্বদা চারিদিকে ঘুর ঘুর করিতে থাকে। যদি ঘুর্ণাক্ষরেও

২৬৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জানাজানি হইয়া যায় যে, উজারতের এই পদ অন্য কাহারো হাতে চলিয়া যাইতেছে, তখনই দেখিবেন, রাতারাতি এই সমস্ত লোক চারিদিকে ছিটকাইয়া গিয়াছে। নতুন মনিবের তালাশে আপনার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। আপনার প্রতি ইহারা যতটুকু আনুগত্য দেখাইতেছে, আপনার দুশমনের প্রতি আপনার চোখের সম্মুখেই এর চাইতে বহুগুণ বেশী আনুগত্য ও খেদমতের মহড়া দিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

উপরোক্ত বাস্তব সত্যটুকু অনুধাবন না করিতে পারিয়াই যদি কেহ তোষামাদকারীদের মৌখিক তারিফ এবং সাময়িক ক্ষমতার দাপটের উপরই তাহার মর্যাদার আসন গড়িয়া তোলেন, তবে ধোকাবাজীতে পরিপূর্ণ এই দুনিয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান হিসাবেই বিবেচিত হইবে। অন্যদিকে যদি ভুয়া মর্যাদাবোধ এবং তোষামোদ-কারীদের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করিতে কেহ সক্ষম হয়, তবে এই দুনিয়ার সাময়িক ক্ষমতার দাপট তাহার দৃষ্টিতে জাহান্নামের অন্ধকার গহ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ক্ষমতাবান কিছুসংখ্যক লোক এমন আছেন, যাহারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথা রাজা-বাদশাহদের সুদৃষ্টি এবং সাময়িক অনুগ্রহকেই মর্যাদার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বসে। অথচ যাহাদের অন্তরদৃষ্টি আছে, তাহারা অনুধাবন করিতে পারেন যে, এই ভিত্তি মাকড়শার জালের উপর ভিত্তি স্থাপনের চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় এই দিকে ইশারা করিয়া দিয়াছেন। বলা হইয়াছে, "যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য অভিভাবকের স্মরণাপন্ন হয়, তাহাদের মিসাল হইল, যেন কেহ মাকড়শার জালের উপর ঘর বাঁধিতে গেল। অথচ মাকড়শার জাল কত দুর্বল। হায়, ইহারা যদি এই সত্য অনুধাবন করিতে পারিত![২৬৬] মর্যাদার সর্বাপেক্ষা মজবুত এবং স্থায়ী ভিত্তি হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং স্বাধীনতা। আত্মজ্ঞান বা মারেফাতের অর্থ হইতেছে দুনিয়ার ধোকা, ফেরেববাজী ও অসারতা এবং পাশাপাশি আখেরাতের প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্বের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হওয়া। আর স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে, নাফছের সকল প্রকার খাহেশ হইতে মুক্ত হওয়া। এমন মুক্ত যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা দুনিয়ার সকল বাদশাহও যদি একত্রিত হইয়া কাহারো সেবায় লাগিয়া যায়, তবুও তাহার মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে না। যদি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়, তবুও তাহার পক্ষে অনুধাবন করা উচিত যে, প্রবৃত্তির জিন্দানখানা হইতে মুক্তিলাভ হয় নাই। দাসত্বের পূর্ণ অনুভূতি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তার সুখ-দুঃখের অনুভূতি এখনো অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল রহিয়া গিয়াছে। এখনও পর্যন্ত তাহার মধ্যে আত্মনির্ভরতা এবং নিজের উপর পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয় নাই।[২৬৭]

রাসূলে মকবুল (সাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) উপদেশ প্রদানাচ্ছলে বলিয়াছেন, "মানুষ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে সচেষ্ট হয়। তুমি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের পথ তালাশ কর। এই হাদীসের মর্মার্থ হইতেছে, বুদ্ধি এবং চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার মিসাল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার কিমিয়ার বিদ্যা জানা আছে। সে স্বর্ণ-রৌপ্য তৈরী করিতে জানে। আর আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা হইতেছে হাতে গোণা কিছু টাকা নিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। কেননা, বোধীর মাধ্যমে যে নৈকট্য লাভ করিতে চায়, সে প্রত্যেকটি বিষয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করে, সবকিছুর গভীরে পৌঁছার পর দুনিয়া তাহার দৃষ্টিতে মূল্যহীন অসার বস্তু হিসাবে ধরা দেয়। দুনিয়ার প্রতি সকল আকর্ষণ তাহার অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবেই

২৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২২
২৬৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দূর হইয়া যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে পর্যন্ত চিন্তা এবং উপলব্ধি না আসিবে, সেই পর্যন্ত দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে না, দুনিয়ার বাঁধন তাহার পক্ষে পরিপূর্ণরূপে ছিন্ন করা সম্ভব হইবে না। আর যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে, সেই পর্যন্ত তাহার পক্ষে মাওলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর হইবে না। শরীয়তের পরিভাষায় ইহাকেই "দীদার বা প্রত্যক্ষকরণ" বলা হয়। যে সব লোকের সকল চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু জান্নাত এবং হুর গেলমান লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহাদের পক্ষে আল্লাহর ওলীগণের কাতারে শামিল হওয়া সম্ভব হইবে না। এই সমস্ত লোকের পক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টি দুনিয়ার বুকে রাজা-বাদশাহর নৈকট্য লাভের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যেভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা তাহাদের পক্ষে এর চাইতে বেশী অর্থবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকিছু কামনা করে, সেই কাম্য বস্তুই তাহার প্রিয় পাত্রে পরিণত হইয়া যায়।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মাননীয় উজিরকে পরিপূর্ণ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে গভীর অনুধাবন শক্তি প্রয়োগ করিয়া আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করা কর্তব্য। যেন তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান প্রাঙ্গণের কাতারে শামিল হইতে পারেন এবং মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় চকচকে জিনিস দেখিয়া ধোকায় না পড়েন। যে সব লোক দুনিয়াকেই সকল আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আখেরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে, তাহারা গাফেল এবং প্রকৃত সুস্থবুদ্ধি থেকে বঞ্চিত। তাহাদের উপর প্রবৃত্তির তাড়না এমনভাবে চাপিয়া রহিয়াছে যে, দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই তাহাদের সম্মুখে ভালা নাই। যদি কাহারো বুদ্ধিই তাহাকে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার পথ হইতে সরাইয়া দেয়, তবে বুঝিতে হইবে, এর পিছনে দুইটি কারণ রহিয়াছে।[২৬৮]

প্রথমতঃ

হয়ত সে তাহার কোন নাফসানী খাহেসের দড়িতে এমনভাবে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে যে, ধন-সম্পদ এবং পদমর্যাদার লোভে ত্যাগকরা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে। এই রোগের প্রতিকার হইতেছে, সৎসাহস এবং সাধনায় উন্নত লোকদের পথ অবলম্বন, ক্ষুধিত প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শেখা, উচ্চাকাংখা এবং উন্নততর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়া ইতর নীচদের স্তর হইতে উত্তরিত হইয়া যাওয়ার চিন্তাধারা সৃষ্টি করা। দুনিয়ার আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করার জন্য এতটুকু চিন্তাধারাই যথেষ্ট যে, এই মোহ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এখানকার কোন কিছুই চিরদিন থাকে না । কাহারো ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দুনিয়াকে উপভোগ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এমন একটি। অসার বস্তুর পিছনে অমূল্য মানব জীবনের সকল সাধনা নিয়োগ করা, কেমন করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে?

দ্বিতীয় কারণঃ

যাহা তাহাকে আখেরাতের রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখে তাহা হইতেছে, আখেরাতের ব্যাপারে শোবা-সন্দেহ কিংবা কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হইয়া সেই লোক হয়ত হাবু-ডুবু খাইতেছে। তাহার আকল অন্তরদৃষ্টি তাহাকে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা ও অনুভূতি সঠিক পথে পরিচালিত করার পরও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম না হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, বহুলোকের মনেই খোদ আল্লাহ

২৬৮. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল: প্রাগুক্ত, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলার অস্তিত্বের ব্যাপারেও শোবা-সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। চিন্তা করিয়াও তাহারা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।[২৬৯] এই শ্রেণীর লোকের চিকিৎসা হইতেছে, সর্বপ্রথম তাহাকে অন্তর হইতে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া ফেলিতে হইবে যে, সে যাহা চিন্তা করিতেছে অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছে, ইহাই শেষ কথা এবং এরপর জ্ঞান বা যুক্তির আর কোন স্তর নাই। নিজের জ্ঞান ও চিন্তার অহমিকা ত্যাগ করার পর তাহাকে অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুরআনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "যদি কোন বিষয়ে জানার অভাব হয় তবে জ্ঞানীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নাও।"[২৭০] একজন চিকিৎসক যেমনভাবে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এইকথা অবগত আছেন যে, মানুষের মধ্যে যে প্রাণ রহিয়াছে তা ক্ষণস্থায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের পর উহা আর শরীরের মধ্যে থাকিবে না এবং এই শরীর ও প্রাণকে কিছুকাল রক্ষা করার জন্যও আবার নিয়মিত খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন। অপরপক্ষে "বিষ"নামক এমন একটি বস্তুরও অস্তিত্ব আছে, যা মানুষের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। ঠিক তেমনি শুধু খবর বা বর্ণনার ভিত্তিতেই নয়, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমেই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী কোন কিছুই সেই অবিনশ্বর আত্মার স্পর্শ লাভ করিতেও সক্ষম নয়। মানবীয় অপ-প্রবণতা এবং নাফসের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়াই কেবল রূহ মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহার প্রকৃত সৌভাগ্য নির্ভর করে মহা-মহিমান্বিত পরম প্রিয় মাওলার সত্যিকারের পরিচয়ের। মধ্যেই মুক্তি এবং সৌভাগ্য এক জিনিষ নয়। মুক্তির পরও সৌভাগ্যের স্তর বহু উর্ধ্বে।

এই সমস্ত বিষয় কবির কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া বা বক্তার যাদুকরি বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। বর্ণাঢ্য বর্ণনার মাধ্যমে এই সমস্ত সূক্ষ্মবিষয় অনুধাবন করার প্রচেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। একমাত্র সহীহ দলিল-প্রমাণ এবং শুদ্ধ অনুভূতির মাধ্যমেই এই সমস্ত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। কেননা, হাকিকতের স্তরের এই শরাব পান করিয়া বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নেশাগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির কাজ নয় এই বিষয় অনুধাবন করা। অতএব, উজিরে আযমের পক্ষে এতটুকু প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, যেন তিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, আখেরাতের সিরাতে মুস্তাকীম হইতে তাঁহাকে কোন্ সব কারণ ফিরাইয়া রাখিয়াছে। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া এই রোগের চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। যেন সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ শ্রবণ এবং তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ আত্ম সংশোধন করার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। সালাম!

তৃতীয় পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "যদি কেহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তবে তোমরা সেই অনুগ্রহের উত্তম প্রতিদান দিও।" অপ্রিয় হক কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তরের পরিচায়ক। মাননীয় উজির এই কারণেই নেক দোয়া পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ রাব্বল আলামীনের দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করিতেছি, তিনি আপনাকে প্রকৃত সৌভাগ্যের হাকীকত সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়ার এবং সেই সৌভাগ্যে ভাগ্যবান হওয়ার তওফীক প্রদান করুন। প্রকৃত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের উপদেশ

২৬৯. প্রাগুক্ত
২৭০. আল-কুরআন, ১৬:৪৩

Dhaka University Institutional Repository

শ্রবণ করে এবং সেই সমস্ত কথার তিক্ততা হজম করিয়া সেই উপদেশের মূল্য প্রদান করে। অবশ্য তিক্ত উপদেশ বরদাশত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই সৌভাগ্য হইতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বঞ্চিত। হইয়াছেন, তিনি ছিলেন উজির তাজুল মুলক। কেননা, নেজামুল মুলক-এর দুঃখজনক পতনের ঘটনা তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছিল যে, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু তিনি শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বরং মনে মনে স্থির করিলেন যে, নেজামুল মুলক বয়সে অভিজ্ঞতায় তাঁহার চাইতে খাট ছিলেন, তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উজারতের মসনদে সমাসীন থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্থান সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বয়স প্রভৃতিতে সেই ত্রুটি সারিয়া উঠার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। কিন্তু ভাগ্যের অখণ্ডনীয় কঠোর হস্ত তাঁহার সেই অহংকারের সকল নেশা অল্পদিনের মধ্যেই কপুরের ন্যায় উড়াইয়া নিয়া গেল। অতঃপর মজদুল মুলক উজির হইলেন। কিন্তু তিনিও পূর্ববর্তীদের পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বরং মনে মনে এমন একটা ধারণায় উপনীত হইলেন যে, নেজামুল মুলক-এর গুণগ্রাহী কর্মচারী এবং অনুচরেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাজুল মুলক-এর বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অনুরূপ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দক্ষতার সহিত কিছুকাল ওজারত চালাইলে পর, সকলেই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু দেখা গেল, কালের কুটিল প্রবাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিল না। খুব শীঘ্রই তাঁহার সকল আশা-আকাংখার ইমারত ধ্বসিয়া পড়িল। কুরআনের ভাষায় "তোমাদিগকে কি আমি এতটুকু বয়স দেই নাই যে, সে সময়সীমার মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং আমার তরফ হইতে কি সতর্ককারী আসিয়া তোমাকে সতর্ক করে নাই?" অতঃপর মুয়াইয়্যেদুল-মুলক-এর পালা আসিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিন-তিনটি টাটকা ঘটনা তাহাকে সাবধান করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনিও সেইগুলি হইতে কোন প্রকার নসিহত গ্রহণ করিলেন না। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী উজিরগণের কেহ বংশ কৌলীন্যের দিক দিয়া ওজারতের যোগ্যই ছিলেন না, তাই এত তাড়াতাড়ি তাঁহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। উচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে দক্ষতার সহিত ওজারতের দায়িত্ব পালন করা তাহার পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁহার সেই অহংকারও ধুলায় মিলাইয়া গেল। তাহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিতে মোটেই দেরী হইল না।

বর্তমানে আপনার পালা আসিয়াছে। আপনার প্রতিও আল্লাহর তরফ হইতে এইরূপ সতর্কবাণী আসিতেছে যে, "এই সমস্ত ঘটনা কি তাহাদিগকে কোন উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দেয় নাই যে, ইতিপূর্বে কত জনপদের সুখী লোকদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের বাড়ী-ঘরে চলাফেরা করিত। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের জন্য উত্তম নিদর্শন রহিয়াছে।[২৭১] কুদরতের তরফ হইতে আপনার প্রতিও অনুরূপ ইশারার মাধ্যমে বলা হইতেছে যে, "হে বুদ্ধিমান উজির! কোন অবস্থাতেই প্রকৃত জ্ঞানী সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন না। যাহারা বুদ্ধির চর্চা করে, তাহাদের পক্ষে কালের কুটিল প্রবাহের মধ্যে পদে পদেই শিক্ষণীয় বিষয় থাকিয়া যায়। আপনার পূর্বে যাঁহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াই সাফল্য লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের কি পরিণতি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা -ভাবনা করিয়া দেখুন। দেখিতে পাইবেন, "তাহারা কত সুন্দর উদ্যান, ঝর্ণা, শস্যক্ষেত্র এবং বিশাল প্রাসাদরাজি রাখিয়া গিয়াছে। কত সম্পদই না ছিল এই সবের মধ্যে, যা তারা ভোগ করিত! এমনিভাবেই আমি এক সম্প্রদায়ের সম্পদ

২৭১. আল-কুরআন, ২০:১২৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদের হাতে দিয়া দেই। তাহাদের সেই পরিণতিতে আকাশ কিংবা জমিন কেহই ক্রন্দন করে নাই, তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই!"[২৭২]

সুতরাং সময় থাকিতে আপনি নিজের অবস্থার কথা একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। যদি পূর্ববর্তীদের মতই আপনিও একইপথ অবলম্বন করেন, তবে ভাবিয়া দেখুন কি জবাব দিবেন? "তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না, কয়েক বৎসর তাহাদিগকে ভোগ করার সুযোগ প্রদান করি, তারপরই অঙ্গীকারকৃত সেই কঠিন মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। যে নেয়ামত তাহারা ভোগ করিত, সেই দিন তাহা তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না। আপনার ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, যে ধরনের বালা-মুসিবতের মধ্যে আপনি ঘেরাও হইয়া আছেন, ইতিপূর্বে আর কোন উজির এমন বিপদগ্রস্ত ছিলেন না। বর্তমানে যেরূপ জুলুম-নির্যাতন ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পূর্ববর্তী আর কোন উজিরের আমলে এমনটা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আপনি জুলুম না পছন্দ করিলেও মনে। রাখিবেন, হাদীস শরীফে আসিয়াছে, আল্লাহ তাআলা হাশরের দিন জালেমদের নিকট কৈফিয়ত তলব করার সময় তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্টদেরকেও রেহাই দেওয়া হইবে না। খুব ভালভাবে এই কথা মনে রাখিবেন যে, আশ-পাশে যাহারা আছে তাহাদের কাহারো আপনার জন্য চিন্তা করার সময় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফিকিরে অস্থির আছে। তাই নিজের চিন্তা আপনাকেই করিতে হইবে। সকলের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দ্বীন দুনিয়ার সৌভাগ্য হাসিল করার জন্য নিজেই সচেষ্ট হউন। যদি মনে করেন যে, দুনিয়ার জীবনে শান্তি লাভ সম্ভব নয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত করুন আমার জানামতে জুলুম প্রতিরোধের চাইতে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করার আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই। সারাদেশ আজ জালেমদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আমার এই এলাকা জালেমদের খপ্পরে পড়িয়া সাধারণ মানুষের হাড় পর্যন্ত চুর্ণ হইতে চলিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করিতেছে। সেই বর্ধিত রাজস্ব সরকারী তহবিলে কখনও জমা হয় না, নিজেরাই গ্রাস করিয়া থাকে। দরিদ্র জনসাধারণ ইহাদের ভয়ে মুখ খুলিতেও সাহস করে না। নিরবে নির্মম শোষণ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া বেচারাদের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা নাই।। আপনি অবিলম্বে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে অগ্রসর হউন। অতীতে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ সম্ভব না হইলেও আপনার শাসনামলে যাহাতে ঐ সমস্ত শোষক-জালেমদের উচিত শিক্ষা হয়, প্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার প্রাণভরা আশা, আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই এই নির্যাতনের মূল উৎপাটন করা সম্ভব। জালেম শোষকদের উদ্ধত মস্তক চূর্ণ করিয়া আপনিই নিরীহ শোষিত প্রজাসাধারণের জীবনে শান্তির স্নিগ্ধ পরশ বুলাইতে সক্ষম। সে মতে অনতিবিলম্বে আপনি একটা ফরমান জারী করিয়া দেশবাসির সহায়তায় অগ্রসর হউন। মনে রাখিবেন, এই সব দরিদ্র মুসলমানদের নেক দোয়ার মাধ্যমেই আপনার ওজারতের মসনদ সকল বিপদ-আপদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। শাসন কর্তৃপক্ষের জন্য দরিদ্র প্রজাসাধারণের নেক দোয়ার চাইতে উত্তম সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করি, তিনি মাননীয় উজিরকে দ্বীন দুনিয়ার সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করুন। সর্বদা যেন আপনার প্রতি এহসান ও মেহেরবাণীর বারিধারা অবিরাম বর্ষিত হইতে থাকে। আমীন!! আপনার প্রতি সালাম।

---

২৭২. আল-কুরআন, ৪৫;২৫-২৯

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৩

সরকারি কর্মকর্তাগণের প্রতি লিখিত পত্রাবলী

প্রথম পত্র: মুঈনুল মুলককে লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আখেরাতের সেই আবাসস্থল আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি,যাহারা দুনিয়ার জীবনে অসংগত উচ্চাকাংখার বশবর্তী হয় নাই,বিপর্যয় সৃষ্টি করে নাই। উত্তম পরিণাম মোত্তাকীগণের জন্যই নির্ধারিত রহিয়াছে।"[২৭৩] আখেরাতের মুক্তি দুইটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এক, অন্যায় উচ্চাকাংখার বশবর্তী না হওয়া এবং দুই,-ফাসাদ সৃষ্টি না করা। যে সব লোক রাজ্য শাসনের জন্য আকাংখিত হয়, নিঃসন্দেহে তাহারা উচ্চাকাংখী এবং উদ্যমশীলও হইয়া থাকে। তবে অসঙ্গত উচ্চাকাংখা অধিকাংশ সময়ই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে না। অপরদিকে যাহারা মূর্খদের ন্যায় সর্বদা ভোগ-বিলাস এবং আমোদ-ফুর্তিতে মশগুল থাকে, উহাদিগকে বিপর্যয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে।নাজাতের শর্ত পূর্ণ না করিয়া নাজাতের আশা করা আত্মপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উপরোক্ত দুইটি বিষয়কে নাজাতের পথে প্রধান অন্তরায় মনে না করা কুরআন শরীফকে সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর। আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া বদ্ধখতির রাস্তা বাছিয়া নেওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে আসক্ত হইয়াও আখেরাতে নাজাতের আশা পোষণ করে সে হয়ত মনে মনে এইরূপ আশা করে যে, আল্লাহ তাআলা পরম দয়ালু, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ পাক নেককার বান্দাদের জন্য পরম দয়ালু, অনাচারীদের বেলায় নহেন।

কেননা, সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি। বলিয়া দিয়াছেন যে, "সৎকর্মশীলগণ অবশ্যই নেয়ামতের মধ্যে থাকিবেন এবং পাপীরা নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামে।"[২৭৪] অনেকে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে যে, আগামীতে তওবা করিয়া নেওয়া যাইবে। এইরূপ লোকেরা ভালভাবেই জানে যে, শয়তান তাহাদিগকে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একইভাবে আগামী দিনের ওয়াদার মধ্যে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই ধোকায় পতিত হইয়াই তাহারা তওবা করিতে পারিতেছে না। বিগত বৎসরগুলিতে যদি শয়তান তাহাদিগকে আগামী দিনের ধোকা দিয়া তওবা হইতে সরাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে সামনের আর কয়েকটি বৎসর যে সে এই ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিবে , তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় কিরূপে? অনেকে মনে করেন, তাহার মৃত্যুর সময় আসিতে এখনও অনেক দেরী। মনে হয়, মওতের ফেরেশতাদের সঙ্গে যেন তাহার কোন চুক্তি রহিয়াছে।এই সমস্ত লোক চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আজ ও কালের' ধোকায় পতিত করিয়া শয়তান কত মানুষকেই সর্বনাশের সর্বশেষ স্তরে পৌছাঁইয়া দিয়াছে! বিশেষতঃ শেষ বয়সে এই ধরনের মনোভঙ্গী গাফলতের এবং বুদ্ধি বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

এইরূপ মনোভাবই চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। আল্লাহ তা'আলা সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, "অনেক জনপদে আমার পরম আযাব এমন হঠাৎ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, যখন তার অধিবাসিগণ নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এইসব জনপদের অধিবাসিগণ মনে করে যে, দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা খেলা-ধূলায় মত্ত, তখন আমার

২৭৩. আল-কুরআন, ২৮;৮৩

২৭৪. আল-কুরআন, ৮২;১৪

Dhaka University Institutional Repository

আযাব নামিয়া আসিবে। আল্লাহ তা'আলার প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে ইহারা কি নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে? অথচ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের দল ছাড়া আর কেহই আল্লাহর। আযাব হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। "আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেই আত্মবিস্মৃতির নিদ্রা হইতে জাগ্রত করুন। বিশেষতঃ মুঈনুল মুলককে সূক্ষ্মভাবে সাবধান করিয়া দিন। সম্প্রতি আপনার জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা আমি শুনিতে পাইয়াছি, যেগুলি আখেরাতের জীবনে অত্যন্ত বিপদের কারণ হইবে। কথাগুলি শোনার পর হইতে আমি ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে অন্তর দিয়া দোয়া করা, মুখে তাম্বি কর এবং কলমের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা ব্যতীত আর কিই-বা করবার আছে? যদি আপনি আমাকে আপনার ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, বিশেষতঃ আপনার নিজের অন্তরে যদি কোন উদ্বেগ সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তবে শুনুন, আমি নির্দেশ দিতেছি, সবগুলি অনাচার এক সঙ্গে ত্যাগ করা যদি সম্ভব না-ই হয়, তবে শরাব পান করা এই মুহূর্তে ত্যাগ করুন।

মনে রাখিবেন, জুলুম-অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ধরনের গোনাহ একবার সংযুক্ত হইয়া যায়, তবে মৃত্যুর আগে উহার কবল হইতে নিস্তার লাভকরা সম্ভবপর হয় না। এই বৃদ্ধ বয়সে মদ্য পানের অভ্যাস কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নয়। উজির নিজামুল-মুলক বার্ধক্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে সক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি তওবার উপর দৃঢ় ছিলেন। এমনকি তিনি বাদশাহর দরবারে পর্যন্ত শরাব এবং অন্যান্য অনাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খোরাসানের বাদশাহ আসমান-জমিনের বাদশাহর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কী জবাব দিবেন? তিনি যেহেতু সত্য অন্তরে তওবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্য পূর্বদেশের সর্বপ্রধান নরপতিকে পর্যন্ত তিনি সর্বপ্রকার বদভ্যাস হইতে মুক্ত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। বন্ধুত্বের যা হক ছিল, আমি তা আদায় করিয়া দিলাম। বিবেচনা করা না করা আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

দ্বিতীয় পত্র ঃ সাআদাত খানকে লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এমন কোন বস্তু নাই যার অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার নিকট মওজুদ নাই। আমি নির্ধারিত পরিমাণে তা নাযিল করিতে থাকি।"[২৭৫] দুনিয়ার সমস্ত নরপতির ধন-ভাণ্ডারই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল বাদশাহর বাদশাহ যিনি, তাঁহার সকল ভাণ্ডারই সীমাহীন, অফুরন্ত অগণিত। তাঁহার সেই অগণিত ভাণ্ডারের মধ্যে একটি হইতেছে সৌভাগ্যের এবং আর একটি দুর্ভাগ্যের। এই উভয় ভাণ্ডারই গায়েবের পর্দা দ্বারা আবৃত! আবার দুইটি ভাণ্ডারের দুইটি চাবি রহিয়াছে। একটি চাবির নাম পুণ্য এবং অন্যটির নাম পাপ। এই দুইটি চাবিই আবার সর্বজ্ঞাতা মহান সত্তার অপর দুইটি ভাণ্ডারের মধ্যে রক্ষিত। এর একটির নাম তওফীক এবং অপরটির নাম বঞ্চনা। আবার তওফীক এবং বঞ্চনার মূল বিষয়টি গায়েবের অন্য ভাণ্ডারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহার একটিকে বলা হয় রেযা' ও 'তসলিম' বা সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ এবং অপরটিকে বলা হয় ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি। সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টিও আবার এমন দুইটি ভাণ্ডারের মধ্যে সংরক্ষিত, যে পর্যন্ত সিদ্দীক এবং উচ্চ শ্রেণীর হাক্কানী উলামা ব্যতীত সাধারণ মানুষের এমন কি বিশিষ্ট জ্ঞানীগণের ধারণাশক্তিও পৌঁছিতে সক্ষম নয়। এই মাকাম সম্পর্কে কোন বর্ণনা প্রদান অথবা ব্যাখ্যা দেওয়াও সাধারণ আলেম বা সাধকগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। একমাত্র সেই সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের পক্ষে

২৭৫. আল-কুরআন, ১৫:২১

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব, যাহাদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে যে, "নিশ্চয় ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের সম্পর্কে পূর্ব হইতেই পুণ্য নির্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে।"[২৭৬]

দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত লোকের পক্ষেই এই খাজানা সম্পর্কে কিছু বলা হয়ত সম্ভব, যাঁহাদের সম্পর্কে খবর দেওয়া হইয়াছে যে, "ইহাদের অধিকাংশ লোকের উপর আল্লাহর বাণী পূর্ণ হইয়াছে।"[২৭৭]

উপরোক্ত দুইটি আয়াতেই যে গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তকদীরের রহস্যময় অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা সমীচীন ব্যাপার হইতেছে, কিছু না বলিয়া বা না শুনিয়া সম্পূর্ণ বোবা ও কালা সাজিয়া থাকা। কেননা, তকদীর আল্লাহ তাআলার। এমন এক রহস্য, যা প্রকাশযোগ্য নয়। এই রহস্যজগতের আড়ালে এমন আরও এক রহস্য জগত রহিয়াছে, যাহা উপরোক্ত সবগুলি খাজানা বা ভাণ্ডারের উৎসমূল। সেই জগত সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করার মত ভাষা নাই। খোদ রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত রহস্যজগতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে যাইয়া প্রথমে বরিয়াছেন, " আয় আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার আজাব হইতে পানাহ চাই।" এই স্তর হইতে উন্নীত হইয়া বলিয়াছেন, "আয় আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ-গজব হইতে পানাহ চাই।" এইস্তর হইতে পরবর্তী স্তরে আসিয়া বলিয়াছেন, "আয় আল্লাহ! আমি তোমার মাধ্যমেই তোমার না-রাযী হইতে পানাহ চাই।" এরও পরবর্তী স্তরে যখন উন্নীত হন, তখন তাঁহার পবিত্র যবান হইতে বাহির হইয়া আসে, "আমি তোমার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি যেভাবে তোমার প্রশংসা করিয়াছ, তুমি তেমনি"।[২৭৮]

"আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি হইতে পানাহ চাই"- এই মাকামই হইতেছে উলামাগণের শেষ মাকাম। তাঁহারা এই পর্যন্তই পৌছিতে সক্ষম হন। তাহার পরবর্তী স্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে পৌছা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই স্তরের পরে এমন আরও একটি স্তর রহিয়াছে, যেখানে ওলী-আওলিয়া এমনকি নবী-রাসূলগণের পক্ষেও পৌছা সম্ভব নয়। নবী সিদ্দীকগণ সেখানে পৌছিলে পর এক বিস্ময়ের জগতে হারাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। সেইখানে সকলেই এক এবং শওকের আগুনে ভস্মীভূত হইতে থাকা ছাড়া কোন কিছু অনুধাবন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহাদের যবান হইতে শুধু বাহির হইয়া আসিবে, সুববুহুন কুন্দুসুন'-এর তসবীহ! খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই মাকাম প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তোমার প্রশংসাবাদ করার সাধ্য আমার নাই, যেভাবে তুমি তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছ, তুমি তেমনি।" শুধু তাহাই নয়, সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সেই মাকাম অনুধাবন করার জন্য অগ্রসর হইয়া শুধু বিস্ময় আর অপারগতার অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।"সংক্ষেপে সকল বাদশাহর বাদশাহের অফুরন্ত খাজানার এই হইতেছে সামান্য পরিচয় । দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা জাওয়াহেরাতের যে ভাণ্ডার থাকে, সেইগুলি দোযখের চাবি ব্যতীত আর কিছু নয়। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার দাসেরা,দীনার দেরহামের পূজারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।" হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হইবে, "দোজখের চাবি যাহারা বহন করিয়াছে তাহাদের তালিকা বাহির কর। এই তালিকায় যাহাদের

২৭৬. আল-কুরআন, ২১:১০১

২৭৭. আল-কুরআন, ৩৬:০৭

২৭৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নাম রহিয়াছে, একে একে উহাদিগকে হাজির কর।" হায়! সেই তালিকায় যদি সা'আদাত খানের নামও আসিয়া যায়, তবে সেইদিন পূর্বদেশের মহাপ্রতাপান্বিত সুলতান বা তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত উজীর, বিন্দু মাত্রও সাহায্য করিতে পারিবে না। বরং সেই দিন তাঁহারাও নিঃসন্দেহে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া যাইবে।

তৃতীয় পত্র

[জৈনক বিশিষ্ট আমিরের উদ্দেশ্যে লিখিত।সদকার তাৎপর্য এবং সদকা দানের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে আলোচনা।]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার দীর্ঘ অসুস্থতা, চিকিৎসকগণের ব্যর্থতা এবং ভুল ব্যবস্থাপত্র প্রদানের দরুন আপনার কষ্ট ভোগের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেছি। এই অবস্থায় মনে রাখা দরকার যে, যে সৃষ্টিকর্তা রোগ সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই রোগের চিকিৎসাবিধিও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণভাবে অবশ্য লোকেরা মনে করে যে, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কোন ঔষধ বিক্রেতার দোকান হইতে ঔষধ কিনিয়া ব্যবহার করাই রোগ আরাগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আসলে কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। সকল চিকিৎসার জন্য রোগীর অন্তরে উপযুক্ত চিকিৎসক সম্পর্কে ইশারা সৃষ্টি হওয়া দরকার। আবার চিকিৎসকের অন্তরেও সেই রোগের স্বরূপ এবং তাহার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ঠিক ঔষধ, তাহার মাত্রা, সেবনবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে এলহাম হওয়া জরুরী। কেননা, রোগ নিরূপণ, তাহার জন্য উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন এবং সেবনবিধি এই তিনটি বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইয়া থাকে।

যথার্থ চিকিৎসা বিধান এবং চিকিৎসকের অন্তরে নির্ভুল ঔষধ নির্বাচনের যে ইশারা আসিয়া থাকে, তাহা কোন দোকানে কিনিতে পাওয়া যায় না! উহা এমন এক জগতের জিনিস, যাহার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিবার চাবি উর্ধ্বজগতে ফেরেশতাগণের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত থাকে। দুনিয়ার মানুষের প্রত্যেক ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে যে পথ নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা ফেরেশতা-জগতের সেই সুরক্ষিত খাজনা হইতেই সরবরাহ করা হইয় থাকে।কুরআনে পাকে এই সম্পর্কে ইশারা প্রদান করিয়াই বলা হইয়াছে, "কোন মানুষের পক্ষেই সরাসরি অবশ্য আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। আল্লাহর তরফ হইতে ইশারার মাধ্যমে, কোন নবী-রাসূলের মারফতে অথবা পর্দার আড়াল হইতেই আল্লাহর ইশারা লাভ করা সম্ভব। তাই তাঁহার তরফ হইতে প্রেরিতদের মাধ্যমে যাহাকে ইচ্ছা প্রয়োজনীয় ইশারা প্রদান করা হইয়া থাকে। তিনি নিঃসন্দেহে মহামহিম, মহাপ্রাজ্ঞ ।"[২৭৯]

আল্লাহর তরফ হইতে ফেরেশতা-জগতের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইশারা আল্লাহ-ওয়ালাগণের দোয়ার মাধ্যমেই কেবল লাভকরা যাইতে পারে। কেননা, ইহাদের নেক দোয়া এবং আন্তরিক আকৃতি যে বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়, আল্লাহর তরফ হইতে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাহা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই দিকে ইশারা করিতে গিয়াই বলিয়াছেন, "আমার নিকট সর্ব বিষয়েই অফুরন্ত ভাণ্ডার সুরক্ষিত রহিয়াছে, তন্মধ্য হইতে সবকিছুই নির্ধারিত পরিমাণে নাযিল করা হইয়া থাকে।"[২৮০] আল্লাহ-ওয়ালাগণ বিশেষতঃ যাহারা নিজদিগকে আল্লাহর পথেই নিয়োজিত রাখেন, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই তাঁহাদের আন্তরিক দোয়া লাভকরা যাইতে পারে। এই সমস্ত নেক দোয়া আলমে-মালাকূতের তরফ হইতে ফেরেশতাগণের ইশারাপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেয়। রোগীর পক্ষে যোগ্য চিকিৎসক নির্বাচন এবং চিকিৎসকের পক্ষে যথার্থ ঔষধ নির্বাচনের

২৭৯. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.৩০
২৮০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরযোগ্য পন্থাই হইতেছে ফেরেশতা-জগতের গায়েবী সাহায্য লাভ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস শরীফের তাৎপর্যও ইহাই। হাদীসে আসিয়াছে, "তোমরা সদকার মাধ্যমে রোগ-শোক দূর করার চেষ্টা কর।" আল্লাহ-ওয়ালাগণের আন্তরিক আকুতি আলমে-মালাকূতকে নাড়া দিয়া সেখান হইতে ফয়েয লাভ করার উপযোগী হয় যে কারণে,তৎপ্রতিও আল্লাহর কিতাবে ইশারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রাব্বল আলামীনের অনুগ্রহ-সাগরের বারিবিন্দুই ফেরেশতা জগত বা আলমে-মালাকূতের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকে। কুরআন শরীফে বলা হইয়াছে, "আপনাকে রূহ সম্পর্কে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে। ইহাদের বলিয়া দিন, রূহ আমার নির্দেশেরই অন্তর্গত বিষয় মাত্র।"[২৮১]

রূহ এবং আলমে-মালাকুতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এই প্রসঙ্গটি এমন গভীর এবং গূঢ় রহস্যপূর্ণ, যা বর্ণনা করার বিষয় নয়, সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করার মতও নয়। তাই এই সম্পর্কে যত্র তত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অনুমতিও নাই। সাধারণভাবে বুঝবার জন্য শুধু এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রূহের জগত এবং আলমে-মালাকুত একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত, কেননা উভয়টিই রাব্বানী রহস্যজগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তাআলা দুই জায়গায় এই ব্যাপারে দুইটি ইশারা প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বলিয়াছেন, "বলিয়া দাও, রূহ আমার রবের নির্দেশ মাত্র।" দ্বিতীয় একস্থানে বলিয়াছেন "সৃষ্টি এবং তাহার নির্দেশনা একমাত্র আল্লাহর হাতে সীমাবদ্ধ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, রূহের জগত এবং সৃষ্টি ও তাহার পরিচালনার জগত এক ও অভিন্ন এবং পরস্পর ও প্রোতভাবে জড়িত। তবে বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম যে, এই সম্পর্কে বর্ণনা করার ভাষা কোন কালেই কোন গবেষকের সাধ্যায়ত্ব ছিলনা, এখনও নাই। বস্তুতঃ বিষয়টি আত্মার উন্নতিসাধন করিয়া উপলব্ধিই শুধু করা যাইতে পারে, গবেষণার মাধ্যমে এই রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমি শুধু এতটুকু দেখাইতে চাহিয়াছি যে, কঠিন রোগ এবং বিপদমুক্তির সহিত সদকা-খয়রাতের সম্পর্ক কত গভীর। এই প্রসঙ্গেই তো বলা হইয়াছে যে, "দোয়া বালা-মুসিবত ফিরাইয় দেয়।" অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, "দোয়া এবং বালা-মুসিবত পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।" দোয়ার মাধ্যমে আত্মার আকুতি-নিবেদন যদি জামাতের ছুরতে হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এস্তেসকার নামায এবং জামাতের সহিত নামায পড়ার মূল তাৎপর্য ইহাই। এই দুই অবস্থাতেই সম্মিলিতভাবে আকুতি-নিবেদন করা হইয়া থাকে। আমার উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত কোন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে গরম প্রভাবে সৃষ্ট মুখ-বিসুখ ঠাণ্ডার মাধ্যমে দূর করা হয়। যেসব কারণে অসুস্থতা সৃষ্টি হয়, সেইসব কারণ দূর করিয়া দেওয়া অথবা শরীরে যেসব উপাদানের অভাব দেখা দিলে অসুখ হয়, সেইগুলি পরোক্ষভাবে পূরণ করিয়া দিলেই তো কেবল অসুস্থতা দূর হওয়া স্বাভাবিক। দোয়ার বা সদকার এখানে কি ভূমিকা থাকিতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নের মধ্যে যেমন স্থল যুক্তি আছে, তেমনি কিছুটা সত্য যে নাই তাহা নহে। কেননা, সুস্থতা এবং অসুস্থতা আমরা স্থূলভাবেই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তিনি অবশ্যই অনুভব করিতে পারিতেন যে, শরীরের কল-কজায় বৈকল সৃষ্টি হওয়া এবং দ্রব্যগুণের মাধ্যমে সুস্থ হইয়া উঠার বিষয়টিও ভুল দৃষ্টিতেই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

---

২৮১. আল-কুরআন, ১৭:৮৫

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, বস্তুর মধ্যে প্রভাব এবং শরীরের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক তাহা যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহার কুদরতের রাজ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকিলে এই ধাধার কোন কিনারা করা সম্ভবই নয়। একটি মিছালের মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝানো যাইতে পারে। যেমন,একটি পিপীলিকা কাগজের এক প্রান্তে বসিযা দেখিতেছে যে, সাদা কাগজের উপর একটি কলম একদিক হইতে কালো দাগ কাটিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া পিপীলিকার যদি ধারণা হয় যে, কলমই সাদা কাগজের উপর একটি কালো দাগ কাটিয়া যাইতেছে,তবে পিপীলিকার সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

কেননা, পিপীলিকার দৃষ্টি লেখকের হাত পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। তাহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি কলমের অগ্রভাগটুকুকেই শুধুমাত্র কর্মরত দেখিতে পায়। কোনক্রমে যদি লেখকের হাতটুকু পর্যন্ত পিপীলিকার দৃষ্টি আসিয়া পতিতও হয়, তবুও কি লেখা সম্পর্কে পিপীলিকার পক্ষে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব? কেননা, লেখা কি কলমের পিছনে নাড়াচড়ারত হাতের কয়েকটি আঙ্গুলের কাজ? লেখাপড়া সম্পর্কে যাহাদের ধারণা আছে, তাহারা অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন যে, লেখকের অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত আবেগ, ইচ্ছাশক্তির প্রশ্রবণ-বাহিত হইয়া হাতকে পরিচালিত করে এবং সেই পরিচালিত হাত কলমকে পরিচালনা করিয়া কাগজের বুকে কথার মালা গাঁথিয়া যাইতে থাকে। অন্তরের গভীরে সৃষ্ট ভাব দ্বারা পরিচালিত না হইলে শুধু হাত এবং কলমের দ্বারা হিজিবিজি অংকন সম্ভব হইতে পারে, অর্থপূর্ণ কোন লেখার জন্ম সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাহ্যত কলমের নাড়াচড়া এবং তাহার পশ্চাতে কার্যরত হাতের। পরিচালিকাশক্তি হইতেছে প্রকৃত পক্ষে লেখকের অন্তর যা দেখার ক্ষমতা স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন পিপীলিকা তো দূরের কথা, বিদ্যাহীন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এই মিছালের মধ্যে কলমকে চিকিৎসক, লেখাকে তাহার প্রদত্ত ঔষধ এবং হাতকে কলমের পরিচালিকা শক্তি, আলমে-মালাক্ত এবং লেখকের অন্তরকে সবকিছুর আসল পরিচালক সবকিছুর প্রকৃত নিয়ন্ত্রক রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, "মুমেনের অন্তর পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বল আলামীনের দুই আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।"[২৮২]

মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁহার সৃষ্টি রহস্যের সকল রহস্যরাজির বাস্তব নমুনা হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি তাহার আত্মপরিচয় লাভ করিতে পারে সেই কেবল তাহার রবের পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।"[২৮৩] কুদরতে রাব্বানীর যে স্তরবিন্যাস রহিয়াছে, তন্মধ্যে কলম, হাত এবং তাহার উপর অন্তরের চালিকাশক্তির যে পর্যায়ক্রমিক ভূমিকা তন্মধ্যে প্রথম দুইটি স্কুল, তাই নিম্নস্তরের এবং শেষের বিষয়টি উপলব্ধিগত, তাই উচ্চস্তরের। সুতরাং যাহারা প্রশ্ন উথাপন করেন তাহাদিগকে দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ এবং উন্নত করিয়া সুলতার পিছনে যে সূক্ষ্ম রূহানিয়্যত লুক্কায়িত আছে, তাহা উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা অর্জন করা কর্তব্য। বলাবাহুল্য,বস্তুগত জ্ঞান নিয়াই যাহারা তুষ্ট, তাহাদের পক্ষে এই উপলব্ধির জগতে পৌঁছা সম্ভব নয়। চিন্তাধারার এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যটুকু বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, 'মানুষকে আমি অতি উত্তম উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি, আবার তাহাকে সর্বনিম্নস্তরেও নামাইয়া দিয়াছি।"[২৮৪] এই আয়াতের মমার্থ হইতেছে,রূহানিয়্যাতের সর্বোত্তম স্তর এবং স্থূলতার সর্বনিম্ন স্তরের যে বিস্ময়কর সমন্বয় মানুষের মধ্যে ঘটানো হইয়াছে তৎপ্রতি ইশারা করা।

---

২৮২. প্রাগুক্ত

২৮৩. প্রাগুক্ত

২৮৪. আল-কুরআন, ৯৫;০৪-০৫

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দৃষ্টি যেহেতু শরীর-বিজ্ঞানএবং সুলবিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই জন্য শারীরিক রোগ-ব্যাধি এবং আপদ-বিপদে পতিত হইয়া রূহানী সাহায্যলাভ করার প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হয় না। রূহানীয়্যাতের জগত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অর্থ-সম্পদ বা পদমর্যাদা কোনই কার্জে আসে না। দোয়া এবং হৃদয় অনুভূতির ভাষায় ভর করিয়াই শুধু সেই পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। "একমাত্র পাক পবিত্র বাণীই তাঁহার সকাশে আরোহণ করিয়া থাকে।"[২৮৫] সুতরাং দোয়াকে ঊর্ধ্বজগতে পৌছানোর জন্য অত্যন্ত এখলাসপূর্ণ আমলের প্রয়োজন। "একমাত্র আমলে সালেহের দ্বারা উহা উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করার শক্তি লাভ করে।"[২৮৬] সদকা-খয়রাতের বেলায়ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে। বেনামাযী পেশাদার ফকীর-মিসকীনদগকে বাড়ীর দরজায় সমবেত করিয়া উহাদের মধ্যে গোশত রুটি কিংবা টাকা-পয়সা বণ্টন করিয়া কখনও রূহানীয়্যাতের জগত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কেননা, এই ধরনের দানের মাধ্যমে অভাবী পেশাদার লোকদের পাওয়ার আকাংখাকেই শুধু উস্কাইয়া দেওয়া হয়। আর এই সমস্ত না-শুকুর লোকের অন্তর কোন অবস্থাতেই পরিতৃপ্ত হয় না। অপরদিকে দ্বীনদার এবং দ্বীনের কাজে সদা-সর্বদা নিয়োজিত লোকেরা সর্বাবস্থায় আলমে-মালাকুত তথা রূহানীয়্যাতের দুনিয়াতেই আত্মাকে নিবদ্ধ রাখেন। ইহাদের আন্তরিক সন্তুষ্টি রূহানী দুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছার সহজতম পন্থা। কারণ, লোভ-লালসা অথবা শয়তানের কব্জা হইতে ইহাদের অন্তর পাক-সাফ হইয়া থাকে। বর্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আপনি পাঁচজন সৎ এবং দক্ষ লোককে নিয়োজিত করুন। ইহারা প্রকৃত দ্বীনদার দরিদ্র দরবেশ এবং যে সমস্ত লোক দ্বীনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকার কারণে ঘর-সংসারের দিকে তেমন নজর দিতে পারে না,ঐ সমস্ত লোককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোপনে যেন তাহাদের নিকট খয়রাতের অর্থ পৌঁছাইয়া দেন। এমন লোকদের আন্তরিক দোয়ার বরকতেই দূরারোগ্য ব্যাধির প্রকৃত সুচিকিৎসার পথ খুলিয়া যাইবে। কোন দক্ষ চিকিৎসকের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া এবং সেই চিকিৎসকের অন্তরে এই রোগের যথার্থ ঔষধ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হওয়া। একমাত্র এই পথেই সম্ভব।

সাবধান! কোন মূর্খ চিকিৎসকের কথায় কান দিবেন না। কোন কুসংস্কারগ্রস্ত লোকের কথায়ও পড়িবেন না। অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া সুচিকিৎসার নিমিত্তে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা কর্তব্য। এতে রোগীর অন্তরে আস্থারও সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকের প্রতি রোগীর আস্থাও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

চতুর্থ পত্র ঃ দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রতি লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি একটি অণুপরিমাণ সৎকাজ করিবে, তাহা সে দেখিতে পাইবে এবং যে একটি অণুপরিমাণ অসৎ কাজ করিবে, সে তাহাও দেখিতে পাইবে।"[২৮৭] মানুষের কর্ম, কথা-বার্তা অথবা মৌনতা, তাহার দান-খয়রাত বা কার্পণ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি আমল হয় সৌভাগ্যের ভাণ্ডার হিসাবে সঞ্চিত হইতেছে অথবা দুর্ভাগ্যের এক। একটি ভয়াবহ খাদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মানুষ তাহার কাজকর্ম সম্পর্কে গাফেল,বে-খেয়াল থাকে; কিন্তু আল্লাহর তরফ হইতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাহার ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি আমল, এমনকি প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মানুষের প্রত্যেকটি মুহূর্ত গণনা

২৮৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল: প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৪৩০

২৮৬. প্রাগুক্ত

২৮৭. আল-কুরআন, ৯৯;০৭-০৮

Dhaka University Institutional Repository

করিয়া যাইতেছেন, সেখানে সে তাহার কাজকর্ম সম্পর্কে অনবরত ভুলিয়া যাইতেছে । যে মুহূর্তে মানুষ এই দুনিয়া হইতে বাহির হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্তে তাহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল কর্ম পৃথক দুইটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করা হইবে ।

কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে, "সেইদিন প্রত্যেকটি মানুষ যাহা কিছু স কর্ম করিয়াছে দৃষ্টির সম্মুখে দেখিতে পাইবে। আবার অন্যায়-অনাচার যা কিছু করিয়াছে,তাহাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। সে তখন আপেক্ষা করিয়া এইরূপ আকাংখা করিবে, "হায়! এই সমস্ত দুষ্কর্ম হইতে যদি সে দীর্ঘকালের ব্যবধানে থাকিতে পারিত!" অতঃপর সৎকর্মরাশি এক পাল্লায় এবং দুষ্কর্মগুলি অন্য পাল্লায় রাখিয়া ওজন করা হইবে। কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে হিসাব-কিতাবের সেই অভাবিতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া মানুষের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ভীতিবিহ্বল অন্তর নিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিবে, তাহার পাল্লা কোনদিকে কাত হয়, সেই দৃশ্য দেখার জন্য। "যাহাদের সৎ কাজের পাল্লা ভারী হইবে, তাহারা অত্যন্ত সুখী-সন্তুষ্ট জীবনযাত্রা লাভ করিবে। আর যাহাদের সৎকর্মের পাল্লা হালকা হইবে, তাহাদের আশ্রয় হইবে হাবিয়া। তোমরা জান কি উহা কি বস্তু, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।" ধনবানদের অবস্থাও হইবে অনুরূপ। নফসের খাহেশাত বা প্রবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাহারা যাহা কিছু খরচ করিতেছে, তাহা অন্যায়ের পাল্লায় যাইবে। আর যাহা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের পথে খরচ হইবে সেই সমুদয় নেকীর পাল্লায় যাইবে । যদি কোন ধনবান ব্যক্তি তাহার অর্জিত মোট সম্পদের অর্ধেকের বেশী আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে খরচ করিয়া যাইতে পারে,তবে কেবলমাত্র ধনের ব্যাপারে সে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে । যদি ভোগ-বিলাস এবং সঞ্চয়ের খাতায় মোট অর্জিত সম্পদের অর্ধেকের বেশী খরচ হয়, তবে তাহার পক্ষে নাজাতের আশা করা যায় না। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)[২৮৮] ধন-সম্পদের বালা হইতে মুক্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে সমুদয় সম্পদই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমাতে আনিয়া হাজির করিয়াছিলেন। তিনি পরিবার-পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া জবাব দিয়াছিলেন যে, "আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি।" মালদারদের সম্পর্কে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন যে, "ধনবান মাত্রই ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হইবে তবে যাহারা ডানে-বামে সমান খরচ করিয়া থাকে, শুধু তাহাদের পক্ষেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব হইবে।" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই হাদীস শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মওকামত সংকটের কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় অর্জিত সমস্ত সম্পদই আল্লাহর পথে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই মালের প্রতি আসক্তি এবং কার্পণ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। ধন-সম্পদ ব্যয়ের মধ্যে যে সীমাহীন পুণ্যতা অর্জন করার পথে প্রকৃতিগত বাধা-বন্ধনের সীমা নাই। তাই এই ব্যপারে দৃঢ় সংকল্প এবং অন্তর মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মাল ব্যয় করার সময়ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রকৃত হকদারের মতো খরচ করিতে পারিলে বহুগুণ বেশী পুণ্য লাভকরা যায়। হালাল রোজগারের মাল হইতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আলেমগণের সহায়তা করিতে পারিলে হাজার গুণ বেশী ফল পাওয়ার আশা আছে। তবে দান করিয়া যেন তাহাদের উপর কোন চাপ প্রয়োগ অথবা অনুগত করার গোপন আকাংখা অন্তরে না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "তোমরা খুঁটা দিয়া কিংবা দান গ্রহীতাকে অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দিয়া তোমাদের খয়রাতসমূহ বরবাদ করিও না।"[২৮৯]

২৮৮. ইসলামের প্রথম খলিফা, তার নাম আবু-বকর, পিতার নাম কুহাফা, তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিশ্বস্ত সহচর

২৮৯. আল-কুরআন, ০২;২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পত্র:

মাগরেবে-আকসার কাজীগণের প্রতি (ইমাম গাজালি বান্দাদের নিযামিয়া মাদরাসার প্রধান হিসাবে কার্যরত থাকা অবস্থায় মাগরেবে-আকসা[২৯০] হইতে মারওয়ান নামক এক ব্যক্তি তাহার পিতার তরফ হইতে কাজী পদে নিয়োগ লাভ করার দরখাস্তসহ বাগদাদে হাজির হন। মারওয়ানের পিতা ইমাম গাজালির পরিচিত এবং কাজী পদের জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাই ইমাম সাহেব খলিফা মোতাযহার বিল্লাহর বরাবরে উক্ত ব্যক্তির স্বপক্ষে একটি সুপারিশনামা লিখিয়া দিলেন। খলিফা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কাজীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদানে রাজী হইলেন না, তবে ইমাম সাহেবের সুপারিশের মর্যাদা রক্ষার্থে পত্রবাহক মারওয়ানকেই কাজী হিসাবে নিয়োগপত্র দিয়া দিলেন। মারওয়ান এই পদের জন্য যোগ্যব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই নিয়োগপত্র তাঁহার জন্য অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, তিনি আসিয়াছিলেন পিতার তরফ হইতে আবেদন পেশ করার জন্য। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির আগাগোড়া ব্যাখ্যা করিয়া পিতার নিকট ব্যক্তিগত একটি পত্র লিখিয়া দেওয়ার জন্য তিনি ইমাম সাহেবকে অনুরোধ জানাইলেন।

ইমাম সাহেব কাজী মারওয়ানের অনুরোধে মাগরেবে-আকসার কাজীগণকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে পরোক্ষভাবে মারওয়ানের নিয়োগ সংক্রান্ত পরিস্থিতিও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয় ।

কাজী মারওয়ানের মাধ্যমে আপনার ন্যায় একজন বিশিষ্ট আমীর এবং উচ্চপদস্থ সরকারী দায়িত্বশীলব্যক্তির সঙ্গে প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এই বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনের চাইতে কম বলিয়া আমি মনে করি না। এই সম্পর্ক বজায় রাখার। উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ হইতে অন্ততঃ পত্র যোগাযোগ কায়েম থাকা বাঞ্চনীয়। বন্ধুত্বের এই সম্পর্ককে একটি উচ্চস্তরের উপদেশবাণীর মাধ্যমে আরও একটু গভীরতর করার উদ্দেশ্যেই এই পত্র লেখা হইতেছে। উলামাগণের তরফ হইতে ইহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তোহফা। প্রকৃতপক্ষেও এই তোহফা অত্যন্ত মূল্যবান। এই তোহফা সশ্রদ্ধ অন্তরে কবুল করা এবং দুনিয়াদারীর অন্ধকার হইতে অন্তর মুক্ত করিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা জরুরী। আমি আপনাকে বিশেষভাবে এই মর্মে তাকীদ করিতেছি যে, মানুষ যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানে আপনি সর্বাবস্থায় জ্ঞানী এবং পরহেজগারগণের দলে থাকিবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং মর্যাদাবান কাহারা?" জবাব দিয়াছিলেন, "যাহারা সবচাইতে বেশী পরহেজগার। জিজ্ঞাসা করা হইল, "সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কাহারা? জবাব দিলেন, "যাহারা মৃত্যুকে সবচাইতে বেশী স্মরণ করিয়া থাকে। সর্বোপরি পরহেজগারী এবং জীবনের রহস্য সম্পর্কে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূতি রাখে।"

অন্যএক হাদীসে রাসূল মকবুল (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার নাফসকে আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে সর্বাপেক্ষা মূর্খ-নাদান সেই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত জীবন-যাপন করিতেছে।" মানবকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন জাহেল ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সদা-সর্বদা শুধুমাত্র দুনিয়া কামাই করার কাজে নিয়োজিত থাকে। মৃত্যুর সময় যেসব বিষয় নেহায়েত তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে, ঐ সমস্ত বিষয়কে যে জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান কাজ বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। এই সমস্ত লোক কখনও চিন্তা করার সুযোগ পায় না যে, তাহারা কি জান্নাতিদের দলভুক্ত হইবে, না জাহান্নামিদের? অথচ আল্লাহ তা'আলা

২৯০. https://www.britannica.com › ... › Historical Places

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতির সেই তথ্য সম্পর্কে মানুষকে সুস্পষ্টভাবেই পরিচিত করাইয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, "নেককারেরা জান্নাতের অধিবাসী হইবে এবং পাপী-বদকারেরা জাহান্নামের অধিবাসী।" অন্য এক জায়গায় এরশাদ করা হইয়াছে, "এবং যে ব্যক্তি অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়াছে, নিশ্চিতরূপে জাহান্নামই হইবে। তাহার আশ্রয়স্থল। আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের মাকাম সম্পর্কে ভয় করিয়াছে, এবং প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছাচার হইতে বিরত রাখিয়াছে, জান্নাতই হইবে তাহাদের আশ্রয়।"[২৯১] অন্যত্র বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন এবং এই জীবনের সাজ-সজ্জারই আকাংখী হইবে, তাহার সকল আমলের বদলা আমি এই জীবনেই চুকাইয়া দিব । তাহাদিগকে এখানে ঠকানো হইবে না। ইহারা ঐ সমস্ত লোক, আখেরাতের অগ্নি ব্যতীত যাহাদের জন্য আর কিছু নাই। দুনিয়াতে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সবই মিসমার হইয়া যাইবে এবং মুছিয়া যাইবে তাহাদের সকল আমল।"

আমি চাই, উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন। এই সমস্ত সতর্কবাণীর আলোকে স্বীয় নাফস-এর গতিবিধি লক্ষ্য করুন। অবশ্য এর আগে নিজের জাহের ও বাতেন, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি প্রদান করুন। আপনাদের সকল কাজকর্ম, কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছুর একটি হিসাব গ্রহণ করুন। এইগুলির গতিবিধি কি আল্লাহর নৈকট্য এবং সৌভাগ্যের পথে আপনাকে পরিচালিত করিতেছে, না আপনার গতিকে দুনিয়ার জীবন আবাদ করার পথে ঠেলিয়া দিতেছে। এমনকি দুনিয়ার নেশায় আপনাকে মত্ত করিতেছে, যা অর্জন করার পথে একের পর এক কঠিন পরীক্ষা, বালা-মুসিবত এবং হিংসা-বিদ্বেষের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর কঠিন হইতে কঠিনতর গোনাহে লিপ্ত ও চির দুর্ভাগ্যের কাঠিন্যে জড়াইয়া যাওয়াই সার হয়।

সুতরাং সময় থাকিতে অন্তরদৃষ্টি উম্মিলিত করার চেষ্টা করুন, এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। বুঝিতে চেষ্টা করুন নাফস আপনাকে ভবিষ্যতের কোন পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছে? স্মরণ রাখিবেন, নাফসই হইতেছে আপনার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সহচর। নাফস-এর গতিবিধিই আপনাকে আপনার অন্তর্নিহিত আকাংখার স্বরূপ সম্পর্কে পথ দেখাইবে।

উপরোক্ত উপলব্ধির আলোকে এখন শান্তমনে ভাবিয়া দেখুন, আপনি কোন বস্তুর আকাংখা করিবেন। নাফস আপনাকে কিসের আকাংখায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে? যদি আপনি কোন বিস্তৃত এলাকার জায়গীরদার হওয়ার ফিকিরে থাকিয়া থাকেন তবে কান পাতিয়া শুনুন, আল্লাহ আপনাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "কত সুন্দর জনপদ ছিল, যেগুলিকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আজ সেই সমস্ত সমৃদ্ধ জনপদের কোন চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অথচ এই সমস্ত জনপদে তাহার অধিবাসিগণ পরম সুখে দিনাতিপাত করিত।" যদি আপনি কূপ খনন কিংবা নহর তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে চিন্তা করিয়া দেখেন না কেন, কত গভীরকূপ শুকনা অবস্থায় এখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে, কত খাল-নহর মাটির বুকে শেষ চিহ্নটুকুও টিকাইয়া রাখিতে পারে নাই।যদি দালান-কোঠা তৈরী করা আপনার জীবনের লক্ষ্য হইয়া থাকে, তবে ভাবিয়া দেখিবেন, কত সুন্দর সুন্দর ইমারত, বিশাল সুসজ্জিত প্রাসাদজি স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়া অনাগত বংশধরদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কালের করালগ্রাস হইতে সেই সমস্ত সুদৃশ্য প্রাসাদরাজিকে কেহ রক্ষা করিতে

২৯১. আল-কুরআন, ৭৯;৩৭-৪১

Dhaka University Institutional Repository

পারে নাই। যদি আপনি কোন বাগান বা শস্যক্ষেত্রের মালিক হওয়ার আকাংখা করিয়া থাকেন, তবে শুনুন! আল্লাহপাক আপনাকে ডাকিয়া কি বলিতেছেন-"কত বাগান, ঝরণা, শস্যক্ষেত্র, উত্তম বাড়ী-ঘর এবং ভোগ-বিলাসের উপকরণই না ছিল- যাহা তাহারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত, সব কিছুই তাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এমনি ভাবেই আমি এই সমস্ত অন্য সম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দেই। উহাদের জন্য আকাশ কিংবা পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, তাহাদিগকে সামান্য অবকাশও দেওয়া হয় নাই।"[২৯২]

অন্য একস্থানে আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করুন, "তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ,কয়েক বৎসরের জন্য আমি তাহাদিগকে ভোগ করার সুযোগ প্রদান করি, তবুও তো তাহাদের উপর অঙ্গীকারকৃত সেই পরিণতি অবশ্য আসিয়া উপনীত হয়, আমার দেওয়া ভোগসামগ্রী তাহাদিগকে সেই পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"[২৯৩] যদি আপনি কোন রাজা-বাদশার সহচর আমির-ওমরায় পরিণত হইয়া বড় মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইতে চান, তবে একবার আপনাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীসখানার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলিব; যেখানে বলা হইয়াছে, 'আমীর-ওমরা এবং পদস্থ লোকগণকে হাশরের ময়দানে পিপীলিকার আকৃতিতে উঠানো হইবে, সেখানে তাঁহারা মানুষের পদতলে নিষ্পেষিত হইতে থাকিবে।" এই হাদীস দ্বারাও যদি আপনার আকাংখা তৃপ্ত না হয়, তবে আরও একটু শ্রবণ করুন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তির মাথার উপর একজন কঠোর প্রকৃতির নেগাহবান মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার হাতে এই অহংকারের পরিসমাপ্তি বিধিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "এমন উচ্চাকাংখী অহমিকা প্রিয় লোকদের পরিণতি কি হইয়াছে, ইহাদের জীবৎ কালেই উহারা অপরাপরের সম্মুখে আক্ষেপের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।" অর্থাৎ অন্যায় উচ্চাকাংখার শিকারে পরিণত হইয়া এমন দুঃখজনক পরিণতির দিকে তাহারা আগাইয়া গিয়াছে, যাহা দেখিয়া অন্যদের অন্তরেও করুণার সৃষ্টি হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেন,"একটি নিরীহ মেষপালের মধ্যে দুই-দুইটি বাঘও যে ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, ধন-দৌলত এবং পদমর্যাদার উচ্চাকাংখা মুমেন ব্যক্তির ঈমানের ক্ষেত্রে সেই ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে।"

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁহার অনুসারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আমার অনুসারীগণ! ধন-সম্পদ দুনিয়ার জীবনে আরাম-আয়েশের সামগ্রী বটে,তবে আখেরাতের জীবনে উহা প্রভূত ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে ।আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতে পারি, ধনীরা উর্ধ্বজগতের বাদশাহীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।" নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "ধনবান লোকদিগকে হাশরের ময়দানে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উঠানো হইবে। তন্মধ্যে একভাগ হইবে ঐ সমস্ত লোকেরা, যাহারা হালাল পথে ধন-দৌলত অর্জন করিয়া হালাল পথেই তাহা খরচ করিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিবেন— ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা আমার নির্দেশিত পথের বাহিরে কোনদিন খরচ করিয়াছে কিনা, ধন-সম্পদের নেশায় মত্ত হইয়া কোনদিন নামাযে, অজুতে, রুকু-সেজদায়, এবাদতে যথার্থ মনোযোগ প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি করিয়াছে কি না? যাকাত অথবা হজ্ব আদায় করিতে গিয়া কোন ত্রুটি হইয়াছে কি না? তাহারা জবাব

২৯২. আল-কুরআন, ৪৪;২৫-২৯
২৯৩. আল-কুরআন, ২৬;২০৫-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

দিবে, আমরা হালাল পথে সম্পদ অর্জন করিয়াছি এবং শরীয়তের সীমারেখার ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কোনই ত্রুটি হয় নাই। পুনরায় বলা হইবে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আত্মীয়-স্বজন আশ-পড়শী এবং যথার্থ হকদারগণের অধিকার সম্পর্কে ইহারা পূর্ণমাত্রায় সজাগ ছিল কি না এবং তাহাদের প্রাপ্য পর শোধ করিতে যাইয়া ইহাদের দ্বারা কোন কমবেশী হইয়াছে কি না? হকদারদিগকেও এই সময় তাহাদের চারিদিকে সমবেত করা হইবে । উহারা তখন যদি এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আয় পরওয়ারদেগার! এই সমস্ত লোক আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান ছিল। আমাদিগকে আপনি ইহাদের মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা আমাদের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিত না। প্রচুর থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে পরিতৃপ্তি সহকারে দান করিত না। তাহা হইলে ততক্ষণাৎ এই সমস্ত লোককে জাহান্নামের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। অথবা বলা হইবে, এইখানে দাঁড়াও, যাহা তোমাদিগকে দান করা হইয়াছিল তাহার প্রতিটি বিন্দুর শোকরগোযারী করার আগে এখান হইতে এক পাও তোমরা নড়িতে পরিবে না।"

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহারা হালাল পথে সম্পদ অর্জন করিয়া আল্লাহর সর্বপ্রকার হক আদায় করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই যদি এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে অবশিষ্ট তিন দল অর্থাৎ যাহারা দিনরাত্রি প্রবৃত্তির আনুগত্য করিয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া হারাম কামাই করিয়া অথবা দিনরাত্রি শুধুমাত্র মালদৌলতের পশ্চাতে ঘুরিয়াই জীবনপাত করিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় হয়, তাহাদের পরিণাম কি হইবে? এই ধরনের লোক সম্পর্কেই তো আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতাজনিত অহংকারে তোমাদিগকে মৃত্যুর মুখামুখি হওয়া পর্যন্ত গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। সাবধান হও! খুব শীঘ্রই ইহার পরিণতি সম্পর্কে তোমরা অবহিত হইবে।"[২৯৪] জীবনের পরিণতি সম্পর্কিত এই মহাসত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়ার পরও অলীক আকাংখা এবং অতৃপ্ত কামনা-বাসনার বেড়াজাল ঐ সমস্ত লোকই শুধু সৃস্টি করিতে পারে, যাহাদের অন্তরজগত শয়তান কর্তৃক পরিপূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের শুভবুদ্ধি শয়তানের চক্রান্তে পরিপূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত লোক কিন্তু শয়তানের দৃষ্টিতেও নিতান্ত হাস্যাস্পদ এবং নিছক খেল-তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্তর মধ্যে যেসমস্ত রোগ শিকড় গাড়িয়া বসে, সেই সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা ঐরূপ প্রত্যেকেরই মৌলিক দায়িত্ব, যাহারা প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে বদ্ধপরিকর। স্মরণ রাখা দরকার যে, শারীরিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার চাইতে আত্মার রোগের চিকিৎসা করা অনেকগুণ বেশী জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই রোগের কবল হইতে শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকই মুক্তিলাভ করিতে পারে, যাহাদিগকে আল্লাহ পাক শুদ্ধ অন্তর এবং নির্ভুল প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন। আত্মার রোগের জন্য সহজ দুইটি ঔষধের একটি হইতেছে সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং মৃত্যু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। এতদসঙ্গে রাজা-বাদশাহ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের পরিণতি হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিভাবেই না তাহারা সম্পদের পাহাড় সঞ্চয় করিয়াছিল, কত শান-শওকতের প্রাসাদরাজিই না তাহারা তৈরী করিয়াছিল। অহংকার আত্মম্ভরিতায় তাহাদের পা মাটিতে পড়িত না, ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া তাহারা জীবন-যাপন করিত! কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তাহাদের সেই সমস্ত হর্মরাজিতে কবরের নিরবতা নামিয়া আসিয়াছে। কালের প্রবাহে একে একে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকার ভাবেই না আমাদিগকে চিন্তা করার আহবান জানাইতেছেন– "ইহারা কি ঐ সব ঘটনা হইতেও পথ নির্দেশ পায় না

২৯৪. আল-কুরআন, ১০২:০১-০৩

Dhaka University Institutional Repository

যে, তাহাদের আগে কত সমৃদ্ধ জনপদের অধিবাসীগণকেই তো আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। উহাদের সেইসব গর্বোদ্ধত প্রাসাদরাজির ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তাহারা চলাফেরা করে, এই সবের মধ্যে নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। এর পরও কি ইহারা মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ করিবে না?" এই সমস্ত লোকের সমৃদ্ধ বাড়ী-ঘর, সুবিস্তৃত রাজ্যসীমা, পরবর্তী বংশধরগণকে যেন ডাকিয়া বলিতেছে যে, এখনও চিন্তা করতঃ ইতিহাসের গতিধারা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। একদা যাহাদের নামে চরাচর প্রকম্পিত হইত আজ তাহারা কোথায় হারাইয়া গেল! তাহাদের কোন খবর কি আজ তোমরা কেহ সংগ্রহ করিতে পার? তাহাদের কোন চিহ্ন কি তোমরা কোনমতে সংগ্রহ করিতে পার? আত্মার রোগের দ্বিতীয় চিকিৎসা হইতেছে আল্লাহর কিতাব নিয়া সর্বদা চিন্তা গবেষণা করিতে থাকা। কেননা, দুনিয়ার মানুষের জন্য কোরআনই একমাত্র সঠিক চিকিৎসা এবং রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা দুইটি উপদেশকে চোখের সম্মুখে রাখার জন্য উম্মতের প্রতি অন্তিম উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশদ্বয় কখনও বাঙময় হইয়া কখনও বা নির্বাক থাকিয়া আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়া চলিয়াছে। এর একটি হইতেছে আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হইতেছে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। আজকাল লোকজনকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবন্ত মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন, ছাড়িয়া দিয়া উহারা মৃতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অনেকে মুখে কোরআন পাঠ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোরআনের পয়গাম সম্পর্কে উহারা বোবা । কানে কোরআনের বাণী শ্রবণ করিলেও উহাদের অন্তরের কান বধির হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়া কোরআনকে দেখিতে পাইলেও উহার মর্মদেশ পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তি পৌঁছিতে পারিতেছে না। অনেকে কোরআনের তফসীর পর্যন্ত বয়ান করিয়া থাকে, কিন্তু নিজেরাই কোরআনের মর্মবাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জাহেল রহিয়া গিয়াছে। আপনাকে সাবধান করিতেছি, খবরদার! ঐ শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত কখনও হইবেন না।

নিজের সকল কাজকর্ম, ভিতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন আর ঐ সমস্ত লোকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন, যাহারা সময় থাকিতে পরিণামের কথা চিন্তা করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু আক্ষেপই তাহাদের জন্য সার হইয়াছে। সঙ্গেসঙ্গে ঐ সমস্ত লোকের সহিত আপনার নিজের আমলের তুলনা করিয়া দেখুন, যাহারা নিজেদের ভবিষ্যত পরিণতির সম্পর্কে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উহাদের আক্ষেপের পরিমাণ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া নিজের কর্মধারা নির্ধারণ করুণ। কোরআন শরীফের একটি আয়াতের মধ্যে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রের জন্যই শিক্ষাগ্রহণের প্রকৃষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের মোহ যেন তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া না রাখে। যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"[২৯৫] খবরদার! খবরদার! সম্পদ সঞ্চয় করার পিছনে লাগিও না। কেননা, সম্পদের নেশা তোমাদিগকে আখেরাতের কাজ হইতে ভুলাইয়া রাখিবে। তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ দূর করিয়া দিবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা দুনিয়াদারদের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। কেননা, উহাদের সম্পদের জৌলুষ তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ কাড়িয়া নিবে।" এতো গেল ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিণতির কথা। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, ধন সঞ্চয় করিয়া পুঁজিপতি হওয়া, ধন-সম্পদের গরমে অহংকারী এবং অবাধ্য হইয়া পড়ার পরিণাম কি

২৯৫. আল-কুরআন, ৬৩;০৯

Dhaka University Institutional Repository

হইবে! মান্যবর কাজী মারওয়ানের কথায় আসা যাক। আল্লাহ পাক তাঁহার এলেম এবং তাকওয়ায় বরকত দান করুন! তিনি আপনার কৃতিসন্তান, আপনার অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধনের উপকরণ। এলেম এবং তাকওয়ার সম্পদে তিনি সমভাবে সমৃদ্ধ। তবে এই উভয় সম্পদই স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই স্থায়িত্ব শুধু তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন তাঁহার পিতা-মাতা এই ব্যাপারে তাঁহাকে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাঁহারা আশা-আকাংখা বাস্তবায়িত করার পথে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। পিতা-মাতার কর্তব্য হইতেছে, জীবন পথে সন্তানের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের আখেরাতের সম্পদ হিসাবে গড়িয়া তোলা। সন্তান যাহাতে আল্লাহর পথে কায়েম থাকিয়া শেষ মনজিল তক পৌঁছার ব্যাপারে শান্ত মনে কোশেশ করিয়া যাইতে পারে, তার সুযোগ করিয়া দেওয়াও পিতা-মাতার অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহর সন্তুষ্টির দরজা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা হইতেছে নিজের সামর্থের উপর পরিতৃপ্ত হইয়া হালাল পথে জীবিকা অন্বেষণ করা। দুনিয়াদারদের অতৃপ্ত লালসার পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া নিজেকে দুনিয়া-পূজারী সম্প্রদায়ের অন্যায় উচ্চাকাংখার সহিত জড়িত না করা। এইরূপ মানসিক শক্তি রাজা-বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহগণের সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়াই অর্জন করা সম্ভব। হাদিস শরিফে আসিয়াছে, প্রাজ্ঞ আলেমগণ আল্লাহর তরফ হইতে আমানতদার। বিশেষ যে পর্যন্ত তাঁহারা দুনিয়ার লালসায় ডুবিয়া না যান। যখন দেখিবে যে, আলেমগণ দুনিয়া কামাই করার পিছনে লাগিয়া গিয়াছে, তখন তোমরা উহাদের সংস্রব হইতে দূরে সরিয়া দ্বীনের পথে সুদৃঢ় থাকার চেষ্টা করিও।"

এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাকই আপনাকে পথ-নির্দেশ দিয়াছেন এবং আপনার পক্ষে পথ সহজ করিয়াও দিয়াছেন। এখন আপনার কর্তব্য হইতেছে ছেলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া তাহার প্রাণভরা দোয়া গ্রহণ করার পথ খুলিয়া দেওয়া। হাদিস শরিফে আসিয়াছে যে, "পিতা-মাতার জন্য সন্তানের নেক দোয়া আখেরাতের জীবনে অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হইবে।" আপনার সন্তান যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং সবকিছু তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া এই বয়সে আপনার পক্ষে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়াই অধিকতর সমীচীন। এলেম এবং তাকওয়ায় বড় হইলে পর সন্তান পিতারও মুরববী এবং শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হইয়া যায়। কোরআন শরীফে হযরত ইবরাহীমের যে উক্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যেই আমার উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যাইবে । হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "পিতাজী! আমার নিকট এমন এক এলেম আসিয়াছে, যাহা আপনার নিকট আসে নাই। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন যেন আমি আপনাকে সহজ সরল পথে নিয়া যাইতে পারি।"[২৯৬] যোগ্য সন্তানের প্রতি আপনার স্নেহ-দৃষ্টি আরও গভীরতর হওয়া উচিত। কেননা, সে আপনারই কলিজার টুকরা। স্মরণ রাখিবেন, হাশরের ময়দানে দুনিয়াদারদের সর্বাপেক্ষা বেশী আক্ষেপ হইবে তখন, যখন তাহারা দেখিবে যে, যে সমস্ত হিতাকাংখী বন্ধুর প্রতি তাহারা খুব বেশী ভরসা করিত, তাহারাই তখন কোন কাজে আসিতেছে না। কেননা, আলাহ তা'আলা পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে, "আজকের এইদিনে এখানে কেহ কাহারো বন্ধু নয়।" আমি দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আপনাদের দৃষ্টিতে দুনিয়াকে তুচ্ছ করিয়া দেন, যাহা সত্য-সত্যই তুচ্ছ। আখেরাতকে যেন আপনার দৃষ্টিতে বড় করিয়া দেন, যাহা প্রকৃত পক্ষেই বড়।আমাকে এবং আপনাকে যেন তাঁহার সন্তুষ্টির পথে আমল করার তওফীক দান করেন। আপনাকে যেন জান্নাতুল-ফেরদাউসে স্থান দান করেন।

---

২৯৬. আল-কুরআন, ১৯:৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-৪

ইমামগণের উদ্দেশ্যে

প্রথম পত্রঃ খাজা ইমাম আব্বাছীকে লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

কোন একজন সাহাবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি মাত্র দুইটি কথার মাধ্যমে সমস্ত উপদেশ একত্রিত করিয়া তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তুমি বল! একমাত্র আল্লাহ আমার রব এবং এই কথার উপর দৃঢ় থাক।[২৯৭] রাব্বী আল্লাহ বা একমাত্র আল্লাহ আমার রব, এই কথার তাৎপর্য হইতেছে, তুমি আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের জাতের প্রতি এমন গভীরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ কর, যেন দুনিয়ার যাহা কিছু সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, এই সবকিছুই তোমার দৃষ্টির সম্মুখে অর্থহীন এমনকি অস্তিত্বহীন হইয়া যায়। একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের ধ্যানেই যেন তোমার হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। দুনিয়ার রকমারি যাহা কিছু চোখের সামনে ভাসিতেছে, প্রকৃতপক্ষে এইগুলির স্বতন্ত্র কোনই অস্তিত্ব নাই। রাব্বুল আলামীনের সত্তার মধ্যেই সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। একমাত্র তাহার অস্তিত্বই চির অক্ষয় অবিনশ্বর। অন্যের তরফ হইতে তোমার দৃষ্টি যতই দূরে সরিতে থাকিবে, আল্লাহর অস্তিত্ব ততই তোমার অন্তরে দৃঢ়মূল হইতে থাকিবে! শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে আসিয়া তুমি পৌঁছিতে সমর্থ হইবে, যখন একমাত্র সেই একক সত্তা ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে না। তোমার অন্তর তাঁহাকে ছাড়া আর কোন কিছুর উপরই আস্থাও স্থাপন করিতে পারিবে না। দৃঢ় থাকার দরজা এর পরবর্তী পর্যায়ে হাসিল হইয়া থাকে। দৃঢ়তা তিনটি বিষয়ে হইয়া থাকে- অন্তরে, অন্তর নিঃসৃত গুণাবলী বা অভিব্যক্তির মধ্যে এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এস্তেকামাত বা দৃঢ়তার অর্থ হইতেছে চলা-ফেরা, নড়া-চড়া, উঠা-বসা সবকিছু যেন শরীয়ত, নির্ধারিত নিয়মের অধীন হইয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই শুধুমাত্র পরিচালিত হয়। চরিত্রে এস্তেকামাত-এর অর্থ হইতেছে, মনকে এমন সুদৃঢ় করা, যেন মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই খাহেশাতের কোন অনুভূতিই সৃষ্টি না হয়। মনের যাহা কিছু প্রেরণা-অনুপ্রেরণা সবকিছুই যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয়। চরিত্রে এস্তেকামাতের অর্থ হইতেছে শরীয়তের ইশারা ব্যতীত নাফসের মধ্যে নিজের তরফ হইতে যেন কোন প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি না হয়। নাফসের মধ্যে এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট না থাকা চাই, যদ্বারা সে আল্লাহর নির্দেশের বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করিতে পারে। যে কোন খাহেশ বা অনুপ্রেরণাকে সুস্থবুদ্ধি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়া নেওয়ার আগে যেন সেই কাজে অগ্রসর হওয়ার মত উৎসাহই আর অবশিষ্ট না থাকে, মনকে সেইভাবে তৈরী করিতে হইবে। মনকে এমনই একটি নিয়মের অধীন করিয়া নিতে হইবে, যে নিয়মের মধ্যে পড়িয়া সৎকর্ম, সৎকথা এবং শরীয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করা কাজ ব্যতীত অন্যকোন কিছুতে সে কখনও আকৃষ্ট না হয়।

নাফস বা প্রবৃত্তির সাধারণ প্রবণতা হইতেছে, লোভনীয় কোনকিছু সম্মুখেকে আসিয়া পড়িলে তাহা হাসিল করার জন্য সে নানা প্রকার বাহানা তালাশ করিতে শুরু করে। নিজেকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, একবার অন্ততঃ করিয়া নেই, পরে আর কখনও করিব না। এই রোগের এলাজ হইতেছে, তুমি পাল্টা নাফসকে বল, এইবার বিরত হও, আবার সুযোগ আসিলে বরং বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। দ্বিতীয়বারও যদি সুযোগ আসে তবে তখনও তুমি

২৯৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল: প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৪১০

Dhaka University Institutional Repository

উহাকে সেইভাবে সান্ত্বনা দাও, নফস যেভাবে তোমাকে ধোকা দিয়া থাকে। অর্থাৎ তুমি এইবারও নাফসকে ডাকিয়া বল, এইবার আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর কোন সময় মওকা হইলে বরং তোমার দাবি মিটানো যায় কি না, দেখা যাইবে। ক্বালবের 'এস্তেকামাত' বা অন্তরের দৃঢ়তা অর্জন করার অর্থ হইতেছে, অন্তর যেন আল্লাহর যিকির এবং সে অনন্ত সত্তার অনন্ত জ্যোতি বিকিরণের রত্নভাণ্ডারে পরিণত হইয়া যায়। অন্তর সদা-সর্বদা যেন এই ব্যাপারে সতর্ক থাকে যাহাতে হৃদয়ের সেই মনিকোঠায় এক আল্লাহর ধ্যান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই স্থান করিয়া নিতে সমর্থ না হয়। যদিও কখনও অন্যকিছু তাহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, যাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, তবে তাহা যেন আশ-পাশেই থাকিয়া যায়, স্থায়ীভাবে হৃদয়মধ্যে বাসা করিয়া বসিতে না পারে। হৃদয়মন্দিরের একান্ত প্রদেশকে সদা-সর্বদা আল্লাহর যিকির ও ধ্যানের মধ্যে সোপর্দ করিয়া দিয়া অন্যসব কাজ-কর্ম অন্তরের স্থল পৃষ্ঠেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। গভীরে প্রবেশাধিকার দেওয়া চলিবে না। মোটকথা, অন্তরকে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্যকোন কাজেই ব্যস্ত হইতে দিওনা। কখনও যদি কোন দুর্ধর্ষ শত্রু সৈন্য তোমার অন্তরদেশ অধিকার করিয়াও ফেলে তবে যথাসম্ভব শীঘ্র তুমি তোমার হৃদয়রাজ্য উদ্ধার করিয়া তাহার মধ্যে আল্লাহর যিকিরের নিরঙ্কুশ চর্চা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর।আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার রবকে ভুলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় স্মরণকর।[২৯৮] হৃদয় মধ্যে যিকিরের প্রভাব গ্রোথিত হইয়া যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই অন্তর, প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করিয়া পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। কখনও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এমন নয়। তবে ভুলচুক হইয়া গেলেও নেকীর পাল্লা ভারীই থাকিয়া যায়। এমনিভাবে অন্তর যদি অধিকাংশ সময় কুচিন্তার হামলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে তবে ক্ষমা এবং আখেরাতে নাজাতের যোগ্য হওয়ার আশাই সমধিক।

দ্বিতীয় পত্রঃ আবুল হাসান মসউদ বিন মুহম্মদবিন গানেমের প্রতি জবাবী পত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

তোমার প্রজ্ঞাপূর্ণ এলেম এবং হৃদয়সুষমার সৌরভমাখা পত্রটি পাইয়া আনন্দাভিভূত হইয়াছি। বেশ কিছুকাল হইতে তোমার কোন লিপি না পাইয়া অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তোমার দীর্ঘ প্রবাস-জীবনে সবসময় আমি তোমার তরফ হইতে পত্রের। অপেক্ষা করিতে ছিলাম। কারণ, পথের মাধ্যমেই সফরের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়ার আগ্রহ জাগিত। যে কঠোর সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তুমি বিদ্যা অর্জন করিয়াছ, সেই অনন্য তপস্যার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি আন্তরিকভাবে পুলকিত হইয়াছি। আমার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় তোমার মধ্যে আমি যে আগ্রহ, উচ্চাকাংখা এবং কঠোর সাধনা সর্বোপরি প্রতিভার ছাপ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার পরিপূর্ণ আশা ছিল, পরবর্তী জীবনেও তুমি সর্বদিকে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া দ্বীন এবং সাধনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কায়েম থাকিতে সমর্থ হইবে। কর্মজীবনেও দ্বীনি কাজ তুমি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আনজাম দিতে পারিবে।

কেননা, সততা এবং সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যে কাজ শুরু হয়, পুর্ণ সাফল্যের মধ্যেই তার পরিণতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি এলমে-ফেকাহ্ এবং সাহিত্যে উচ্চতর পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছ। তবে স্মরণ রাখিও, এলমের ক্ষেত্রে কোন এক স্তরে আসিয়া থামিয়া যাওয়া দুর্বল প্রকৃতির অপরিণামদর্শী লোকের স্বভাব। তোমার কর্তব্য হইয়তেছে

২৯৮. আল-কুরআন, ১৮;২৪

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানরাজ্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে পৌছার চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা। আমি চাই, তুমি যেন অধিত বিদ্যার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া এলমে-ফেকাহর এমন গভীর জ্ঞান অর্জন কর যেন তদ্বারা সাধারণ মানুষ যথার্থ অর্থেই উপকৃত হইতে পারে। এমন এলম আয়ত্ত করার চেষ্টা কর, যাহা সার্বিকভাবে আখেরাতের জীবনে কাজে আসে। . দ্বীনি এলেম শিক্ষা এবাদতের এক চতুর্থাংশ। তাহা ছাড়া এই এলেমের মাধ্যমেই জনসাধারণের আইনগত সমস্যাদির সমাধান দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ, সাধারণ মানুষ সচরাচর লোভ-লালসা এবং রিপুর তাড়নায় পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত জাহেল রিপুতাড়িত লোকদের রকমারি সমস্যাবলীর শরীয়ত-সম্মত সমাধান পেশ করার ব্যাপারে ফেকাহর এলেম বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। তবে এই বিদ্যা সাধারণতঃ খোদায়ী রহস্যাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় না। তবে ফেকাহর এলেম হাসিল করার উদ্দেশ্য যদি হয় বিতর্কমূলক বিষয়াদির ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকৃত সত্য তালাশ করা, তবে তাহার মধ্যে ভুল হইয়া গেলেও একটি সওয়াব রহিয়াছে। আর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলে তার সওয়াব দ্বিগুণ। অবশ্য সেই সওয়াবের ভাগী শুধু তাহারাই হইবেন যাহারা এজতেহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভুল হইয়া গেলেও যেহেতু নেক নিয়তের সঙ্গে প্রকৃত সত্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে মেহনত হইয়া থাকে এই জন্যই একটি সওয়াব তাঁহাদের জন্য অবধারিত থাকে। আর চিন্তা-গবেষণা যদি সঠিক সিদ্ধান্তে গিয়া পৌঁছিয়া যায় তবে তজ্জন্য তাঁহারা দুইটি নেকীর ভাগী হন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা না নিয়াই কিংবা শুধু বিদ্যার জোরে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার হীন আকাংখা নিয়া যে ব্যক্তি ফেকাহ চর্চায় লিপ্ত হয়, তাহার পক্ষে খোদায়ী রহস্যের সন্ধান লাভের সম্ভাবনা নাই। সকল এলেমের শেষ মনজিল খোদায়ী রহস্যজগত পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকের পক্ষে অর্জন করাই সম্ভব, যাহারা অনুভব করিতে পারে আত্মার কোন কোন্ অভ্যাস মুক্তির কারণ হয় এবং কোন্ কোন্ গুলি মানুষকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয় । এলেমের সঙ্গে সেই উত্তম গুণাবলীর সংযোগ ঘটিলেই কেবল আত্মার সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া মানুষকে সর্বনিম্ন স্তর হইতে উদ্ধার করিয়া সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এই গুণই তাহাকে বাতলাইয়া দেয়, কোন সে রাস্তা যে রাস্তায় চলিয়া মানুষের আত্মা পরম প্রিয় এবং চির আকাংখিত মাওলার সকাশে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। পরন্ত সে অবহিতও হইতে পারে যে, সেই পথে চলার অসুবিধাসমূহ কী কী এবং সেই রাস্তার পাথেয়ই-বা কী কী?

স্কুল বিদ্যায় পারদর্শী কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে যদি সেই রাস্তার সামান্য একটু আলোও দেখানো যায়, তবে তাহার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সকল বিদ্যাই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই এলেমের স্বাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন ধারণা করাই সম্ভবপর হয় না। কবির ভাষায় ঃযে পাখী কোনদিন মিষ্টি পানির সন্ধানই পায় নাই সে অবশ্য সবসময় লবণাক্ত পানিতে চঞ্চু ডুবাইয়াই তুষ্ট থাকে। যেহেতু আমি তোমার মেধা-প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ভালভাবে জানি এবং তোমার প্রকৃতির মধ্যে সেই পরম জ্ঞানলাভ করার উপযুক্ততা লক্ষ্য করিয়াছি, তজ্জন্যই শরীয়তের গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কিত সেই এলেম সম্পর্কে তোমাকে একটু সচেতন করিয়া দিলাম মাত্র। আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পত্রঃ একটি সাধারণ পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়া অবিশপ্ত। যাহা কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাই শুদু লা'নতমুক্ত; অবশিষ্ট সবকিছুই অভিশাপের আওতাধীন। উচ্চ পদমর্যাদার মোহ এবং ধন-সম্পদের বিস্তৃতির লোভই সকল দুর্ভাগ্যের বীজ। উপরোক্ত লোভ এবং মোহই সকল সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। সম্পদের যতটুকু আখেরাতের পাথেয় এবং হাশরের সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ততটুকুই শুধু নিরাপদ। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে, একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎপথে অর্জিত সম্পদ কতই না উত্তম। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নেকী, তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্য এবং দ্বীনের প্রতি যথার্থ আনুগত্য প্রদর্শনের একমাত্র উপায় হইতেছে আলেমগণের পক্ষে যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন এবং তাহার মাধ্যমে সত্যিকারের নেক পন্থা অনুসরণ। এই পথেই আলেমগণ আত্মার দুনিয়াতে প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জন করিতে সমর্থ হন। ওয়াস সালাম![২৯৯]

চতুর্থ পত্রঃ খাজা আব্বাছ খাওয়ারেজমকে লিখিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আপনার প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক। দ্বীনি সম্পর্ক এবং এলমের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতেও বড় এবং সুদৃঢ়। আপনার সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক কোন পরিচয় না থাকিলেও আত্মীক পরিচয় যতটুকু লাভ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত গভীর। মানুষের সকল আত্মা একটি অনুশীলনপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর ন্যায়। অন্তরদৃষ্টি সম্পন্নদের দৃষ্টি আত্মার উপরই নিবন্ধ হইয়া থাকে, বাহ্যিক অবয়বের উপর নয়। আমি আপনার কঠোর সাধনা এবং উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথাই অবগত হইয়াছি। এই ভাবিয়া আন্তরিকভাবে আনন্দিত হইয়াছি এবং আল্লাহর শুকুর আদায় করিয়াছি যে,আজও দুনিয়ার বুক এমন সাধক লোক হইতে শূন্য হইয়া যায় নাই, যাহাদের মধ্যে দ্বীনি এলেম, তাসাউফ ও সীরাতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে-কেরামের পরিপূর্ণ অনুসরণের আদর্শ পরিস্ফুট হয়। কেননা, আজকের দিনে উপরোক্ত গুণাবলীর যে কোন একটি গুণ অর্জন করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন উপযুক্ত আলেমের চরিত্রে সবগুলি গুণের সমাবেশ আরও কঠিন ব্যাপার। আপনি যদি এই যোগ্যতা আল্লাহর বান্দাদিগকে দ্বীনের পথে আহবান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ সম্পর্কে পরিচিত করার কাজে ব্যয় করেন, তবে সাহাবায়ে কেরামের পরিপূর্ণ অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে। এই পথেই আপনি সাফল্যের শেষ মনজিল পর্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন। আল্লাহ পাক বলেন, এবং তাহার কথা হইতে উত্তম কথা আর কি হইতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, নিজেও নেক আমল করে এবং বলে, আমি নিশ্চিতরূপে মুমিনগণের। অন্তর্ভুক্ত।[৩০০]

পঞ্চম পত্র ঃ ইবনুল আমেলের পত্রের জবাবে লিখিত ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁহার প্রেরিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম।জনাবের জ্ঞানসমৃদ্ধ বিস্তারিত পত্র পাইয়াছি। পত্রে আপনি যে প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আল্লাহ রাব্বল আলামীনের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার এলেম, মর্যাদা এবং অন্তরদৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে

২৯৯. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫
৩০০. আল-কুরআন, ৪১;৩৩

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। আপনি যেন এলেমের হাকীকত এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হইতে পারেন। এলেম যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রসূলে খোদার (সাঃ) অনুসরণ ব্যতীত অন্যকোন ফল প্রদান করে তবে সেইরূপ এলেম সেই আলেমের পক্ষে অভিশাপে পরিণত হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে বেশী এলেম দান করা হয় এবং সেই এলেম অনুপাতে তার হেদায়েত নছীব না হয়, তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে বহু দূরে থাকিবে।[৩০১]

সেই এলেমই প্রকৃত পথপ্রদর্শক যা তোমাদিগকে সৃষ্টির দিক হইতে ফিরাইয়া সৃষ্টিকর্তার দিকে, দুনিয়া হইতে আখেরাতের দিকে, অহংকার হইতে বিনয়ের দিকে, লোভ-লালসা হইতে ত্যাগের দিকে, লোক দেখানোর মনোবৃত্তি হইতে নিষ্ঠার দিকে, সন্দেহপ্রবণতা হইতে একীনের দিকে, ভোগ-স্পৃহার গোলামী হইতে তাকওয়া -পরহেজগারীর দিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত লোক দ্বীনি এলেমের চর্চায় লিপ্ত আছেন তাঁহারা সকলেই আল্লাহর পথের পথিক। আক্ষেপের বিষয় যে, এই ধারণা সত্য নয়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে এলেমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত, যদি কেহ সেই এলেম দুনিয়ার ফায়দা লাভ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, তবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ হইতেও বঞ্চিত থাকিবে। আলেমগণের পক্ষে এলেম একটি ভয়ের বিষয়ও বটে। ধন-সম্পদ অর্জন করার মধ্যে যেসব ভয়-ভীতির সম্ভাবনা থাকে, এলেম অর্জন করার মধ্যে তাহার তুলনায় অনেক বেশী সম্ভাবনা। কেননা, ধন-দৌলত দুনিয়াদারীরই উপকরণ। দুনিয়ার জীবনে সুখ শান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যেই ধন-সম্পদ অর্জন করা হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বীনি এলেমের সম্পর্ক একমাত্র দ্বীনের সঙ্গে। দ্বীনের সেই এলেম যদি দুনিয়ার ন্যায় তুচ্ছ বস্তু লাভ করার কাজে নিয়োজিত করা হয়, তবে তাহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে। কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন,যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুনিয়া কামাই করা হয়, সেইগুলি ব্যবহার করিয়া যদি কেহ দ্বীন অর্জন করিতে চায়, তবে সেই ব্যক্তি তত বড় অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যত বড় অপরাধী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহারা দ্বীন অর্জন করার উপকরণ সমূহ দুনিয়া অর্জনের জন্য ব্যবহার করে। এর কারণ হইতেছে দ্বীন কামাই করার জন্যই দুনিয়ার উপকরণাদি তৈরী করা হইয়াছে, দ্বীনকে দুনিয়া কামাই করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। দুনিয়া একটি সেবক বিশেষ এবং দ্বীন তাহার সেব্য। যে ব্যক্তি মখদুম সম্মানীকে সেবকের ভূমিকায় নামাইয়া আনিয়া সেবকের সেবায় লাগাইয়া দেয়, সে নিঃসন্দেহে খোদায়ী কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। আল্লাহর নিয়ম নিজের হইতে পরিবর্তিত হয় না। তবে দুনিয়ার বুকে তাহার ছুরত এবং আবরণে পরিবর্তন হইয়া থাকে। চক্ষুর পক্ষে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা তখনই সম্ভব হইবে, যখন এই দুনিয়ার পর্দা তাহার সম্মুখ হইতে উঠিয়া যাইবে। এই দুনিয়ার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়া অন্য জগতের যবনিকা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হইয়া যাইবে। তখন তাহার দৃষ্টিতে কৃত্রিম আবরণ ভেদ করিয়া সবকিছুরই প্রকৃত স্বরূপ ভাসিয়া উঠিবে। আজ যাহা কিছু ভাব হিসাবে প্রকাশমান, তখন সেইসব বস্তুই রূপ ধরিয়া আসিতে থাকিবে। যেমন- লোভী মানুষ নিজেকে সেই সময় গর্দভের আকৃতিতে দেখিতে পাইবে। অহংকারী প্রতিহিংসা পরায়ণেরা নিজদিগকে দেখিতে পাইবে চিতাবাঘের আকৃতিতে। হিংস্র ইতর প্রকৃতির লোকেরা নিজদিগকে হিংস্র চতুষ্পদের আকৃতিতে দেখিবে। যে সব লোক দ্বীনি এলেমকে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করার জন্য ব্যবহার করিয়াছে তাহারাও নিজদিগকে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিকৃত চেহারায় দেখিবে । ফেরেশতাগণ ডাকিয়া বলিবেন, তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আজ সমস্ত পর্দা সরাইয়া নিয়া তোমার দৃষ্টিকে যতার্থ অর্থে তীক্ষ্ণ করা হইল।

---

৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একস্থানে এই তথ্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে, সেইদিন দেখিতে পাইবে, অপরাধিরা পরওয়ারদিগারের সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া বলিবে, আয় রব! দেখিলাম এবং শুনিলাম। এখন আমাদিগকে দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইতে দাও, বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল হইয়া যেন তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি।[৩০২] আল্লাহর তরফ হইতে এই প্রার্থনার জবাব আসবে, আমি কি তোমাকে এতটুকু সময় দেই নাই, যে সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে? তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী সাবধান করার জন্যও আসে নাই? আজ জালেমদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে । এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, আলেমগণকে সেইদিন কি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে যাহারা হাশরের দিন নিশ্চিতরূপেই বিপদগ্রস্ত হইবে, ঐ সমস্ত আলেমদিগকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম দল হইতেছে ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা তাহাদের দায়িত্ব এবং সেই বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। অবশ্য এই ধরনের লোককে নামেমাত্রই আলেম নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের ভাষায়, এই সমস্ত লোকই গাফেল এবং এই গাফিলতির অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হিসাবে নিশ্চয়ই আখেরাতে এই সমস্ত লোক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।[৩০৩]

দ্বিতীয় দল হইতেছে, ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা সেই নিশ্চিত বিপদ সম্পর্কে অবহিত এবং তৎপ্রতি মৌখিক উদ্বেগও প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার কোন চেষ্টা করিতেছে না। ইহারাও ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

তৃতীয় দল হইতেছে, যাঁহারা এলমে দ্বীনের দায়িত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল হইয়া এলেমের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করিয়া থাকেন। এলেমকে দুনিয়া প্রাপ্তির সংস্পর্শে না আনিয়া একমাত্র আল্লাহর মা'রেফাত ও ফরমাবরদারীর পথে নিয়োজিত করিয়া রাখেন। ইহা অবশ্য নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রথম যুগের মহাত্মাগণের অনুসৃত পথ। প্রথম যুগেই এই শ্রেণীর আলেমগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ধন্য সেই সমস্ত নয়ন, যাহারা তাহাদিগকে দেখিয়াছে কিংবা তাঁহাদের সাক্ষাৎপ্রাপ্তগণকে দেখিয়াছে। হায়! যে সমস্ত ভাগ্যবান লোক সচক্ষে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন আমরাও যদি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!

উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী সম্পর্কেই কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে ইশারা করা। হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন, যাহারা স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। আর কিছুসংখ্যক সাবধানী এবং অবশিষ্ট কিছুসংখ্যক আল্লাহর অনুগ্রহে পুণ্যের কাজে অগ্রণী হইয়া থাকে।[৩০৪] দোয়াকরি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে-আপনাকে এখলাসপূর্ণ নিষ্ঠাবান বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং খাস অনুগ্রহের দ্বারা দুনিয়ারদের ধোকা-ফেরেব হইতে পানাহ দান করেন।

ষষ্ঠ পত্রঃ (জনৈক তালেবে এলেমকে তাঁহার অভিভাবকগণ এলেম শিক্ষার পথ হইতে সরাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলে ইমাম সাহেব এলেমের মর্যাদা এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া অনিচ্ছুক অভিভাবকগণকে রাজি করার উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিয়াছিলেন)।

---

৩০২. আল-কুরআন, ৩২;১২
৩০৩. আল-কুরআন, ১১;২২
৩০৪. আল-কুরআন, ৩৫;৩২

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, সৌভাগ্যের প্রত্যাশীগণ এলেম এবং তাকওয়ার মাধ্যমেই তাহার প্রিয় ও মর্যাদাবান হইতে পারে। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে অল্প দুই-একজনই কেবল দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করিয়া এলেম হাসিল করার দিকে মনোযোগী হইয়া থাকে। যে সব লোকের পক্ষে এলেমের প্রতি আগ্রহী হওয়ার তওফীক হয় তাহাদের মধ্যে আবার অল্প সংখ্যকেরই মেধা এলেমের গুঢ়তম রহস্য অনুধাবন করিতে এবং হাকীকতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছার মত যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আবার যাহাদের প্রতিভা এবং অনুধাবনশক্তি দুই-ই আছে তাহাদের মধ্যেও খুব কমসংখ্যকই এমন উন্নত চরিত্র গুণসম্পন্ন হইতে পারে যে, দ্বীনি এলেমকে দুনিয়ার শান-শওকত লাভ করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করিয়া এলেম ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতঃ সাধারণ মানুষের পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন। এই শ্রেণীর মহাত্মাগণ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে আমি ইমামের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছি, যেন আমার নির্দেশ মোতাবেক তাহারা অন্যদেরকে পথের সন্ধান দান করিতে পারে। কেননা, তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছে।[৩০৫]

ইহারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত কখনও হয় না, যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ইহাদিগকে ঐ সমস্ত লোকের বিবরণ পাঠ করিয়া শোনান, যাহাদিগকে আমি নিদর্শন দান করিয়াছিলাম। তৎপর উহারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া গিয়াছে। অতঃপর শয়তান তাহাদের পশ্চাতে এমনভাবে লাগিয়াছে যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা গোমরাহ হইয়া গিয়াছে।[৩০৬] এই ধরনের লোক খুব কমই পাওয়া যায়, যাহাদের প্রকৃতিতে এলেমে পূর্ণতা লাভ করার যোগ্যতা থাকে এবং তাহাদের মন-মেজাজে তাকওয়া গ্রহণ করার উপযোগিতাও রাখে। কারণ, এই পথে যাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহাদের পশ্চাতে এমনভাবে শয়তান মোতায়েন করিয়া দেওয়া হয়, যে শয়তান পদে পদে তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। পরিপূর্ণতার মনজিলে পৌঁছার পূর্বেই তাহার গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য। শয়তান সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে। সচরাচর যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সষ্টি হয়। তন্মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন, সম্পদের স্পৃহা, বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলা এবং পরস্পরের ঝগড়া-ফাসাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির ভূমকাই প্রধান। কোন সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে এই সবগুলিই শয়তান বিশেষ। তোমাদের একটি ছেলে হাতেগোনা কয়েকজন ভাগ্যবানের অন্যতম, যাহাদের মধ্যে এলেম ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণতা অর্জন করার যোগ্যতা দেখা যায়। সুযোগ করিয়া দিতে পারিলে সে কামালিয়াতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে। যাহার কল্যাণময় ফলশ্রুতি দুনিয়া-আখেরাতে সকলের জন্যই শুভ হইবে।[৩০৭]

এখন যদি তোমরা এই সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে অনবরত বাড়ী ফিরিয়া আসার তাগিদ দিতে থাক, তাহাকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান হইতে বিরত রাখ কিংবা সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া রূঢ়তা অবলম্বন কর তবে তোমরা তাহার এলেম শিক্ষার পথে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের মধ্যেই গণ্য হইবে। রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ অপর ভাই-এর বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিও না।" আত্মীয়-স্বজনের সহিত মাঝে-মধ্যে সাক্ষাৎ করা অবশ্য এলেম হাসিল করার পথে বাঁধা হয় না। আমি তাহাকে এই উদ্দেশ্যেই অল্প

৩০৫. আল-কুরআন, ৩২;২৪
৩০৬. আল-কুরআন, ০৭;১৭৫
৩০৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিনের জন্য তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করিতেছি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বহু ছেলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও অল্প কয়েকদিনের অবকাশে বাড়ীতে যায় এবং আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত তহাদের মন হইতে এলেমের আগ্রহই বিলীন হইয়া যায় । তোমাদের প্রতি আন্তরিক শুভকামনার বশবর্তী হইয়াই যাহা কিছু বলার ছিল, সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিলাম। যে ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই কাজ করাই সহজতর হইয়া থাকে। সুসংবাদ সেই সমস্ত লোকের জন্য যাহাদিগকে কল্যাণ লাভ এবং কল্যাণপ্রদ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সপ্তম পত্র। (কাজী ইমাম সায়ীদ এমাদুদ্দিন মুহম্মদ ওয়াযযানকে সুনজর দেওয়ার সুপারিশ করিয়া লিখিত)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

দেশবাসির কল্যাণার্থে আপনার দ্বারা অনুসৃত সুব্যবস্থার অনেক খবর আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। মুমিনগণ পরস্পর একই প্রাণের সমতুল্য- এই দিক বিবেচনায় বিশেষতঃ এলেমের ময়দানে বিরাজমান সাধারণ সম্পর্কের খাতিরেও পরস্পরের পরিচয় নিবিড়তর করা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এলেমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হইতেছে আমাদের অনুসরণীয় পূর্ববর্তী উলামাগণের আদর্শ চরিত্র এবং জীবনাদর্শের অনুকরণ। ইহাই পরকালের জন্য মূল্যবান সম্পদ হইয়া থাকিবে। উম্মতের পক্ষে আলেমগণের অনুসরণ করার মাপকাঠিও সেই চরিত্র অনুসরণের মাপকাঠিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। যদি কাহরো মধ্যে পূর্ববর্তী আদর্শস্থানীয়গণের চরিত্রের যথার্থ ছাপ পরিলক্ষিত হয় তবে তাহার চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। অপরপক্ষে সেই অনুসরণীয় আদর্শ চরিত্রের বিপরীত যদি কাহারো মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট আলেমের পক্ষে এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ বিপদে আক্ষেপ প্রকাশ করা প্রত্যেক সচেতন লোকেরই কর্তব্য। অপ্রয়োজনীয় পত্র আদান-প্রদানও যেহেতু এক ধরনের লৌকিকতা, সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যতীত আমি সাধারণতঃ পত্র লিখিতে উদ্বুদ্ধ হই না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাহাদের অধিকাংশ আলোচনার মধ্যেই কোন কল্যাণ নাই। তবে দুস্থদের সাহায্য, সৎকর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মানুষের মধ্যে সংস্কার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে যেসব আলোচনা হয়; সেইগুলি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩০৮]

পারস্পরিক পত্র আদান-প্রদানও এক ধরনের আলোচনা বৈ আর কিছু নয়। সুতরাং অর্থহীন পত্রের ব্যাপারেও কোরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আজকের এই পত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে, একজন যোগ্য প্রতিভাবান মোত্তাকী আলেমর প্রতি আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইনি বহুগুণে গুণান্বিত একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি একটি জরুরী কাজে আপনার এলাকায় যাইতেছেন। ইহার প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি এবং আন্তরিক সদ্ব্যবহার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ হইয়া থাকিবে। এমন একজন আলেমের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন যেমন অফুরন্ত নেকীর কারণ হইবে, তেমনি আমাদের সকলের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতা ও নেক দোয়ারও কারণ হইয়া থাকিবে।

অষ্টম পত্র ঃ মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিক, যুহদ ও তাকওয়ার ব্যাখ্যা এবং চরিত্র গঠন সম্পর্কিত মূল্যবান উপদেশ সম্বলিত একটি সাধারণ পত্র।

৩০৮. আল-কুরআন, ০৪;১১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

দ্বীনের পথে অনেক দুর্গম কঠিন আবর্তের সম্মুখীন হইতে হয়। পথ-পরিক্রমার সবগুলি ঘাঁটি মোটামুটিভাবে দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় জীবনের ব্যবহারিক - দিক, দ্বিতীয় অধ্যায় আল্লাহর মারেফাতের দিক। ব্যবহারিক জীবনের শুরুর কথা হইতেছে হালাল খাদ্য গ্রহণ আর শেষ মজিল হইতেছে– সকল আমলের মধ্যে এখলাস সৃষ্টি করা। এই শেষ মজিলটি অতিক্রম করার পরই মারেফাত অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই অধ্যায়ের প্রথম শিরোনাম হইতেছে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর হাকীকত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লামের পবিত্র যবানে এই হাকীকত নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "সৃষ্টির আদি পুস্তকের মধ্যে প্রথম যে কথাটি আল্লাহ রাব্বল আলামীন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে, আমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। আমার রহমত ক্রোধ হইতে বিস্তৃততর।"[৩০৯] ব্যবহারিক জীবনের পৃষ্ঠাতেও এই একই কথাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তবে তাহা শুধুমাত্র আকীদার স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। মারেফাত অধ্যায়ে এ কলেমার হাকীকত যেভাবে প্রকাশমান হইতে থাকে, ব্যবহারিক জীবনে সচরাচর তা হয় না। ব্যবহারিক জীবনের সকল শর্তাদি পূরণ করিয়া মারেফাত অধ্যায়ে প্রবেশ করার পরই বাকলের ভিতর হইতে যেভাবে ফলের প্রয়োজনীয় অংশটুকু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে; ঠিক তেমনিভাবে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া উপরোক্ত কলেমার হাকীকতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর হয়। মারেফাত অধ্যায়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করাই ভাল। কারণ, সাধকগণ এই অধ্যায়ের যেসব স্তর একে একে অতিক্রম করিতে থাকেন, সেইগুলি ব্যাখ্যা বা বর্ণনার ব্যাপার নয়। যাহারা এই মজিলে পৌঁছিতে পারেন নাই তাহাদের নিকট উহা বোধগম্য হয়। এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া শত্রুতা ক্রয় করিয়া লওয়ারই নামান্তর মাত্র। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনের অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা বিস্তারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা সাধারণের জন্য লাভজনকও বটে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জীবনের এই অধ্যায়ের সূচনা হয় হালাল খাদ্য হইতে। হালাল রোজী এবং জীবনযাত্রার মধ্যেও যুহদ ও তাকওয়ার চারিটি স্তর রহিয়াছে।

প্রথম জায়েযের স্তর। যতটুকু তাকওয়া থাকিলে শরীয়তের আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয় বা কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে অন্ততঃ ততটুকু তাকওয়া অর্জন করা। সাধারণভাবে ফেকাহর আলেমগণ যেসব জিনিষকে হারাম ফতোয়া দিয়া থাকেন, অন্ততঃ ততটুকু হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে এই স্তর হাছিল করা যায় ।

দ্বিতীয়স্তর হইতেছে, সৎকর্মশীলগণের যুহদ ও তাকওয়া। এই স্তরের তাকওয়া অবলম্বন করিয়া সঙ্কর্মশীল নেক লোকগণ সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে সরাসরি হারাম না হইলেও যে সব জিনিষে সন্দেহের অবকাশ, রহিয়াছে, ঐগুলি তাঁহারা কখনও ব্যবহার করেন না । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা কয়েকজন সাহাবীকে বলিয়াছিলেন, "মুফতীগণ কোন বস্তুর স্বপক্ষে ফতোয়া দেওয়ার পরও তুমি তোমার অন্তরের নিকট হইতে ফতোয়া গ্রহণ করিও"। অন্য এ প্রসঙ্গে এরশাদ করিয়াছেন, "যাহা কিছু তোমার নিকট সন্দেহজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা সন্দেহমুক্ত তাহা গ্রহণ কর।"[৩১০] এই স্তরের যুহদ-তাকওয়া ফরয নয়, তবে ফযিলতের বিষয়। যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, অফুরন্ত ফযিলত লাভ করিতে সমর্থ হন।

---

৩০৯. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী; আস-সহীহ (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, স. বি. তা. বি. হাদীস নং- ৬৮৬৪)

৩১০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়স্তর প্রকৃত মোত্তাকীগণের যুহদ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম এরশাদ করিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি সেই পর্যন্ত মোত্তাকী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে সন্দেহমুক্ত বিষয় সমূহও শুধু এই আশংকায় ছাড়িয়া না দেয় যে, হয়ত শেষ পর্যন্ত উহাতে সন্দেহের কিছু বাহির হইয়া আসিতে পারে।"

হযরত আবু বকরের (রাঃ) দৃষ্টান্ত এই ব্যাপারে স্মরণ করা যাইতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই যেন বলিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি মুখের মধ্যে পাথরের টুকরা পুরিয়া রাখিতেন। তাঁহার ভয় ছিল, অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ করিয়া যদি মুখ হইতে কোন অশোভন কথা বাহির হইয়া পড়ে! একদিন হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে আসিয়া অনুভব করিলেন, হাতের অঙ্গুলী হইতে মেশ্‌কের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, বাইতুল মালের মেশ্‌ক বন্টন করার সময়ই এই সুগন্ধ তাহার হাতে লাগিয়াছিল, যাহা তখনও রহিয়া গিয়াছে। এই গন্ধটুকুর মধ্যে দোষের কোন স্পর্শও ছিল না তথাপি হযরত ওমর মাটিতে ঘষিয়া এমনভাবে হাত ধুইলেন, যাহাতে মেশ্‌কের গন্ধ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় । বাইতুল মালের কস্তরীর এতটুকু গন্ধও তিনি নিজের জন্য বিধেয় মনে করেন নাই। তাঁহার ভয় ছিল, সামান্য ব্যাপারে কঠোর না হইলে হয়ত শেষ পর্যন্ত এর চাইতে বড় বিষয়ও গা-সওয়া হইয়া যাইবে ।

চতুর্থস্তর হইতেছে, সিদ্দীকগণের যুহদ ও তাকওয়া। আল্লাহর রাহে চলিতে গিয়া যতটুকু প্রয়োজন তাহার বাহিরে অন্যান্য হালাল মোবাহ সবকিছু পর্যন্ত নিজেদের জন্য ইহারা হারাম সাব্যস্ত করিয়া নেন। ইহারা আহার করেন আল্লাহর জন্য অর্থাৎ এবাদত-বন্দেগির শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে; রাত্রে একটু আরাম করেন শুধু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার মত শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে। তাহারা মুখ খুলেন আল্লাহর যিকিরের নিয়াতে, নিরব হন ধ্যানমগ্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের প্রতিটি অভিব্যক্তি হইতেই তীক্ষ্ণব্যক্তিত্ব ফুটিয়া বাহির হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁহারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিয়োজিত রাখেন। জীবন পুস্তকের ব্যবহারিক অধ্যায়ে হালাল ও হারাম সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর তিনটি স্তরের সম্মুখীন হইতে হয়।[৩১১]

প্রথমতঃ যাহারা প্রকাশ্যে হারাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথম স্তরের যুহদ-তাকওয়া অর্জন করিতে সমর্থ হন; ইহারা সংসার জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া মধ্যমপন্থায়। জীবন-যাপন করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা এই মধ্যম স্তরটুকুও অর্জন করিতে পারে না বা এতটুকু অর্জন করার বাপারে আলস্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহারা জালেমদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা প্রথমস্তরের তাকওয়া অর্জন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, বরং অগ্রসর হইয়া আরও উন্নতি করিতে চায়, তাহারা প্রথম যুগের বুযুর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যাহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয়স্তর অতিক্রম করিয়া চতুর্থস্তর অর্থাৎ সিদ্দীকগণের তাকওয়া অর্জন করার সাধনায় অবতীর্ণ হন, তাহারা প্রথম যুগের সর্বাগ্রগণ্য মহাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

আখেরী যমানায় অবশ্য সিদ্দীকগণের স্তরে পৌঁছার আকাংখা বাস্তবায়িত হওয়া খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভব ব্যাপার। তবে এইরূপ আশা করা যে, যে সমস্ত লোক এই ফেতনার যুগেও প্রথমস্তরের সাধারণ যুহদ-তাকওয়া অর্জন করিতে সমর্থ হইবে তাহাদিগকে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মর্তবা দেওয়া হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন"শীঘ্রই মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন তোমাদের এক দশমাংশ আমলও যদি কেহ করিতে পারে তবেই মুক্তি পাইয়া যাইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, এই মর্তবা পাওয়ার অর্থ

৩১১. প্রাগুক্ত. পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

কী? জবাব দিলেন, "কেননা, তোমরা তো নেক কাজ করার ব্যাপারে অনেক সহায়তা পাইয়া থাক। এক শ্রেণীর লোক এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, "যাহারা কৃষি অথবা, ব্যবসায়ের আয়ের উপর জীবন-যাপন করে তাহারা মুক্তি পাইবে, আর যাহারা সরকারী বৃত্তি ভোগ করে বা যে কোনভাবে শাসক সম্প্রদায়ের তরফ হইতে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাহারা সকলেই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত, এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা, ব্যবসার মধ্যেও নানা দোষের সংমিশ্রণ হইয়া থাকে। তাই ব্যবসার আয় এবং ব্যবসার ধরণ সম্পর্কেও সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। রাজা-বাদশাদের মালের ব্যাপারেও সাবধানতা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ইহাদের সম্পদ তিন প্রকার হইয়া থাকে।[৩১২]

প্রথম প্রকারঃ যেসব মাল জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়, জবরদস্তিমূলকভাবে জরিমানা আদায়, সীমাতিরিক্ত কর প্রভৃতির আয় হইতে বৃত্তি বা ভাতা গ্রহণ করা যাইবে না।

দ্বিতীয় প্রকারঃ কিন্তু শাসক যদি সুবিচারক হয় এবং নিয়ম মাফিক কর রাজস্বের বাহিরে জুলুমের কোন অর্থ তাঁহার নিকট না থাকে তবে এইরূপ শাসকের বৃত্তিভাতা গ্রহণ করিতে দোষ নাই। যাহারা গ্রহণ করেন, তাহারা মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিবেচিত হইবেন, জালেম বলিয়া চিহ্নিত হইবেন না। জায়গীরদারীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য হইবে। আইনসিদ্ধ পন্থায় জায়গীর লাভ করিয়া উহার আয় দ্বারা ভরণ-পোষণ হইলে মধ্যপন্থীদের তাকওয়া-পরহেজগারীতে কোন ক্ষতি হয় না।

তৃতীয় প্রকার হইতেছে, যে সম্পদ জুলুম করিয়া সঞ্চয় করা হয় কিংবা প্রজা সাধারণের নিকট হইতে যাহা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয় এই শ্রেণীর মাল সম্পূর্ণ হারাম। এইরূপ মাল কোন মোত্তাকী লোকের জীবিকা হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইল, যদি কেহ এই ধরনের মালের উত্তরাধিকারী হয় কিংবা পরোক্ষভাবে যদি উপরোক্ত শ্রেণীর হারাম মাল কাহারো হাতে আসিয়া পড়ে তবে সেই মাল কী করিতে হইবে? এই শ্রেণীর মালের প্রথম হক হইল, যাহাদের মাল ছিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায়, কিংবা কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে তোহফা-হাদিয়া বাবদ এইরূপ মাল আসিয়া পড়ে, তবে সেই মাল দ্বারা কোন জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে অথবা আলেম-দরবেশগণের প্রয়োজনে বিলাইয়া দেওয়া উচিত। কেননা, মাল ফেরৎ দিলে ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে। হয়ত সেই মাল আরও অধিকতর জুলুম বা কোন পাপ কাজে মদদ দেওয়ার পথে ব্যয় হইতে পারে। এইরূপ মাল যাহার হাতে আসে সে যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার জরুরী প্রয়োজন মিটানোর পরিমানে ব্যয় করিতে পারে। অবশিষ্ট অংশ ফকীর-দরবেশ ও তালেবে-এলেমগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। যদি ধনী হয়, তবে নিজের জন্য মোটেও খরচ না করিয়া সবটুকুই আলেম-দরবেশগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া উচিত। যে দরিদ্র আলেম বা দরবেশ উপরোক্ত ধরনের মাল হইতে নিজের জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্য খরচ করে, সেই ব্যক্তিও মধ্যমপন্থী মোত্তাকীগণের মধ্যেই শুমার হইবে-জালেম বিবেচিত হইবে না। এক ব্যক্তি আমাদের খানকায় অবস্থান করিত। তাহার চরিত্র খুবই উন্নত ছিল। পরিবার-পরিজনের ব্যয় ভার বাড়িয়া যাওয়ার পর আমরা তাহাকে সরকারী ওয়াকফ এবং বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন মিটানোর অনুমতি প্রদান করিয়াছি।[৩১৩]

---

৩১২. প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

৩১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩

Dhaka University Institutional Repository

আজকের যুগে উলামা এবং দরবেশগণের পক্ষে পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা এতই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকের পক্ষেই পেরেশানীর শিকার হইতে হইতেছে। সকল ভাইদের প্রতি আবেদন, এই শ্রেণীর লোকের সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। মাশায়েখগণের পক্ষেও এই শ্রেণীর লোকের আর্থিক অসুবিধার প্রতি খেয়াল করা দরকার। সবাইর প্রতি সালাম।[৩১৪]

অনুচ্ছেদ-৫

আলেমগণের উদ্দেশ্যে

অমূল্য উপদেশাবলী ও আলেমগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ চাওয়া এবং উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু তাহা কবুল করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যাহারা এলেম-চর্চায় নিয়োজিত তাহাদের পক্ষে কঠিনতর। কেননা, তাহারা মনে করে, এলেমই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণতঃ ইহারা আমলের ব্যাপারে উদাসীন, অথচ আমলের প্রতি তাহাদেরই বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমলের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, এলেমের প্রতি নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, "হাশরের দিন সেই সমস্ত আলেমকে সর্বাপেক্ষা। কঠিন শাস্তি প্রদান করা হইবে, যাহাদের এলেম দ্বারা কোন ফায়দা হয় নাই। সুতরাং যে সমস্ত জ্ঞানী হাশরের দিন সৌভাগ্যবান হইতে চায় এবং এলেম তাহার জন্য ক্ষতির কারণ না হউক এরূপ আকাংখা রাখে, তাহাদের পক্ষে চারিটি বিষয় হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। কখনও বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কেননা, ইহাতে অর্থহীন মেহনত ছাড়া আর কোন ফায়দা হয় না। অনর্থক বিপদ ডাকিয়া আনাই সার হয়। ইহা চরিত্র হননের উৎসও বটে। রিয়া, হাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, এবং আত্মম্ভরিতার ন্যায় অনভিপ্রেত দোষগুলি এর মাধ্যমেই বেশী করিয়া সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। অবশ্য যদি কোন বিষয় বুঝিতে অসুবিধা হয় এবং তাহা জানা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তবে সেই বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝিয়া নেওয়ার নিয়তে বহস-মুনাযারা করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রেও নিয়ত ঠিক আছে কিনা, তাহা যাচাই করার দুইটি পথ রহিয়াছে।[৩১৫]

প্রথমত: যদি বিরুদ্ধবাদীর মুখ হইতে হক প্রকাশিত হয় এবং তাহার যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহা মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে যেন কোন প্রকার দ্বিধা না আসে।

দ্বিতীয়ত: প্রকাশ্যে লোক ডাকিয়া বিতর্ক করার পরিবর্তে নিরিবিলিতে যদি বিতর্ক করায় আগ্রহ বেশী হয়।

অন্যের সম্মুখে ওয়ায-নসিহত করিতে যাইও না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল, "হে মরিয়ম তনয়! সর্বপ্রথম তুমি তোমার নাফস্‌কে উপদেশ প্রদান কর। সে যদি পরিপূর্ণ রূপে সেই নসিহত কবুল করিয়া নেয়, তবে অন্যএ লোককে উপদেশ দিও। তাহা না হইলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।হযরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত এই নির্দেশটুকু খুব ভালভাবে স্মরণ রাখিও। যদি আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদের মধ্যে উপদেশ প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে সুর করিয়া কথার মিল সৃষ্টি করার জন্য ছন্দোবন্ধ কথা বলা বা ভাষা প্রয়োগের বাহাদুরী দেখাইয়া লোককে তাক লাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিও না। মনে রাখিও, আল্লাহ তা'আলা কৃত্রিমতার আশ্রয় গহণকারীদিগকে পছন্দ করেন না। কবিতার। ছন্দে কথা বলা এবং ভাষার বাহাদুরী প্রদর্শন অন্তরের খারাবির পরিচায়ক। উপদেশ দেওয়ার অধিকার শুধু তাহারই রহিয়াছে, যে ব্যক্তির অন্তরে আখেরাতের ভয়াবহ আযাব-গযব সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া মহব্বতের সহিত অপরাপর

৩১৪. প্রাগুক্ত

৩১৫. মুহিউদ্দীন খান: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

সকলকে সেই বিপদ হইতে সাবধান করার আগ্রহ পয়দা হয়। এমতাবস্থায় যেরূপ ভাষা ব্যবহার করা দরকার তাহার মধ্যে সুর-তাল-মান বা কাব্যকরার অবকাশ কোথায়? [৩১৬]

মনে কর, এক ব্যক্তি দেখিতে পাইল, বন্যার পানি ছুটিয়া আসিয়া ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। একটু পরই তাহা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভয়ানক বিপদের সৃষ্টি করিবে। এমতাবস্থায় ঘরের ভিতরে নিদ্রিত মানুষকে ডাকিয়া আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সাবধান করার জন্য কি ছন্দোবন্ধ কথার ফুলঝুড়ি সৃষ্টি করা শোভন হইবে?। আখেরাতের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে অন্তরের মধ্যে যে ভয় সৃষ্টি হয়, সেই সম্পর্কে অন্যকে সাবধান করার নামই ওয়াজ। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ সেই ভয়ের কথা যেরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই ভাষাতেই উপদেশাবলী উচ্চারণ করা উচিত। ওয়াজ করার সময় অন্তরে যেন ঘুর্ণাক্ষরেও এমন ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, তোমার ওয়াজ শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণের তরফ হইতে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হউক, লোকে বাহ! বাহ! করুক। চারিদিকে প্রশংসাবাণীর স্রোত প্রবাহিত হউক, লোক তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া যেন বলিতে শুরু করে যে, আহা- হা! কি অপূর্ব ওয়াজই না করিলেন, এমন অপূর্ব বক্তৃতা আর শুনি নাই! এইরূপ ধারণা মনে স্থান দেওয়া রিয়াবারী এবং গাফেল অন্তরের দলিল। বক্তৃতার সময় অন্তরে শুধুমাত্র আকাংখা এবং প্রত্যয় থাকা চাই যে, মানুষের অন্তরে যেন দুনিয়া হইতে আখেরাতের দিকে, লোভ-লালসা হইতে যুহদ-তাকওয়ার দিকে, গাফলতের নিদ্রা হইতে জাগরণের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। মাহফিল হইতে উঠিয়া যাওয়ার সময় যেন অন্তরে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়া বাহির হইতে পারে। ওয়ায়েজের মধ্যে মনের এমন আকাংখা যেন জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহর যে সমস্ত নির্দেশ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা যেন নতুন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়। গোনায় লিপ্ত মানুষ যেন সেই গোনাহ হইতে দূরে সরিয়া আসার প্রেরণা লাভ করে, সার্বিকভাবে যেন মানুষের অন্তর আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যে ঝুঁকিয়া পড়ে। ওয়াজের দ্বারা যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, ওয়াজ শ্রবণের পর মানুষের মধ্যে যদি কোন প্রকার পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে দেখা না যায়, তবে সেই ওয়াজ বয়ানকারী এবং শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। সরকারী . কর্মকর্তাদের সহিত উঠা-বসা এবং চলাফেরা করার আকাংখা যেন জাগ্রত না হয়। কেননা সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে চলা-ফিরা এবং উঠা-বসার বিপদ অত্যন্ত ব্যাপক। যদি কেহ সরকারী সান্নিধ্যের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উচিত, শাসকগণের তারিফ করার ব্যাপারে যেন সাবধানতা অবলম্বন করে। কেননা, কোন ফাসেকের তারিফ করা হইলে অথবা কোন জালেমের জন্য আয়ু বৃদ্ধির দোয়া করা হইলে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত রাগান্বিত হন বলিয়া হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা এর দ্বারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নাফরমানিকেই সে সমর্থন করিল। কোন সরকারী বৃত্তি গ্রহণ করিও না। হালাল হইলেও তাহা এই জন্য গ্রহণ করা উচিত নয় যে, সরকারী বৃত্তির দ্বারা জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন এবং লোভ-লালসা বৃদ্ধির সূচনা হইয়া থাকে, দ্বীনি জীবনে নানা প্রকার ফাসাদের সূত্রপাত হয়। জুলুম-অত্যাচারের প্রতি নিরব সমর্থন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করিতে হয়। প্রতিবাদ কিংবা কঠোর ভাষায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করার সৎসাহস লুপ্ত হইয়া যায়, আলেমের পক্ষে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আলেমগণের পক্ষে উপরোক্ত চারিটি বিষয় হইতে দূরে সরিয়া থাকার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত চারিটি বিষয় উত্তমরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৩১৭]

---

৩১৬. প্রাগুক্ত

৩১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮

Dhaka University Institutional Repository

(এক)

সকল মানুষের সঙ্গে এমন উত্তম ব্যবহার করিবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি অন্য লোকের নিকট সাধারণতঃ কামনা করিয়া থাক । কেননা, "কাহারও ঈমান সেই পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে, অপরের জন্যও তাই পছন্দ করিতে না পারে।"

(দুই)

আল্লাহর সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক তাহা তুমি এমনভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, তোমার একটি কিনা গোলামের পক্ষ হইতে তুমি যেমন আনুগত্য, কর্তব্যপরায়নতা এবং সেবা আশা করিয়া থাক। গোলামের যতটুকু অবাধ্যতা, আলস্য বা অমনোযোগ তোমার নিকট অভিপ্রেত নয়, আল্লাহর বন্দেগির মধ্যে এতটুকুও তুমি নিজের জন্য বিধেয় বলিয়া মনে করিও না।

(তিন)

এলেম চর্চাকালে সব সময় তুমি এমন এলেমের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান। করিবে, যে এলেম তোমার আখেরাতের জীবনে কাজে আসিবে। মনে কর, কোন উপায়ে যদি তুমি জানিতে পার যে, আজ হইতে সাতদিন পরই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবে তখন এই সাতদিন কি তুমি কাব্য, গল্প কিংবা দর্শনের জটিল সমস্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করিবে না মৃত্যু, মৃত্যুর পরের জীবন এবং আখেরাতে নাজাত লাভ হইতে পারে যে এলেমের দ্বারা, তাতে মনোযোগী হইবে? ঠিক তদ্রুপ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসিতে পারে, এই প্রত্যয় অন্তরে রাখিয়া অপ্রয়োজনীয় বিদ্যা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধির উপায়-উপকরণাদির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি, সকল প্রকার অনাচার হইতে পাক-সাফ হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই সকল সাধনা নিয়োজিত করিয়া রাখিবে কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ খবর পায় যে, সপ্তাহ দিনের মধ্যেই বাদশাহ তাহার বাড়ীতে আসিবেন, তখন সেই ব্যক্তি অতি অবশ্যই সব কাজ-কারবার ত্যাগ করিয়া বাদশাহর অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়নের আয়োজনে লাগিয়া যাইবে । বাড়ী-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করণ, বাদশাহর বসার আয়োজন এবং কাপড়-পোশাক পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করণের মধ্যেই তাহার সকল সাধনা নিয়োজিত হইবে। উপরোক্ত ভূমিকার আলোকে চিন্তা করিয়া দেখ, "আল্লাহ তোমাদের অবয়ব বা কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি দেন না, তিনি দেখেন শুধু তোমাদের অন্তর।"[৩১৮] সুতরাং অন্তরকে কতটুকু সুসজ্জিত করা প্রয়োজন। জাহেরী আমল এবং শেকেল-ছুরত সুসজ্জিত করিয়া মুক্তিলাভ কখনও সম্ভব হইবে না। আত্মা বা অন্তরের ধ্বংসাত্মক বিষয়াদিই-বা কী কী, তাহা সবিস্তারে এহইয়াউ-উলুম, কিমিয়ায়ে সাআদাত এবং জাওহারুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব কিতাবে বর্ণিত এলেমই তোমার পক্ষে জরুরী। অন্যসব বিষয়ে মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে অহংকার, বিদ্যার বড়াই এবং অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটা ছাড়া আর কিছু নয়। মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া এইসব বিদ্যা চর্চায় আখেরাতের কোন ফায়দা নাই।

(চার)

দুনিয়ার জীবনে শুধু ততটুকু সম্পদ অর্জন কর, দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যতটুকুতে তোমার পক্ষে কোন বিপদের সৃষ্টি করিতে না পারে। যতটুকু তোমার দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন এবং আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করার জন্য কাজে আসিতে পারে, সেইটুকুর মধ্যেই প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এতটুকু রিজিকের জন্যই দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "আয় আল্লাহ! মোহাম্মদের পরিবারের জন্য ততটুক খাদ্য দাও, যতটুকুতে তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করিয়াছে, সে মৃত লাশ হাসিল করিয়াছে; কিন্তু সে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না।[৩১৯]

---

৩১৮. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী; প্রাগুক্ত

৩১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তাসাউফ শাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান

অনুচ্ছেদ-১

তাসাউফের পরিচয়

মরমিবাদই মুসলিম দর্শনে সূফীবাদ নামে খ্যাত। সূফীবাদ মহান আল্লাহর প্রেম, ভালোবাসা ও ধ্যানভিত্তিক একটি আধ্যাত্মিক মতবাদ। আল্লাহ তায়ালার নিগূঢ় রহস্য অনুসন্ধান, আত্মার পবিত্রতা এবং তাঁর সাথে মানবাত্মার মহামিলনের ওপর ভিত্তি করেই এ মতবাদের উদ্ভব। পরম সত্তাকে জানার অদম্য প্রয়াসই হচ্ছে সূফীবাদের মূল উদ্দেশ্য।

সূফীবাদের পরিচয় :

ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সূফীবাদ অন্যতম স্থান দখল করে আছে। নানান প্রতিকূলতা ও সংস্কার শেষে আত্মিক সাধনা এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি হিসেবে এ মতবাদটি বর্তমানে প্রায় সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। নিম্নে সূফীবাদের পরিচয় এবং এর স্বরূপ আলোচনা করা হলো।

ক. উৎপত্তিগত সংজ্ঞা : সূফী শব্দটি আরবি "صوف " শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পশম।[৩২০] সূফীগণ পার্থিব ভোগবিলাস ত্যাগ এবং কৃচ্ছতাপূর্ণ জীবনের প্রতীক হিসেবে পশমি পোশাক পরিধান করতেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হতো। অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্ন মতেরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

১. মোল্লা জামী (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, আরবি " صفا "শব্দ হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি। আর সাফা শব্দের অর্থ- পবিত্রতা।[৩২১] সূফীগণ আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের সাধনা করেন এবং পবিত্র জীবনযাপন করেন। সূফীবাদের সাধনা মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও পাপ থেকে পবিত্র রাখে এবং হৃদয়ে পবিত্র আলো জ্বালিয়ে দেয়। এজন্য এ মতবাদের ধারক ও বাহকগণকে সূফী বলা হয়।

২.পাশ্চাত্যের কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, সূফী শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Sophia'থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রিক ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সূফীগণ আত্মজ্ঞান অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত থাকেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হয়।

৩. সাময়ানীর মতে, সূফী শব্দের উৎপত্তি বনু সাফা থেকে। কারণ বনু সাফার সদস্যগণই গোড়ার দিকে সূফী ধারার সাধনায় বেশি অগ্রণী ছিলেন।

৪. কেউ বলেছেন, সূফী শব্দটি "الصف الاول " থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো প্রথম সারি।[৩২২] সূফীবাদের সাধনা মানুষকে প্রথম সারির মানুষে পরিণত করে বলে এ শব্দ থেকে সূফী নামকরণ করা হয়।

৫. একদল গবেষকের মতে, সূফী শব্দটি " اهل الصفة "থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।" اهل الصفة " ছিলেন মহানবী (স.)-এর সেসব সাহাবী যারা সংসার জীবন ত্যাগ করে মসজিদে নববীতে জ্ঞান চর্চা ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। মহান এ সাহাবীগণের সঙ্গে সূফীগণের ধ্যানমগ্নতার সাদৃশ্য বিবেচনা করে তাদেরকে সূফী বলা হয়।

---

৩২০. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান:*ব্যবহারিক অভিধান(বাংলা,ইংরেজী,আরবী)*,(ঢাকা:রিয়াদ প্রকাশনী,প্রথমপ্রকাশ-২০০২ইং),পৃ.৩০৫

৩২১. *Student's Arabic-English Dictionary:* (Boirut: First Publication-1900, Page-324)

৩২২. ibid, Page-522

Dhaka University Institutional Repository

৬. আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন–"تصوف "শব্দটি মূলতঃ س যুক্ত ছিল। তার মূল-ধাতু سوف গ্রীক ভাষায় سوف এর অর্থ হল হিকমত তথা প্রজ্ঞা। দ্বিতীয় শতকে যখন গ্রীকদের দর্শন ব্যাপকভাবে আরবী ভাষায় অনুদিত হতে লাগল, তখনই মূলতঃ এই শব্দটি সংযোজিত হয় আরবী ভাষায়। দার্শনিকদের মত সূফীগণও যেহেতু বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিতেন, তাই তাদের বলা হত "سوفي " অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। ধীরে ধীরে এই سوفي শব্দটি صوفي তে পরিণত হয়। আল্লামা আবু রাইহান আল-বেরুনী তার 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'কাশফুজ জুনুন'-এ এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।[৩২৩]

৭.মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) বলেন-"তাছাওওফ (تصوف) শব্দটি কোথা হইতে আসিল? তাছাওফ (تصوف) শব্দটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মোহাক্কেকীনদের মতে শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে (صفو) ধাতু হইতে ।এখানেقلب مكفي হইয়াছে অর্থাৎ باب تفعل এ নিয়া শেষের واو কে মাঝখানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আরবী ভাষার অনেক বিশেষত্ব আছে, তন্মধ্যে একটি বিশেষতু এই যে, খুব বেশীর অর্থ উৎপাদন করাইতে হইলে অন্যান্য ভাষায় অন্য একটি বিশেষণ শব্দ বাড়াইতে হয়। যেমন- মহাপন্ডিত, মহাজ্ঞানী, ইত্যাদি। কিন্তু আরবী ভাষায় অন্য শব্দ বাড়ান ব্যাতিরেকে একই শব্দের ভিতর অক্ষর বাড়াইয়া খুব বেশী অর্থ উৎপাদন করা যায়। যেমন- , يصفو –صفا মানে পরিস্কার হও تصوف-يتصوف-تصفي-يتصفي অর্থ খুব বেশী পরিস্কার হওয়া, عالمমানে পন্ডিত, বিদ্বান, জ্ঞানী। علامه (আল্লামা) মানে মহাপন্ডিত, মহাজ্ঞানী, খুব বড় বিদ্বান ইত্যাদি।

تصوفশব্দের অর্থ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা, শয়তানে আত্মা, মানবাত্মা এবং দেবাত্মা (ফেরেশতার আত্মা) এই পাঁচ প্রকার আত্মার সমন্বয়ে, মানবাত্মার মধ্যে পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর আত্মা এবং শয়তানের আত্মা হইতে যে সব ময়লা অনবরত আসিতে থাকে, মানুষের বিবেককে কাম, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি রিপুর যে সব ময়লা অনবরত আচ্ছন্ন করিতে থাকে, সেই সব ময়লা হইতে মানবাত্মাকে এবং মানুষের বিবেককে অনবরত খুব তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।"[৩২৪]

খ. প্রামাণ্য সংজ্ঞা : সূফী-সাধক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ সূফীবাদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

১. "যুননুন মিসরীর মতে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর সবকিছু বর্জন করাই সূফীবাদ"।

২. জুনায়েদ বাগদাদীর মতে, সূফীবাদ হলো জীবন-মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।

৩. আবু সাহল সালুকীর মতে, আপত্তিকর ও নিন্দনীয় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকাই সূফীবাদ।

৪. আল কুশায়রীর মতে, দেহ ও অন্তরকে পবিত্র করার সাধনাকে সূফীবাদ বলা যায়।

৫. শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারীর মতে, মানুষের আত্মা পরিশোধনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা হলো সূফীবাদ। যা তাকে চিরস্থায়ী নেয়ামতলাভের জন্য নৈতিক জীবন সমুন্নত রাখার নির্দেশনা দেয়। এর বিষয়বস্তু হলো আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং তার লক্ষ্য চিরন্তন সুখ-শান্তি অর্জন করা।

৬. বায়েযিদ বোস্তামীর মতে, সূফীবাদ হলো পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে গিয়ে যে কষ্ট হয় তা বরণ করে নেয়াই সূফীবাদ।

৭. আবু আলী কাজিনীর মতে, সূফীবাদ হলো মনোরম-সুন্দর আচরণ।

---

৩২৩. আল্লামা শিবলী নোমানী: প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪

৩২৪. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.): *তাছাওউফ তত্ত্ব*,(ঢাকা:আল-আশরাফ প্রকাশণী-এপ্রিল-২০০৩), পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইমাম গাজ্জালি (র)-এর মতে, মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতাসহ সব রকমের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা থেকে মনকে মুক্ত করে একনিষ্ঠ ও আন্তরিক ইবাদতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও প্রেম অর্জনের সাধনাই সূফীবাদ।[৩২৫]

৯. মারুফ আল কারখীর মতে, সূফীবাদ হলো পরম সত্তার উপলব্ধি।

১০. আবু মুহাম্মদ জারিনীর মতে, সুন্দর অভ্যাস গঠন এবং সকল ক্ষতিকর কামনা।হতে অন্তরকে মুক্ত করার নাম সূফীবাদ।

১১. হাসান বসরীর মতে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে পারলৌকিক সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দেয়াই সূফীবাদ।

১২. আবুল হুসাইন আন নূরীর মতে, ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জনই সূফীবাদ।

১৩. আবু আবদুল্লাহ খফীফের মতে, মহান আল্লাহর প্রেম দ্বারা শুদ্ধ হওয়ার সাধনাই সূফীবাদ।"[৩২৬]

মোটকথা-মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলার সাধনাই সূফীবাদ। অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে দৃশ্য ও অদৃশ্য জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে মহান আল্লাহর পরম সত্তাকে উপলব্ধির মাধ্যমে চিরন্তন শান্তিলাভই সূফীবাদের মূল শিক্ষা।

অনুচ্ছেদ-২

তাসাউফের স্বরূপ ও প্রকৃতি

তাসাউফ বা সূফীবাদ ইসলাম ধর্মের 'বাতেনি' দিকের পরিচায়ক,শরিয়ত যেমন এর সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দশক। মুসলিম জাতির চিন্তাধারারঅন্যান্য দিকের মতো সূফীবাদও কোরআন ও হাদিসের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সূফীবাদ অনুসারেআল্লাহ প্রেমময়; তিনি আমাদের প্রেমাস্পদ। প্রেমই ধর্ম। আল্লাহর প্রেমলাভই মানব জীবনের পরম সম্পদ, আল্লাহর প্রেমে শক্তিশালী হওয়াই মহামূল্য মানব জীবনের লক্ষ্য। আল্লাহ নির্মম, কিম্ভুতকিমাকার সত্তা নন। মানুষকে শাস্তি প্রদান করাই তার কর্ম নয়। আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি সমস্ত সুষমা, সমস্ত প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আধার। তিনি তাঁর প্রেমিকের হৃদয়ের খবর রাখেন। তিনি তাঁর মাহবুবের অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের অন্তরের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সূফীবাদ অনুসারে আল্লাহ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তিনি নৈর্ব্যক্তিক ও অজ্ঞেয় সত্তা নন। প্রজ্ঞার সাহায্যে যে আল্লাহর ধারণা পাওয়া যায় সে আল্লাহ পরম ধীশক্তিসম্পন্ন (AbsoluteThought)। তিনি মানুষের হৃদয়ের আবেদন চরিতার্থ করতে সক্ষম। সূফীবাদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এই শূন্যতা ভরে দিয়েছে সূফীবাদ অনুসারে মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্তস্থলে তাঁর মাশুকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছে। বিশ্ববিখ্যাত মরমী সাধক কবি মাওলানা রুমির নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিগুলোর মধ্যে সূফীবাদের অন্তর্দর্শনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে :"ক্রুশ ও খ্রিস্টান জগৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম তিনি ক্রুশের নন। পূজামণ্ডপ, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে গমন করলাম সেখানেও তাঁর সাক্ষাৎ মিলল না। হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করলাম।তিনি সেই পর্বত উপত্যকার মধ্যে নেই। আমি আমার কল্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম।

---

৩২৫. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.): *তাছাওউফ তত্ত্ব*,(ঢাকা:আল-আশরাফ প্রকাশণী-এপ্রিল-২০০৩), পৃ.১২

৩২৬. মাওলানা মোঃ মোহিববুল্লাহ আজাদ: প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮,৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে সেখানে দেখতে পেলাম। তিনি অন্য কোনোখানে নেই।"[৩২৭] সূফীবাদ অনুসারে, আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘটে থাকে। মানব হৃদয় আল্লাহর সিংহাসন (আরসিল আজিম); সুতরাং কুচিন্তা, কুমনন, কু-ইচ্ছা থেকে মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখতে হবে। এই যোগাযোগের পথে আল্লাহর আলোকে আলোকিত মুরশিদের সান্নিধ্যের প্রয়োজন, তিনি ভক্তের মন ভক্তিরসে ভরে দেন ও তাঁর মন থেকে কলুষ কালিমা দূরীভূত করে আল্লাহর মিলন ঘটিয়ে থাকেন।

সূফী দর্শনের মূল সুর হলো আল্লাহ, যিনি একমাত্র পরম সত্তা। আল্লাহই একমাত্র সত্তা। এই জগৎ এক পরম সুন্দরের প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছে। সৃষ্টি এক ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া, কুন্ ফাইয়াকুন (হও এবং সব হয়ে গেল। হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "আমি গুপ্ত সম্পদ এবং আমি প্রকাশ পেতে চেয়েছি। কাজেই আমি জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি। কোরআনে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরকাছ থেকে এসেছি এবং তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব (ইন্নালিলাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কোরআনের পথ অনুসরণ করে সূফীরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে আল্লাহর শক্তির মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করেন। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ ও বৌদ্ধদের শূন্যতাবাদ থেকে স্বতন্ত্র এক জীবনধর্মী আধ্যাত্মিকতাই সূফী দর্শনের লক্ষ্য। সূফীদের মতে জগৎ বাস্তব, কারণ পরম সত্তায় এই জগতের স্থান আছে। সূফীদের মতে, মানুষ সৃষ্টির চরম কারণ নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে পরম সত্তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ (আশরাফুল মাখলুকাত), ঐশী চিন্তায় মানুষ প্রথম উদিত হয়েছিল এবং বিবর্তনের শেষ স্তরে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম সৃষ্টি সার্বিক প্রজ্ঞা। যা সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতায় মহিমামণ্ডিত করেছে। জগতের সমুদয় বস্তু স্তরে স্তরে নিঃসৃত হয়েছে। সূফীবাদ মানুষকে একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলে অভিহিত করেছে। সূফীরা কোরআন ও হাদিস থেকেই তাঁদের মতবাদের ভিত্তি গ্রহণ করেছেন। ফাজকুরুনি আজকুরুকুম (যদি তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদের স্মরণ করব)। মান আরাফা নাফছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু (যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকেও জেনেছে)।[৩২৮]

জগৎ ঐশী শক্তির মূর্ত প্রকাশ; কাজেই এতে অনিষ্টের কোনো স্থান নেই ।আল্লাহর প্রেক্ষিতে অনিষ্টের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই জগৎ সম্ভাব্য সেরা জগৎ। অনিষ্টের বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। এর অস্তিত্ব বস্তুনিরপেক্ষ বা আত্মগত। যখন চেতনা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয় তখন মানুষ কোনো অশুভ, অমঙ্গল বা অনিষ্ট দেখতে পায় না। যতক্ষণ পর্যন্তমানুষ অহং দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অশুভ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে।কিন্তু ঐশী আলোকে (নূরে এলাহী) আলোকিত মানুষ অশুভের কোনো অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। সে সারা জাহানে আল্লাহর অভিব্যক্তি দেখতে পায়। তাই সূফী শিক্ষায় আত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। আত্মা আল্লাহর শক্তি। 'কুলের রুহহা মিন আমরে রাব্বি' (হে রাসূল বলুন, আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ) -আল কোরআন। আত্মা অন্ধকারময় দেহকে আলোকিত করে। রুহ ব্যতীত আর একটি শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, তা হলো নফছ। রুহের আকর্ষণ আল্লাহর দিকে আর নফছের আকর্ষণ পার্থিব জগতের দিকে। মানুষ এই দ্বিবিধ শক্তির মোকাবেলার কেন্দ্র। সূফীবাদ আত্মিক বিবর্তনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এখানে আত্মিক বিবর্তন বলতে নফছের ক্রমবিবর্তন বুঝানো হয়েছে। রুহ ঐশি শক্তি- খোদার আদেশ, এর কোনো পরিবর্তন নেই। নফছ নিম্নলিখিত

৩২৭. Davis Headlands:*Persian Mystics: Rumi*, তা.বি. স.বি.
৩২৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্তরসমূহ অতিক্রম করে : নফছে আম্মার- নফছে রাহমানিয়া নফছে মুলহিমা- নফছে মুতমায়েন্না। চতুর্থ স্তরের নফছ ও রুহের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। কোরআনে বলা হয়েছে, "হে পরতুষ্ট আত্মা, তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর" (৮৯-২৭-৩০)। এই স্তরকে বলা হয় ফানা বিনাশন)। নফছ এই স্তরে উন্নীত হলে মানুষ বাক্কা (চিরন্তন) স্তরে চলে যায়। তখন মানুষ স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করে। পরম সত্তার প্রভাবে প্রভাবিত হাল্লাজ বলেছেন, আমি সত্য (আনাল হক)। এই স্তরে মানুষ ঐশী শক্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

সূফী দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনটি পথে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে- ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেননা পরমসত্তা দৈহিক বা বস্তুগত সত্তা নয়। চিন্তার আকার ও প্রকারসমূহ (forms and categories of reason) আল্লাহর অস্তিত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা দান করে। তাদের মতে, কাশফের সাহায্যেই পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে ওহির প্রয়োজনীয়তাও তারা অস্বীকার করেন না। স্বজ্ঞানই (কাশফ) পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমেই ঐশীজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সূফীবাদের জ্ঞানতত্ত্ব বুদ্ধিবাদীদের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র।[৩২৯]

সূফীবাদের উৎপত্তি

মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির ন্যায় সূফীবাদও কোরআনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট-হয়েছেন যে সূফীবাদ বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন, খ্রিস্টানি ও নিওপ্লেটোনিক দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত। এসব পণ্ডিত সূফীবাদের কোরআনিক উৎস স্বীকার করতে রাজি নন। এদের মধ্যে ভনক্রেমার, ডেজি, ব্রাউন, নিকলসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে আল-কুশাইরি থেকে আরম্ভ করে ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ কোরআনকে সূফীদের মূল উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। কাজেই সূফীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মোট চারটি মতবাদ। যেমন-

(ক) বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব মতবাদ

(খ) খিস্টানী ও নিওপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ

(গ) পারসিক প্রভাব মতবাদ এবং

(ঘ) কোরআনিক উৎপত্তি মতবাদ। একে একে মতবাদগুলোর বিচার করা যাক।

ক. বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব মতবাদ :

এইচ. মার্টেন (H.Merten) ও গোল্ডজীহার (Goldzither) এই মতবাদের পরিপোষক। তাঁদের মতে, সূফীবাদ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানরা ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং বেদান্ত বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সূফীবাদ জন্মলাভ করে। এই দৃশ্যমান জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী ও অলীক, এটি সূফীরা বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন থেকেই গ্রহণ করেছেন, আর ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের কঠোর সংযম ও কৃচ্ছতা মুসলমানদের মধ্যে কঠোর সংযম ও কৃচ্ছতা সাধনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এই মতবাদের প্রকৃতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সূফীবাদ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে উদ্ভূত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ নির্ধারণের প্রয়াস অনিশ্চয়তামূলক।[৩৩০]

---

৩২৯. রশীদুল আলম: *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা,(ঢাকা:মেরিট ফেয়ার প্রকাশন.অষ্টাদশ সংস্করণ-মে ২০১৬,*পৃ.২৬৪-২৬৭

৩৩০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এবার সাদৃশ্যের প্রকৃতি বিচার করা যাক। বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ ও সূফীদের জগৎ সম্পর্কীয় ধারণা এক নয়। বেদান্তিকরা এই জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু সূফীরা এই জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করেন না। কেননা জগৎকে তারা পরম সুন্দরের প্রকাশ বলে মনে করেন। বেদান্তিকদের নিকট এই জগৎ অর্থহীন হলেও সূফীদের নিকট এই জগৎ মূল্যবান; কেননা এই জীবনের সাধনাই মহাজীবনের ভিত্তি রচনা করে। বেদান্তিকরা তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন। কিন্তু সূফীরা নৈতিক দিক থেকে জগতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন- যে ব্যক্তি আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় মোটেই অগ্রসর হতে পারল না, প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন কাটাল, তার নিকট জীবন অসার, জগৎ অলীক কিন্তু সাধকের নিকট নয়। সূফী সাধক জীবন জগতের মোরাকিবার মাধ্যমেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। এ ছাড়া যারা সাধনা করেন, সে যে কোনো বিভাগেই হোক না কেন, তারা যে বিলাস-ব্যসনে, আরাম-আয়েশের মধ্যে দিন কাটাতে পারেন না, তাঁরা যে মহান ব্রত উদ্যাপনের জন্য সংযম ও কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন তা শুধু সূফীদের মধ্যে দেখা যায় না, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, এমনকি দেশদরদি রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও দেখা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বেদান্ত দর্শনের মায়ার পেলব কিংবা ভারতীয় যোগীদের কৃচ্ছতা ও সংযম মুসলমান মরমীবাদের প্রেরণ নয়। উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা বাহ্য।

এবার সূফীদের ফানা ও বৌদ্ধদের নির্বাণ সম্পর্কে বিচার করা যাক। সূফীদের ফানা ও বৌদ্ধদের নির্বাণ মতবাদ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে কোনো মৌলিক সাদৃশ্য নেই। বৌদ্ধদের নির্বাণ মতবাদ নঞর্থক, সূফীদের ফানা মতবাদ সদর্থক। ফানা বা আত্মবিনাশ সূফীদের আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতির শেষ স্তর নয় ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান অর্থাৎ বাক্কাবিল্লাতে উপনীত হওয়াই সূফীদের কাম্য। কিন্তু বৌদ্ধদের নির্বাণ সত্তায় মতবাদ আত্মবিলোপেই শেষ। এর পরবর্তী আর কোনো স্তর নেই। বিখ্যাত প্রাচ্য চিন্তাবিশারদ নিকলসনও স্বীকার করেছেন, "আমরা বিনাশর্তে ফানা ও নির্বাণকে অভেদাত্মক মনে করতে পারি না। নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু ফানা পরবর্তী স্তর বাক্কার (আল্লাহর চিরন্তন সত্তায়) অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি এই যে, ভারতীয় ভাবধারা মুসলমানদের কাছে পৌঁছবার আগেই সূফীবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। সূফীবাদ ইসলামের মতোই পুরনো। এটি ইসলামের বাতেনি দিক। সূফীদের ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকের অভিব্যক্তি। নবম শতাব্দীর পুর্বে মুসলমান চিন্তাবিদরা ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। তার আগেই সূফীবাদের উদ্ভব ঘটেছে। ইমাম হাসান আল-বসরিই (মৃত্যু ৭২৮খ্রি.), আবু হাশিম (মৃত্যু ৭৭৭-৭৭৮ খ্রি.), জাবির-বিন-হাসান (মৃত্যু ৭৮০ খ্রি.), ইব্রাহিম বিন আদহাম (মৃত্যু ৭৭৭ খ্রি.), রাবেয়া আল-বসরি (মৃত্যু ৭৪৯ খ্রি.) প্রমুখ সূফীদের আবির্ভাব ও সাধনা প্রমাণ করে যে, সূফীবাদ ভারতীয় আমদানি নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।[৩৩১]

খ. খ্রিস্টান ও নিও-প্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ :

ভনক্রেমার, নিকলসন প্রমুখ পণ্ডিত এই মতবাদের পরিপোষক। তাঁদের মতে, যখন মুসলমানরা নিওপ্লেটোবাদী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসেন তখনই ইসলামে সূফীবাদের সূত্রপাত ঘটে। এসব নিওপ্লেটোবাদী দার্শনিকরা গ্রিক দর্শনের আলোকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। জাস্টিনিয়ানের দ্বারা এসব দার্শনিকের বিতাড়নের পর তারা নওশেরওয়ানের রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে তাদের মতবাদ প্রচার করতে

৩৩১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। নবম শতাব্দীতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে খ্রিস্টানি মরমীবাদ ও গ্রিক দর্শন মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট বেশ সুপরিচিত হয়েছিল। মুসলিম হিজরি সালের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে নিও-প্লেটোবাদী খ্রিস্টান মরমীবাদীরা আরব ও সিরিয়ায় তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন এবং এদের সংস্পর্শে আসার ফলেই মুসলমানদের মধ্যে সূফীবাদ জন্মলাভ করে।

নিকলসন এই মন্তব্য প্রচার করেন। তাঁর মতে, সূফীবাদ গ্রিক দর্শনের সম্পৃক্ত ভাবধারায় উদ্ভূত। এই মতবাদ ঐতিহাসিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধোপে টেকে না। সূফী দর্শনের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করেছি যে, সূফীভাবের প্রকাশ হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর শিষ্যবৃন্দ (বিশেষত আহলুস সাফফা) ও তাবেয়িনদের মধ্যেই ঘটেছিল। জাগতিক কাজ সমাধা করেও তারা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ ছাড়া প্রথম পর্যায়ের সূফী যাদের নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে, তারা বাইরের চিন্তার সঙ্গে মিশবার সুযোগ লাভ করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নবম শতাব্দীর পূর্বে সূফীবাদ জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এছাড়া মনস্তাত্ত্বিক বিচারেও এই মতবাদ টেকে না। মানবমনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রত্যেক মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তায় নির্দেশ অনুযায়ী চিন্তা করে, কাজ করে, নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবন জগৎকে দেখে থাকে। এই চিন্তা কাজ ও দর্শনের ব্যাপারে একজন মানুষের সঙ্গে অপর একজন মানুষের মিল বা সাদৃশ্য থাকতে পারে আবার অমিল বা বৈসাদৃশ্যও থাকতে পারে। মিল থাকলেই বলা চলে না যে একজন অপরজনকে নকল করেছে। কোনো মানুষই অন্যের কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না। অন্যের চিন্তাধারাকে নিজের চিন্তাধারার ওপর প্রাধান্য দিতে চায় না। নিজেকে ব্যক্ত করার, নিজের স্বাতন্ত্রকে জাহির করার প্রবণতা মানবমনের এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। মানুষের জাতীয় জীবন সম্পর্কেও একই সত্য প্রোজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান। কোনো জাতিই রাজনৈতিক দিক দিয়ে হোক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হোক অন্য কোনো জাতির পদানত হতে চায় না, অন্য কোনো জাতির অধীনতা স্বীকার করতে চায় না। প্রত্যেক জাতিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হতে চায়। এটি হলো নিজেকে প্রকাশ করার এক ব্যাকুল কামনা, উদ্ভিদ ও পশু জগতেও এই তীব্র কামনার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। আত্মসচেতন মানুষ জাতির তো কথাই নেই। কাজেই মানবমনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পথ পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য ও জীবনের স্বাতন্ত্র-প্রবণতার দিক লক্ষ করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এক জাতির ভাব অন্য জাতি দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না। নিজেরা মন ও মানব পরিমণ্ডলের সঙ্গে সুসঙ্গত না হলে কোনো ভাব কোনো মানুষকে বা কোনো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। আর মানুষ হিসেবে বিভিন্ন মান গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সার্বজনীনতার বন্ধন থাকাও স্বাভাবিক, যেমন মানুষে মানুষে দৈহিক গঠনে কতই না মিল, তাই বলে বলা চলে না যে, একজন আরেকজনকে নকল করেছে। সূফীবাদের উদ্ভবের ব্যাপারে এই বিষয়টি মনে রাখলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ইকবাল সত্যই বলেছেন, "কোনো ধারণাই কোনো জাতির নামকে অধিক দিন ধরে রাখতে পারে না, যদি সে ধারণা কোনো দিক দিয়ে তাদের নিজস্ব না হয়। কাজেই সূফীবাদ ইসলামের শিক্ষা থেকেই উদ্ভূত এবং মুসলমান জাতির চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি।[৩৩২]

৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

গ. পারসিক প্রভাব মতবাদ :

ব্রাউন ও তার অনুসারীদের মতে, পারসিকরা[৩৩৩] ইসলামের সূফীবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদ অনুসারে পারস্য সাম্রাজ্য পতনের পর যখন মুসলমানরা পারসিকদের সংস্পর্শে আসেন তখনই ইসলামের সূফীবাদের সূত্রপাত ঘটে। একটি নিকৃষ্ট জাতি দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট জাতির পরাভবের ফলে উৎকৃষ্ট জাতি অর্থাৎ পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয়ে তাঁদের মধ্যে নৈরাশ্য, কঠোর সংযম ও মরমীবাদের সৃষ্টি করেছিল। পারস্য দেশ যথার্থই সূফীদের দেশ এবং অধিকাংশ পরবর্তী সূফী পারস্যের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পারসিকরাই সূফীবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না যে, সূফীবাদ পারস্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিক মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবি ও ইবনুল ফরিদ আরবি ভাষাভাষী ছিলেন। পারসিক রক্ত তাদের ধমনিতে ছিল কিন্তু সূফী দর্শনের ইতিহাসে তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অমরতা লাভ করেছেন। ইবনুল আরাবি সূফীবাদকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে একে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। বহু সূফী পারস্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কাজেই সূফীবাদ পারস্য দেশে উদ্ভূত হয়েছে, এই মতবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও যৌক্তিকতা অত্যন্ত দুর্বল। আসল কথা, আরব জাতি পারসিকদের সংস্পর্শে আসার আগেই সূফীবাদের প্রবর্তন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সূফীবাদ বা ইসলামি মারেফাতের আদিগুরু বলে ধরা হয়। তিনি এবং তাঁর চার খলিফা নিঃসন্দেহে বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। এটা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একদল শিষ্য, যারা আহলুস সুফফা নামে পরিচিত, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ অনুসরণ করে মসজিদের এককোণে খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। আর প্রথমে মুসলমানরা দেশ বিজয়ে ও ধর্মের অনুশাসন পালনে ব্যস্ত ছিলেন, ধর্মের আলোচনা, ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা বাইরের ধর্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেননি অথবা এ সবের প্রয়োজন বোধ করেননি। কাজেই সূফীবাদ পারসিক ভাবধারা থেকে উদ্ভূত হয়নি। আল্লামা ইকবাল তাঁর "দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস্ ইন পারসিয়া" গ্রন্থে গবেষকদের নির্লিপ্ত ও পক্ষপাতহীন মন নিয়ে সূফীবাদের উৎপত্তির আলোচনা করেছেন এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক,সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাসমূহ, যা সূফীবাদের কোরআনিক প্রেরণা ও সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত করে তুলেছিল, সেই সব অবস্থার যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩৩৪]

১. এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কমবেশি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও চাঞ্চল্য মুসলমানদের মনে পার্থিব জীবন সম্পর্কে নিরতিশয় উদ্বেগ ও গভীর নৈরাশ্য উৎপাদন করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। ইসমাঈলীয়া, বাতেনিয়া ও কারামাতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মের ছদ্মবেশে রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জোর প্রচারণা চালাতে থাকে। পরে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে খলিফা হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের (মামুন, আমিন) মধ্যে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভের জন্য আত্মঘাতী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। মামুনের রাজত্বে এখন আরও একটি অবস্থা রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকে তীব্রতর করে তোলে- শুহুদিয়া দ্বন্দ্ব (Shuhudia Conttroversy)। এই দ্বন্দ্ব তাহিরিয়া, সাফারিয়া, সামারিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র পারসিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশকে তুরান্বিত করেছিল। এসব ও অন্যান্য রাজনৈতিক কোন্দল ধর্মীয় ভাবাপন্ন শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে অনিন্দ্য জীবনের উত্থান-পতনের অনিশ্চয়তা থেকে ধ্যান-ধারণার শান্তিময় জীবনে টেনে এনেছিল।

---

৩৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৬

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

২. মুতাজিলা চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে সংশয়াত্মক প্রবণতার (Sceptical tendencies) বীজ বপন করেছিলেন। বাশার ইবনে বার্দ ও আবু আল-আলাল মায়ির কবিতাসমূহের মধ্যে এই প্রবণতা বাণীরূপ লাভ করেছিল। বুদ্ধিবাদের মধ্যে নিহিত এই সংশয়াত্মক প্রবণতা জ্ঞানের এক নিশ্চিত উৎস। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজনীয়তাবোধে পরিণতি লাভ করেছিল; আল-কুশাইরি দার্শনিক কান্টের "ক্রিটিক অব পিউর রিজন যেমন জ্যাকো বি ও শেলেরম্যাচার (Schleiermacher) প্রমুখ দার্শনিককে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি স্বজ্ঞার মাধ্যমে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা দান করেছিল, মুতাজিলাদের বুদ্ধিবাদের দ্বন্দ্ব তেমনি সূফীবাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করেছিল।

৩. হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী মাজহাবের আবেগ বর্জিত পরহেজগারি,আবেগধর্মী আন্তরিক শুদ্ধি ও পবিত্রতার দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৪. আল-মামুনের খেলাফত আমলে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিনিধির মধ্যে স্বাধীন ধর্মীয় আলোচনা এবং বিশেষত আশারিয়া ও মুতাজিলা চিন্তাবিদের মধ্যে ধর্মীয় কোন্দল এতই তীব্র ও জটিল রূপ লাভ করেছিল যার ফলে ধর্ম বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ধর্মের জগতে নৈরাজ্যব্যঞ্জক পরিস্থিতি প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধর্মীয় কোন্দল ও অনাসৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে ইসলামের অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রস্রবণ থেকে সুধামৃত পানে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুত মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম হলো বাহির থেকে ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত ।

৫. আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিবাদী প্রবণতাকে প্রসারের ফলে ধর্মীয় তেজ ও অনুশীলনে ভাটা পড়ে, অন্যদিকে জনসাধারণের হাতে বিশেষত সমাজের উচ্চ শ্রেণির হাতে প্রভূত সম্পদ মজুদ হওয়ার ধর্মীয় ঔদাসীন্য ও নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। সমাজের এই ধর্মীয় অধোগতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে ধর্মের অন্তরে আশ্রয় খুঁজতে প্রেরণা দান করে। উপরিউক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অবস্থা যুক্তভাবে ইসলামের সার্বজনীন জীবন দর্শনের অন্তরের দিকে নজর করতে কোরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে চরম পরিণতির দিক ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোরআনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বা মরমীবাদের বীজ লুক্কায়িত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা তাকেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত করে তুলেছিল, সূফীবাদের জন্ম ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

ঘ. কোরআনিক উৎপত্তি মতবাদ :

বাইরের চিন্তাধারার প্রভাব যে সূফীবাদের জন্ম দেয়নি, বরং কোরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সূফীবাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এটা উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূফীবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক এবং উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি, ইসলামের বাতেনি দিকের বিকাশ। কোরআনের শিক্ষা থেকেই সূফীবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। কোরআনে এক শ্রেণির আয়াত রয়েছে যা আধ্যাত্মিক মরমীবাদী ভাব বহন করে এই আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সঙ্গেই সূফীবাদের সূত্রপাত ঘটে। নিম্নে কোরআনের আধ্যাত্মিক নমুনার কতগুলো আয়াত উদ্ধৃত হলো।

১."وسع كرسيه السموت والارض" "দ্যুলাক-ভূলাকব্যাপী তাঁর সিংহাসন বিরাজমান"[৩৩৫]

৩৩৫. আল-কুরআন, ০২;২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

২."و هو معكم اين ما كنتم" "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।" (সূ. ৫৭, আ. ৪)

৩."و اذا سالك عبادي عني فاني قريب – اجيب دعوة الداع اذا دعان" "আমি নিশ্চয়ই তাদের অতি সন্নিকটে আছি। কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বান সাড়া দিয়ে থাকি।" (সূ. ২, আ. ১৮৫)

৪."والاخر والظاهر والباطن- و هو بكل شيء عليم" "তিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত, তিনি সর্বজ্ঞাতা।" (সূ. ৫৭ আ. ৩)

৫. "الله نورالسموت والارض" "আল্লাহ ভূলোক-দ্যুলোক বিশ্বভুবনের জ্যোতি।"(সূ. ২৪- আ. ৩৫)

৬. "لله المشرق والمغرب – فاينما تولوا فثم وجه الله – ان الله واسع عليم"

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর প্রসন্ন দৃষ্টি দীপ্যমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞানী।" (সূ, ২ আ, ১১৫)।

৭. "و نفخت فيه من روحي" "আমি তার মধ্যে আমার রুহু প্রবিষ্ট করেছি।"(সূ, ১৫ আ, ২৯)

৮."و نحن اقرب اليه من حبل الوريد" "আর আমি খোদা মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী।"(সূ.৫০আ. ১৬)

৯. "يحبهم و يحبونه" "তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাকে ভালোবাসে।" (সূ. ৫ আ. ৫৪)

১০. "فاذكروني اذكركم" "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[৩৩৬]

কোরআন শরীফ ব্যতীত হাদিসেও সূফীবাদের ভিত্তি অনুসৃত হয়,

১. আমার আসমান অথবা আমার জমিন আমায় ধারণ করতে পারে না, কিন্তু সে সব বান্দার দিলে হয় আমার স্থান, যারা মোমিন।

২. আমি ছিলাম গোপন সম্পদ এবং আমার ভেতরে জাগল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা, তাই আমি গড়ে তুললাম এ সৃষ্টি, যাতে তারা আমায় জানতে পারে।

৩. যে ব্যক্তি নিজেকে জেনেছে সে তার খোদাকেও জেনেছে।

৪. যে ব্যক্তির মধ্যে কোনো প্রেম নেই সে বিশ্বাসী নয়।[৩৩৭]

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন ও হযরতের জীবনাদর্শ থেকে সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে। হযরত (সা.) নিজেই তার জীবনের কার্যাবলি ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে সূফীবাদের বীজ রোপন করেন। আর এই বীজই পরবর্তীকালে সূফীবাদরূপে বিরাট মহীরুহে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং সূফীবাদ ইসলামি জমিনে উপ্ত ও ইসলামি আবহাওয়ায় বর্ধিত।[৩৩৮]

অনুচ্ছেদ-৩

তাসাউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) শেষভাগে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সূফীবাদের উদ্ভব হয় বলে সাধারণত অনুমিত হয়ে থাকে। এই ভ্রান্ত অনুমানের জন্য কেউ কেউ সূফীবাদকে গ্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তি প্রসূত ও অনৈতিহাসিক। সূফীবাদ ইসলাম ধর্মের মতোই পুরাতন। কোরআনের

৩৩৬. আল-কুরআন, ০২;১৫২
৩৩৭. প্রাগুক্ত
৩৩৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ হযরতের নিকট নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সূফীবাদের সূত্রপাত। আল্লাহর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার ফলই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। হাদিসে উক্ত হয়েছে (আল্লাহ হযরতকে বলেছেন, "আমি গুপ্তধন এবং আমি ব্যক্ত হতে চেয়েছিলাম, কাজেই আমি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলাম যাতে আমি ব্যক্ত হতে পারি।"

সুতরাং কোরআন ও হাদিসে আল্লাহর যে স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে তা থেকে ইসলামের সর্বআল্লাহবাদের (pantheism) ধারণা উদ্ভূত হয়। সূফীগণ আল্লাহর মধ্যে আত্মবিনাশ করতে চান কিন্তু তাদের আল্লাহই এক পরম সত্তা এবং অন্যসব আল্লাহরই অভিব্যক্তি। প্রেম ইশক সূফীবাদের মূল সুর। সূফীগণ প্রেম ও ভক্তির বলে প্রেমময় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস পান। সূফীর প্রেম বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ, স্বার্থশূন্য ও নিরাসক্ত। সূফীবাদের মূল সুর প্রেমের ভিত্তি কোরআন ও হাদিসে নিহিত রয়েছে। যথা, আল্লাহ বলেন, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (সূ. ৩, আ. ৩৯)। "যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি তাদের প্রগাঢ় ভালোবাসা আছে। (সূ. ২, আ. ১৬৫)। হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তির মধ্যে প্রেম নেই সে বিশ্বাসী নয়।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায় যে, সূফীবাদের বীজ ইসলামের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই রোপিত হয়েছে। হযরত নিজেও সূফীসুলভ ভাব ব্যক্ত করেছেন এবং মাঝে মাঝে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। হযরতকে মাঝে মাঝে আল্লাহর চিন্তায় আত্মসমাহিত অবস্থায় দেখা গেছে। হযরতের জীবনী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তার জীবনের একটা সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়- পৃথিবীর হাজারো কাজের মধ্যে থেকেও তিনি আল্লাহর খেয়াল থেকে বিন্দুমাত্র সরে যাননি। আল্লাহর স্মরণ আমার বন্ধু এই সত্যকে নিজের জীবনে বাস্ত বায়িত করে হযরতের বহু সাহাবা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। হযরতের একদল সাহাবা ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই সূফীর তন্ময়তা ও পরহেজগারির অনুশীলন করতে থাকেন। তারা মসজিদে নববীর একপাশে উপাসনা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং কদাচিৎ জাগতিক কাজে ব্যাপৃত হতেন। হযরতের এই সমস্ত সাহাবা আহালুস সূফফা নামে পরিচিত এবং সূফী শব্দটি এই আহলুস সূফফা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন।

ইসলামের প্রথম খলিফারা জগতের কর্মব্যস্ত শাসক হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তাঁরা সময়ে সময়ে আল্লাহর চিন্তায় এমনি মশগুল হয়ে থাকতেন যে বাইরে থেকে তাঁদের বাহ্যজ্ঞান আছে কি-না বুঝা যেত না। এই সূফী প্রবণতা প্রথমে সীমিতসংখ্যক মুসলমানের মধ্যে দৃষ্ট হতো। অতঃপর হযরত ওসমানের হত্যার পর মুসলিম জাহানে নেমে আসে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। এর ফলে মুসলিম সমাজে সন্ন্যাস ভাব(Asceticism or quietism) বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীনের পর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ও বিতর্কের কোন্দল থেকে দূরে থেকে একদল স্বার্থশূন্য সরলপ্রাণ মুসলমান জাগতিক সুখ-শান্তি, শান-শওকত, আরাম-বিলাস পরিত্যাগ করে পরমসত্তা আল্লাহর আরাধনা ও ধ্যানে ব্যাপৃত হলেন। তারা ছিলেন জগতের সর্বপ্রকার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে। তারা সব কাজে কামনা করতেন আল্লাহর সাহায্য। ধীরে ধীরে এই দল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজে তাঁরা অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন দখল করেন। এই সমস্ত আত্মিক উন্নতিকামী মুসলমানরা বিদেশি ভাষা জানতেন না এবং গ্রিক বা আর্যদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পাননি কিংবা দার্শনিকদের শিক্ষার সংস্পর্শে আসেননি। তারা সদাসর্বদা আল্লাহর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ভাবার অবকাশ

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ছিল না। এই সময় ধেয়ানি ও পরহেজগার মুসলমানরা যে সর্ববিষয়ে মূলত সূফী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের সূফী বলা হতো কি-না তা বড় কথা নয়।[৩৩৯]

ইমাম হাসান আল-বসরিকে সাধারণত প্রথম সূফী হিসেবে মনে করা হয়। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি হযরতের বংশের লোকদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও মিস্টিক ছিলেন। তিনি ১১০ হিজরিতে ৭২৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। জামি আবু হাসিমকে (১৬২ হিজরি ৭৭৭-৭৮ খ্রি. মৃত্যু, প্রথম সূফী বলে অভিহিত করেন। তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় বসবাস করেন। কেউ কেউ জাবির বিন হায়ানকে (মৃত্যু ১৬৪ হিজরি, ৭৮০ খ্রি.) প্রথম সূফী বলে মনে করেন। অবশ্য যাকে প্রথম সূফী বলা হোক না কেন, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে সূফী নামটি সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে কোরআনের শিক্ষায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একদল পরহেজগারি ও তাকওয়ার মধ্যে নিজেদের মশগুল রাখেন। এসব সাধক সাধ্বীদের মধ্যে ইব্রাহিম বিন আদহাম (মৃত্যু ১৬১ হি. ৭৭৭ খ্রি.), রাবেয়া আল-বসরি (মৃত্যু ১৬০ হি. ৭৭৬ খ্রি.), দাউদ আততায়ী (মৃত্যু ১৬৫ হি. ৭৮২ খ্রি.), ফজিল ইবনে ইয়াজ (মৃত্যু ১৮৮ হি. ৭৯৪ খ্রি.), মারুফ কারখী (মৃত্যু ২০০ হি. ৮১৫ খ্রি.), হারিস আল-মুহাসিবি (মৃত্যু ২৪২ হি. ৮৭৫ খ্রি.) প্রমুখ সূফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সূফী নাম এই সময়ের আগে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পরিচিতি না হলেও সূফীবাদ যে ইসলামের মধ্যে নিহিত ছিল তা আমরা আগেই বলেছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.), সাহাবাগণ ও তাবেয়ীনরা মনে-প্রাণে ও তাদের কার্যাবলিতে ছিলেন আল্লাহতে উৎসর্গীতপ্রাণ (সূফী); তাঁদের সূফী বলা হতো না সাহাবা ও তাবেয়িন নামে তারা সমধিক পরিচিত ও সম্মানিত হতেন।

এই সমস্ত সূফী সাধকদের জীবন কৃচ্ছসাধন ও পরহেজগারির চূড়ান্ত নিদর্শন। তারা কোরআনের আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিব জীবনের অনিত্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সূফীবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় জুননুন মিসরির (মৃত্যু ২৪৫ হি. ৮৬০ খ্রি.) সঙ্গে। তিনি সূফীবাদকে মতবাদ হিসেবে রূপদান করেন। অবশ্য তার পূর্বে মারুফ কারখি সূফীবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন-"সূফীবাদ ঐশী সত্তার উপলব্দি। " তবে সূফীবাদকে মতবাদ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ও রূপদান করার গৌরব অর্জন করেন জুননুন মিসরি। তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সূফী ও দার্শনিক। তার মতে তন্ময়তা বা ভাবোচ্ছাস হলো আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। তিনি বলেন, "সেই ব্যক্তি আল্লাহকে সম্যকরূপে জানেন যিনি আল্লাহর মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত। তিনি হাল ও মাকাম স্তর সম্পর্কীয় মতবাদ প্রবর্তিত করেন। তারপর জুনায়েদ বাগদাদি (মৃত্যু ২৯৭ হি. ৯১০ খ্রি.) জুননুন মিসরীয় মতবাদ লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করেন এবং তাঁর শিষ্য আশশিবলি (মৃত্যু ৩৪৪ হি. ৯৪৬ খ্রি.) এর আরও পরিবর্ধন সাধন করেন। এসব সূফী সাধক আল্লাহর সঙ্গে আত্মার মিলনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও তারা সর্বখোদাবাদী (Pantheistic) ছিলেন না। অতঃপর বায়জিদ আল-বোস্তামি (মৃত্যু ২৭১ হিঃ ৮৭৪ খ্রি.) এবং আল-হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩৯৮ হিঃ ৯২২ খ্রি.) সূফীবাদকে সর্বআল্লাহবাদের (Pantheism) দিকে নিয়ে যান। বায়জিদ আল-বোস্তামি সূফীবাদের মধ্যে ফানা (আত্মবিনাশন) মতবাদ প্রবর্তিত করেন। এই মতবাদ আল্লাহর আত্মসমাহিত হওয়ারই নৈয়ায়িক পরিণতি। বায়জিদ বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐশীজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। সুতরাং

৩৩৯. Syed M.Nadvi:*Muslim Thought and its Sources*.তা.বি. স.বি.

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিনাশন ও আত্মবিলোপ (Self innhilation and self absorption) সূফীবাদের মধ্যে সর্ব আল্লাহবাদে পরিণতি লাভ করে। মনসুর হাল্লাজের মতে, মানুষ মূলত ঐশী; কেননা আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিবিম্বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ফানাফিল্লাহ অবস্থায় আনাল হক (আমিই সত্য) বলায় তাঁকে প্রাণ দান করতে হয়েছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মুহূর্তিক অনুভূতিতে সাধক নিজেকে বিরাট শক্তির চেতনায় বিরাট উপলব্ধি করেন, যেমন- প্রবল ঝড়ের বেগে ছিন্নপত্র ঝড়ের গতি অনুভব করে। সূফী সাধকরাও ফানাফিল্লাহ অবস্থা অতিবাহিত হলে সাধারণত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। মনসুর হাল্লাজের ভ্রান্তি হয়েছিল তার মুহূর্তিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করায়। ফলে শরিয়ত তাকে ক্ষমা করেনি। সূফীবাদের মধ্যে মাঝে মাঝে সর্বখোেদাবাদ প্রাধান্য লাভ করলেও এটি সার্বজনীন হয়ে ওঠেনি।[৩৪০]

আবু নছর সারজি (মৃত্যু ৩৭৮ হি. ৯৮৮ খ্রি.) কিতাবুল লুমা-র এবং আলকুশাইর (মৃত্যু ৪৩৭ হি., ১০৪৫ খ্রি.)এর রিসালায়েত-এ সূফীবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সূফীবাদকে সাধারণত মুসলমানরা সব সময়ে সুনজরে দেখতে পারেনি। গোঁড়া মুসলমানরা সূফীদের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে অবলোকন করেছে। কুশাইরির লেখা থেকে জানা যায় যে, বাগদাদের রুয়াইম (মৃত্যু ৩০৩ হি. ৯১৫ খ্রি.) বলেছেন, "সব লোকই ধর্মের বাইরের রূপ আঁকড়ে থাকে। কিন্তু এই দলটি (সূফী) আকড়ে রয়েছে আসল হাকিকতকে। সব মানুষ ধর্মীয় আইনের বাইরের দিক মেনে চলাকেই মনে করে তাদের কর্তব্য, সূফীরা ধর্মপ্রাণতা ও নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকতা অর্জনের চেষ্টাকেই মনে করে তাদের কর্তব্য। এই কথার মধ্য দিয়ে সাধারণ মুসলমান ও সূফীদের মনোভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য কোনো কোনো সময় বিরোধ ও নির্যাতনে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আল-গাজালির (১০৫০ হি.-১৬৫২ খ্রি.) প্রচেষ্টায় সূফীবাদ ও গোঁড়া মতবাদের সমন্বয় ঘটে এবং সূফীবাদ সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। ইমাম আল-গালির ভাষায় এই দুই পন্থীদের ভারসাম্য স্থাপনের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বলে যে হাকিকত শরিয়তের বিপরীত এবং ধর্মের ভেতরের দিক বাইরের দিকের বিপরীত তারা কুফরের কাছাকাছি। হাকিকত শরিয়তের ভিত্তিযুক্ত না হলে বর্জনীয়। শরিয়ত হলো মানুষের জন্য নির্ধারিত কানুন, হাকিকত আল্লাহর বিধানের প্রতি অন্তদৃষ্টি। শরিয়ত হলো আল্লাহর ইবাদত এবং হাকিকত তার দর্শন। শরিয়ত খোদায়ী আহকামের আনুগত্য আর হাকিকত মরমী দৃষ্টির সাহায্যে আল্লাহর নির্ধারিত তকদির এবং তাঁর প্রকাশিত ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করা। ইমাম আল-গাযালির চেষ্টায় সূফীবাদ সুন্নি মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে। আল-গাযালির সময়ে বহু সূফী আত্মপ্রকাশ করেন। যেমন আল-কুশাইরী (মৃত্যু ১০৪৫ খ্রি.), আবদুল কাদের জিলানি (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রি.), শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (আওয়ারিফুল মা'রিফা গ্রন্থের লেখক), ফরিদ উদ্দীন আত্তার (মৃত্যু ১২২৯ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৪১]

সপ্তম হিজরিতে (ত্রয়োদশ খ্রি.) স্পেন ও পারস্যে সূফীবাদের ক্রমবিকাশ চলতে দেখা যায়। মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবি (মৃত্যু ৬৩৮ হি., ১২৪০ খ্রি.) স্পেনের প্রথম সূফী। তিনি আরবি ভাষাভাষী সূফীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইবনুল আরাবির মধ্যে সর্বখোদাবাদ শৃঙ্খলধারায় প্রকাশ লাভ করে। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বখোদাবাদী (Pantheistic) প্রবণতা দেখা দিলেও এবং বায়জিদ আল-বোস্তামির কোনো কোনো উক্তিতে এর আভাস পাওয়া

৩৪০. চৌধুরী শামসুর রহমান: *সুফিদর্শন*, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, জানুয়ারি২০০২) পৃ.১৯
৩৪১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গেলেও ইবনুল আরাবিই পূর্ণাঙ্গ সর্বখোদাবাদী মতবাদের জন্মদান করেন। ইবনুল আরাবির পর থেকেই সূফীবাদের মধ্যে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই দর্শনের বুনিয়াদী নীতি হলো আল্লাহ সব সত্তার ঐক্য। তিনি তাঁর ফসুসে বলেছেন-

ওগো তুমি পয়দা করেছে সকল বস্তুকে
তোমার নিজেরই মাঝ,
তুমিই ঐক্যবদ্ধ কর তাদেরকে-
যাদেরকে পয়দা করেছ তুমি।
তুমিই পয়দা করেছ সবকিছু -
যার অস্তিত্ব তোমারই মাঝ।
অনন্তকাল ধরে,
কেননা তুমিই সংকীর্ণ, তুমিই সর্বব্যাপী।[৩৪২]

ইবনুল আরাবির মতবাদ "ওয়াহাদুল অজুদ" নামে পরিচিত। আগেই বলা হয়েছে। যে, ইবনুল আরাবির পর কোনো সূফী তাঁর মতবাদের প্রভাব এড়িয়ে চলতে সমর্থ হননি- সবাই-ই কমবেশি তার মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এমনকি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমিও নাকি তার প্রভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। পারস্যে জালাল উদ্দীন রুমি (১২০২-১২৭০ খ্রি.) সূফীবাদের সুবর্ণ যুগের পত্তন করেন। রুমির মসনবী শরিফকে কে বলা হয় মসনবীয়েহাস্ত, কোরআন দর জবানে পাহলবী মসনবী মুসলিম জাহানে এতই শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এমনকি বিশ্বের মরমী কাব্য দর্শনে এই গ্রন্থখানি একক গৌরবে সমাসীন রয়েছে। পরবর্তী সূফী ইরাকি (মৃত্যু ৬৮৬ হি.), শাবিস্তারি (মৃত্যু ৭২০ হি.), কাশানী (মৃত্যু ৭৩০ হি.), আলজিলি (মৃত্যু ৮১৯ হি.), জামি (মৃত্যু ৮৯৮ হি.) প্রমুখ সূফীদের ওপর আরাবির প্রভাব কমবেশি আছে। এই যুগের পাক-ভারতের সূফীদের মধ্যে খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (মৃত্যু ১৫২৪ খ্রি. ছিলেন অগ্রগণ্য। সে যুগের অন্যান্য সূফী হলেন বখতিয়ার কাকি (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রি.), ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ-শাকার (মৃত্যু ১২৫৬ খ্রি.) ও নিজামুদ্দীন আউলিয়া (মৃত্যু ১২৩৪ ইবনুল আরাবির আজুদিয়া দৃষ্টিকোণকে চ্যালেঞ্জ করেন রুকুন উদ্দীন আলাউদদৌলা। তাঁর মতে, বহির্জগৎ ঐশী সত্তা থেকে নিঃসৃত হয়নি, এটি তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সম্প্রদায় "শুহুদিয়া" দৃষ্টিকোণ নামে খ্যাত। বাহাউদ্দীন (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.) এই সম্প্রদায়ের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুহুদিয়া দৃষ্টিকোণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। পাক-ভারত বাংলাদেশের বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ আহম্মদ সারহিন্দি (মৃত্যু ১৬৪ খ্রি.) এই মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি মোজাদ্দেদ-ইআলফে সানি নামে খ্যাত।[৩৪৩]

তাসাউফের বৈশিষ্ট্য

সূফীবাদের জ্ঞানবিদ্যার আভাস প্রদানকালে আমরা বলেছি যে, নীরস যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রতি সূফীবাদের আকর্ষণ নেই; তাই পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানে পরিতৃপ্তি। তারা চান হৃদয়ের অনুভূতির নিবিড়তায় পরম সত্তার সান্নিধ্য, তার সঙ্গে মিলনের আনন্দমদিরা। সূফীদের জ্ঞান তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ ও প্রজ্ঞানিত জ্ঞান থেকে

৩৪২. ইমাম মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি: *ফুসুস আল-হিকাম* (ঢাকা: মেটাকেভ পাবলিকেশন্স) পৃ.২৯, তা.বি. স.বি.
৩৪৩. Syed Abdul Hai:*Muslim Philosophy*, p.113

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র জ্ঞান- এটি হলো হৃদয়ের উপলব্ধিজাত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কাশফের মাধ্যমে অর্জিত পরম সত্তার অভিজ্ঞতা। ইকবাল সূফী অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করেছেন। যথা-

প্রথমত:

সূফী অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ, অনুমানজাত বা পরোক্ষ নয়। মানুষের অন্যবিধ অভিজ্ঞতা যেমন জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে, সূফী অভিজ্ঞতাও তেমনি জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে। সব ধরনের অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ। মানুষের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা সংবেদন যেমন ব্যাখ্যাত হয়ে বহির্জগতের জ্ঞান দান করে, তেমনিভাবে সূফী অভিজ্ঞতাও ব্যাখ্যাত হয়ে আল্লাহর জ্ঞান প্রদান করে (সূফী অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ) এ কথার অর্থ এই যে, আমরা অন্যান্য বস্তু যেমন প্রত্যক্ষ করি, আল্লাহকেও তেমনি প্রত্যক্ষ করি- এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের বস্তু যেমন প্রত্যক্ষ করি, আল্লাহকেও তেমনি প্রত্যক্ষ করি না- এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ নয়- হৃদয়ের প্রত্যক্ষ।

দ্বিতীয়ত:

সূফী অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণধর্মী নয়- এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। এই ধরনের অভিজ্ঞতায় পরম সত্তা সমগ্রতা নিয়ে হাজির হন- এই অবস্থায় কর্তা ও কর্মের ব্যবধান লোপ পায়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র (Subject and Object) পার্থক্য অনুভব করি, সূফী অভিজ্ঞতায় তেমন পার্থক্য অনুভূত হয় না। কারণ এখানে চিন্তা অত্যন্ত গৌণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক মিশ্রিত হয়ে এক অখণ্ড ঐক্যে পরিণত হয়। ফলে এই ধরনের অভিজ্ঞতার জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র সুস্পষ্ট ভেদরেখা অপসৃত হয়।[৩৪৪]

তৃতীয়ত:

অভিজ্ঞতার এক নিবিড় মুহূর্তে, তন্ময়তার চূড়ান্তক্ষণে সূফী এক একক সত্তার অনুভূতি লাভ করে, যে সত্তা ক্ষণিকের জন্য জ্ঞাতার ব্যক্তি সত্তাকে অবলুপ্তির গহনে ঠেলে দেয়। তাই বলে এই অভিজ্ঞতা আত্মগত নয়। অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতা বিষয়নিষ্ঠ। এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে আত্মগত বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আত্মগত হলে আমাদের নিজেদের সত্তা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারতাম না। ইকবাল বলেন যে, আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে সচেতন, অন্তর্দর্শন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আমরা এটি জানতে পারি। কিন্তু অন্যের সত্তা বা অপরের মনকে জানবার জন্য স্বতন্ত্র কোনো ইন্দ্রিয় নেই। কিন্তু আমরা নিজেদের দৈহিক সঞ্চালনের ভিত্তিতে অন্যের সচেতন সত্তার অস্তিত্বের অনুমান করি। অধ্যাপক রয়েস (Royce) বলেন যে, আমাদের সঙ্গীরা আমাদের সংকেতের জবাব দেন বলে তারা আমাদের কাছে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হন। কোরআনের মতেও সচেতন সত্তার পরীক্ষা হয় এই জবাব বা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন- " فاذكروني اذكركم " "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। "(সূ : ২, আ. ১৫২)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সূফী অভিজ্ঞতা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার শ্রেণির বহির্ভূত নয়।

চতুর্থত:

সূফী অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ (Direct), কাজেই এটি যোগাযোগ রহিত। সূফীদের অভিজ্ঞতা চিন্তার চেয়ে অনুভূতির ব্যাপার। সূফী বা প্রেরিত পুরুষ তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে অন্যের নিকট বাক্যের আকারে প্রকাশ করতে

৩৪৪. The mystic state brings us into contact with total passage of reality in which all the diverse stimuli merge into one another and form a single unanalysable unity in which the ordinary distinction of subject does not exist .Iqbal-*The Reconstruction of ReligiousThought in Islam*.p.19

Dhaka University Institutional Repository

পারেন, কিন্তু সেই অনুভূত অবস্থাকে তিনি অবিকল অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"আর এটি মানুষের জন্য স্বাভাবিক নয় যে আল্লাহ ওহি দ্বারা অথবা পর্দার অন্ত রাল থেকে অথবা আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আল্লাহরই আদেশ নাযিল করার জন্য রাসূল প্রেরণ ব্যতীত তাদের সঙ্গে কথা বলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহিমান্বিত ও বিজ্ঞানময়।" (সূরা ৪২, আ. ৫২)

সূফী অভিজ্ঞতায় যোগাযাগ রহিতের মূল কারণ এই যে, এটি মূলত অস্পষ্ট অনুভূতি, যা প্রজ্ঞার দ্বারা স্পষ্ট নয়। অন্যান্য অনুভূতির ন্যায় সূফীদের অনুভূতির মধ্যেও জ্ঞানমূলক উপাদান রয়েছে। অনুভূতির প্রকৃতি এমন যে তা ধারণার মধ্যে ব্যক্ত হতে চায়। তাই অনুভূতি শেষ হয় তার সীমানার বাইরে, বিষয়ের চেতনায়। হকিং বলেন, "ধারণা যেমন বহিঃপ্রকাশী অনুভূতি তেমনি বহির্গামী এবং কোনো অনুভূতিই এমন অন্ধ নয় যার নিজের বিষয়বস্তুর কোনা ধারণা নেই।[৩৪৫]

পঞ্চমত:

সূফী অভিজ্ঞতায় নিত্যতার যে নিবিড় অনুভূতি জন্মে তা ক্রমিক সময়ের(Serial time) অবাস্তবতার ধারণা দিলেও ক্রমিক সময়ের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে না। অনন্যতার দিক দিয়েও সূফীর তন্ময়তা সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়। করণ সূফীদের তন্ময়তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, তা মুহূর্তের জন্য স্থায়ী হয়ে অপসৃত হয়। সাধক আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। পরম সত্তার সঙ্গে মিলনের তন্ময়তা ক্ষণিক হলে সূফীর চেতনার ওপর তার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরম সত্তাকে জানার বিভিন্ন পথ রয়েছে। বহিঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে সাধারণ লোক বাহ্যজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এই ধরনের জ্ঞানে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বহিঃপ্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের লৌকিক পন্থা। সূফীরা অন্তঃপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করেন। কোরআনের মতে, হৃদয় একটা জ্ঞান লাভের শক্তি। হৃদয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় সে জ্ঞান বহিঃপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের উপলব্ধি যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তবে তা সত্য হয়ে থাকে। সব মানুষই এই হৃদয়-শক্তির অধিকারী তবে এটিকে প্রবৃত্তির আবিলতা ও জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক, তাই সূফীরা হৃদয়ের শুদ্ধিকরণের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সূফী অভিজ্ঞতা কোনো অসাধারণ বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা নয়। ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা যেমন বহিঃপ্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের সুস্থতা যেমন চিন্তার জন্য প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয়, অনুভূতি বা কাশফের জন্য তেমনি হৃদয়ের সুস্থতা অপরিহার্য। প্রবৃত্তির উদ্দম আবিলতা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে এবং হৃদয়ের শক্তির অনুশীলন করলে সাধারণ লোকও সূফীর উপলব্ধি লাভ করতে পারে। মানুষের জ্ঞানের পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার যেমন এক একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, কল্‌ব বা হৃদয়েরও তেমনি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও হৃদয়- এই তিনেরই ক্রিয়ার সীমানা রয়েছে- সীমানার বাইরে গেলে তারা অচল। তবে এদের মধ্যে বিরোধ নেই।

---

৩৪৫. Feeling is outward pushing as idea is outwardreportng and no feeling is so blind as to have no idea of its own object. Quoted in *The Reconstruction of ReligiousThought in Islam-21*

Dhaka University Institutional Repository

তাসাউফ ও গোঁড়া মতবাদ :

আগেই বলেছি যে, সূফীবাদ ইসলামেরই একটি অবিচ্ছেদ্য দিক- এটি ইসলামের বাতেনি দিক। প্রথম প্রথম ইসলামের গোড়া মতবাদ ও সূফীবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে কোরআনের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর বিভিন্নরূপ গুরুত্ব আরোপের ফলে গোঁড়া মুসলমান, সূফী ও বুদ্ধিবাদী বিভিন্ন ভাগে মুসলিম সমাজের সদস্যগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামের এক একটি দিকের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই এরূপ হয়েছে। সূফীবাদ ও গোঁড়া মতবাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্য গোচরীভূত হয়-

১. ইসলাম আক্কল, নকল কাশফের (প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রথা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে এবং মানুষের জ্ঞানের এই তিনটি উৎস নির্দেশ করে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা নকলের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে, আক্কলকে অল্পই গুরুত্ব দেয় এবং কাশফের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই অস্বীকার করে।পক্ষান্তরে সূফীরা কাশফের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

২. গোঁড়া মুসলমানরা কলেমা তাইয়েবা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বলতে বুঝেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর তাৎপর্য বলতে গোঁড়া মুসলমানরা বুঝে থাকেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়, কিন্তু সূফীরা এর গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেন। তাদের মত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর তাৎপর্য হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা নেই।

৩. সাধারণ মুসলমানরা কোরআনের শাব্দিক অর্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু সূফীরা বলেন যে, কোরআনের আয়াতসমূহের বাহ্য ও গূঢ় দ্বিবিধ তাৎপর্য আছে এবং কোরআনের এই গূঢ় অর্থই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

৪. গোঁড়া মুসলমানরা আল্লাহর ভয়ে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করেন। তাঁদের মতে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী- তিনি পাপীকে সাজা দেন; পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করেন। কাজেই সাধারণ মুসলমানরা নরকের ভয়ে এবং স্বর্গের লোভে আল্লাহর ইবাদত করেন। পক্ষান্তরে সূফীদের নিকট আল্লাহ প্রেমময়। সূফীরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য, তাঁর প্রীতি লাভের জন্য তাঁর ইবাদত করেন- স্বর্গের লোভ কিংবা নরকের ভীতি তাদেরকে মোটেই বিচলিত করতে পারে না। গোঁড়া মুসলমানদের মতে, আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। কিন্তু সূফীদের মতে, আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেমাস্পদ-প্রেমিকের-মাশুক-আশেকের সম্পর্ক।

৫. গোঁড়া মুসলমানের শরিয়তের বিধান সব মুসলমানের অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন- কোনোক্রমেই কোনো মুসলমানের পক্ষে এই কর্তব্য বর্জন করা উচিত নয়। কিন্তু কোনো কোনো সূফী শরিয়তের বিধান পালনের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। অবশ্য যে সব সূফী আল্লাহর প্রেমে এতই মশগুল হয়ে থাকেন যে তাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, সেসব সাধকের প্রতি শরিয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা আমাদের সমাজের বাইরের লোক- তারা আল্লাহর পথে মজনু।[৩৪৬]

৬. গোঁড়া মুসলমানরা ধর্মের নীতিসমূহ বিনাবিচারে গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করেন, কিন্তু সূফীরা মনে করেন যে, ইশকের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

---

৩৪৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭. গোঁড়া মুসলমানরা মনে করেন যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মধ্যেমেই মুসলমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো পথপ্রদর্শক বা পীরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সূফীদের মতে, আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার জন্য আধ্যাত্মিক আলোকেআলোকিত পীর বা সূফীদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

৮. গোঁড়া মুসলমানরা মনে করেন যে, মানুষ সাধনায় যতই পূর্ণতা লাভ করুক না কেন কখনোই আল্লাহর সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। কেননা মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। অপরপক্ষে সূফীরা মনে করেন যে, আল্লাহর সঙ্গে মিলনে মানব জীবনের পরম সার্থকতা- মানব জীবনের পরিপূর্ণতা। কেননা মানুষের আত্মা আল্লাহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর সঙ্গে মিলনের ব্যাপারে বিভিন্ন সূফীদের মধ্যে মতভেদ আছে।

৯. সূফী মুসলমানরা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের কতগুলো মনজিল পার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা এই স্তরসমূহ সম্পর্কেঅবহিত নন।

১০. গোঁড়া মুসলমানদের মতে, মৃত্যুর পর আত্মা পরিপূর্ণ স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবংপাপপুণ্য অনুসারে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু সূফীদের মতে, মানুষের আত্মা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব-আত্মা আল্লাহর মধ্যে বিলুপ্ত বা সমাহিত হয়ে যাবে।

তাসাউফ ও অন্যান্য মরমীবাদ :

ইসলামি মরমীবাদকে সূফীবাদ বলা হয়। সূফীবাদ ইসলামের বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়, এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান দিক। সূফীবাদ ইসলামের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক উপাদানের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ইসলামের দুটি দিক আছে, জাহের ও বাতেন বাহির ও ভেতর। ইসলামের এই জাহেরি ও বাতেনি দুটি দিক পরস্পর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির বিকাশ সাধন অসম্ভব।[৩৪৭] যুগে যুগে প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন রূপে মরমীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। জগতে প্রত্যেক যুগে এমন একদল লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস করেন এবং আত্মবিনাশের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে চান। কিন্তু সূফীবাদ ও অন্যান্য মরমীবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত:

সূফীবাদ ও অন্যান্য মরমীবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, সূফীবাদ আত্মার পবিত্রকরণের ব্যাপারে মানুষের দৈহিক অবদানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না, কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদ মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক আবেদনের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান মিস্টিকরা আত্মনিগ্রহকে মুক্তির বা মোক্ষলাভের উপায় বলে মনে করেন, কিন্তু মুসলিম মরমীবাদগণ (সূফীগণ) জীবনের পার্থিব তাৎপর্য নস্যাৎ করে আত্মিক সাধনায় মুক্তির অনুসন্ধান করেন না। ইসলামের শিক্ষানুসারে সূফীরা জীবনের পার্থিব ও অপার্থিব, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিককে বিচ্ছিন্ন করেন না। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে উভয়ের যুগ্ম ভূমিকা স্বীকার করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূফীবাদ জীবনের পূর্ণাঙ্গ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদ জীবনের আংশিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

৩৪৭. Syed M Nadvi, *Muslim Thought and Its Source,* p.103

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ

সূফীবাদ জীবনের অন্যান্য সাধনার সঙ্গে শ্রেয় ও প্রেমের সাধনাকে আলাদা করে না। জীবনের প্রত্যেক স্তরের সান্নিধ্য ও কর্তব্যের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে,জীবনের অন্যান্য মরমীবাদ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর সীমারেখা টানে এবং জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে। মরমীবাদী সাধকরা সাধারণত সন্ন্যাস জীবনযাপনের পক্ষপাতী, তাঁরা ধ্যান ও চিন্তায় এত মশগুল থাকেন যে, জাগতিক কার্যাবলির সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু সূফী পরিবার ও সমাজের সদস্য, রাষ্ট্রের নাগরিক অর্থাৎ সূফী সাধক তাঁর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বমানবের প্রতি যথাকর্তব্য সম্পাদন করেন। এই সমস্ত কর্তব্য ছাড়া তিনি আল্লাহর ইশকে বলীয়ান হওয়ার জন্য সাধনা করেন এবং হৃদয়ের শক্তিনাশী অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করেন। পূর্ণ মনুষ্যত্বে দেদীপ্যমান হওয়াই বা ইনসানে কামিল হওয়াই সূফী শিক্ষার মূল ।

তৃতীয়তঃ

সূফীবাদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে তৃতীয় কোনো শ্রেণি স্বীকার করে না, কিন্তু অন্যান্য মরমীবাদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে এক তৃতীয় পক্ষ বা মাধ্যম স্বীকার করে। এই মতানুসারে আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ সাধন সম্ভব নয়। কোরআনের ঘোষণা, "(হে রাসূল) আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, আমি নিশ্চয় তাদের অতি সন্নিকটে আছি। কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি।" ইসলাম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক ধর্ম। এটি মানুষে মানুষে পার্থক্য করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিশ্বাসী মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি অধিক সম্ভ্রান্ত যে ব্যক্তি অধিক সত্যপরায়ণ। হযরত (সা.) নিজেও মানুষ জাতির ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেননি, বরং তিনি নিজেকে একজন মানুষ বলেই প্রচার করেছেন। "(হে রাসূল) বলুন, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। তবে আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ আছে যে, তোমাদের উপাস্য প্রভু শুধুমাত্র একজন। আর যে ব্যক্তি তার সন্দর্শন কামনা করে, সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর অর্চনায় আর কাউকেও শরিক না করে।"[৩৪৮] সূফী সাধকরা কোরআনের শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর সঙ্গে যোগাযাগের ব্যাপারে কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। কিন্তু সূফী ব্যতীত অন্যান্য মরমীবাদী সাধকরা আল্লাহ ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে এক পুরোহিত শ্রেণি খাড়া করেন। সূফীবাদ আল্লাহ ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে কোনো মধ্যস্থের প্রয়োজন স্বীকার করে না।

চতুর্থতঃ

অন্যান্য মরমীবাদ ঐশী সত্তার মধ্যে অবলুপ্ত হওয়াকে আধ্যাত্মিক সাধনার চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, কিন্তু সূফীবাদ আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। সূফীবাদের মতে, আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি শূন্য হতে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ধ্বংস হবে কিন্তু আল্লাহ পাক থাকবেন। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বর্তমান। মানুষ যদি আল্লাহর মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যায় তবে প্রেম চলবে কি করে? সূফীবাদ তাই আত্মবিলুপ্তির চেয়ে আত্মোপলব্ধির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সূফী(মনসুর হাল্লাজ) যখন আনাল হক বলেছিলেন তখন তিনি নিজেকে আল্লাহ মনে করেননি। তিনি সেই ই মুহূর্তিক তন্ময়তায় আল্লাহর অপরিসীম শক্তির প্রাবল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন মাত্র।[৩৪৯]

---

৩৪৮. আল-কুরআন, ১৮;১১০

৩৪৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাসাউফে সূফীর পথপরিক্রমা :

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর ইশকে বলীয়ান হওয়াই সূফী জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সূফীকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা কষ্ট-ক্লেশের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে, বিনয়াবনত চিত্তে পথ অতিক্রম করতে হয়। সূফীর যাত্রাপথ দীর্ঘ। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তাকে নিম্নলিখিত মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়। যথা-

(১) শরিয়ত, (২) তরিকত, (৩) মারেফাত এবং (৪) হাকিকত। এসব মঞ্জিল অতিক্রমের মধ্য দিয়ে সূফীর আত্মার বিকাশ সাধিত হয় এবং সূফী জীবনের চরম চাওয়াকে পেয়ে থাকেন।

১. শরিয়ত :

শরিয়ত সূফীর যাত্রাপথের প্রারম্ভ। শরিয়ত ইসলামি জীবন বিধানের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে। আধ্যাত্মিক জীবনের রূপায়ণের জন্য শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুশীলনের মাধ্যমে সূফীকে ভবিষ্যতের কঠোর ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের অন্যান্য বিধান পালনের মাধ্যমে সূফী আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি পর্ব সমাধান করেন। শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে সূফী তার প্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, দেহকে আত্মার অধীনে আনয়ন করেন। আল্লাহ এই সম্পর্কে কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করেছেন।

"আর যে ব্যক্তি তার সন্দর্শন কামনা করে সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর অর্চনায় আর কাউকেও শরিক না করে।"[৩৫০] "হে মুমিনরা, আল্লাহকে মেনে চলিও; রাসূলকে মেনে চলিও, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের।" কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সূফীর দীর্ঘ পরিক্রমায় শরিয়ত প্রারম্ভিক স্তর এবং এর বিধান সর্বতোভাবে পালনীয়।

২. তারিকত :

যখন সূফী শরিয়তের বিধানসমূহ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেন, তিনি দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হন। এই স্তর প্রথম স্তর অপেক্ষা উচ্চতর। এই স্তরে সূফী মুর্শিদের (আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত ব্যক্তির সাহায্যে গ্রহণ করেন। এই স্তরে মুর্শিদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন, বিনা প্রশ্নে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মুর্শিদের নির্দেশ অনুসরণ সূফীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সূফী সাধক যখন এই স্তরের সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করে মুর্শিদের সন্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হন, তখন তিনি মুরিদ হিসেবে গণ্য হন। এই স্তরে মুরিদ মুর্শিদের (পীরের) ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এই স্তরকে ফানায়ে শেখ বলা হয়।

৩. মারেফাত :

মারেফাত আধ্যাত্মিক আলোকের স্তর। এই স্তরে সূফী সাধকের কল্‌ব আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হয়। তিনি বস্তুর নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে শুরু করেন। সৃষ্টি রহস্যের কালো যবনিকা তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখ থেকে সরে যায়। সূফী মোরাকাবা (ধ্যান) বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি কৌশল মানবজীবনের গুপ্ত রহস্য ভেদ করে এক ঐশী জ্ঞানালোকের আভাপ্রাপ্ত হয়। সূফীর ধেয়ানী অন্তরের সম্মুখে খুলে যায় এক অপার খোদায়ী শক্তির লীলাচাঞ্চল্য- এক তীব্র জ্যোতির্ময় আলোর বিচ্ছুরণ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই স্তরে আল্লাহ সাধকের হৃদয় ঐশী আলোকে দীপ্ত করে তাকে সৃষ্টির গভীর রহস্য উপলব্ধির উপযোগী করে তোলেন। এখানে সাধক আল্লাহতে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ। তার সমস্ত সত্তা ঝংকৃত এই প্রার্থনা বের হয়, "আমার উপাসনা, আরাধনা, উৎসর্গ অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মরণ, সমস্তই বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর জন্য।"[৩৫১]

---

৩৫০. আল-কুরআন, ১৮;১১০

৩৫১. আল-কুরআন, ০৭;১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. হাকিকত :

এটিই পরবর্তী উচ্চতর স্তর। এই স্তরে সূফী সত্য উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি আল্লাহর অসীম করুণার ওপরই নির্ভর করে, আল্লাহর অনন্ত রহমতের পরশ ব্যতীত কেউই তাঁর জ্ঞানের, সৃষ্টির কণা মাত্রও জানতে পারে না। সূফীরা বিশ্বাস করেন যে শুধু ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে এই সত্য জ্ঞান লাভ করা যায় , হৃদয়ে শুদ্ধিকরণের মাধ্যমেই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। তাঁদের মতে, প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমা সম্ভব হয়ে থাকে। প্রেম, ভক্তি, সংযম ও সততার মাধ্যমে হৃদয়কে শুদ্ধবুদ্ধ করা যায়। সূফীদের মতে, আল্লাহ পরম সত্তা, আর বাকি সবকিছু তার শক্তির অভিব্যক্তি। আল্লাহর সঙ্গে মিলনই সূফীর কাম্য। তিনি অগণিত হৃদয়ে প্রতিফলিত হলেও তিনি এক। এই একের সাধনই সূফীর সাধনা। সূফীরা আল্লাহর ধ্যানে ও প্রেমের মাধ্যমে নিজেকে এমন সুউচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন যেখানে তারা নিজেদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে থাকেন। এই স্তরের নাম ফানাফিল্লাহ। এই ফানা ফিল্লাহ স্তরে সাধক নিজের সাধনার কথাও বিস্মৃত হন- আল্লাহর প্রেম মদিরা পানে এতই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েন যে, অনেক সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। হাকিকত স্তরে সূফীর নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আল্লাহর ইচ্ছায় তার ইচ্ছা সমর্পিত হয়। এই স্তরে সাধকের হৃদয়ে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। এরূপ সাধনাশুদ্ধ আত্মার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে "হে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকদের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।[৩৫২]

তাসাউফের মূলনীতিসমূহ (Fundamental Tenets of Sufism):

সুফীবাদের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। পরম সত্তার সঙ্গে মিলনে পরম পাওয়ার যে চরম পরিতৃপ্তি তাই সূফী সাধকের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন এবং আপাতমধুর ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে তাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের (ইনছানে কামিল) সাধনায় সার্থক করে তোলে। এই সাধনায় সূফীদের মূলনীতিসমূহ সাহায্য করে থাকে।

১. তওবা (অনুতাপ) :

পাপ পরিবর্জন করা এবং আর পাপ পথে অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই হলো তওবা। ঔদাসীন্যের মোহনিদ্রা থেকে আত্মার জাগরণই তওবা। অনুতপ্ত ব্যক্তি পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য শপথ গ্রহণ করে। আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রারম্ভিক স্তরে যারা বিচরণ করেন সেই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে তওবা হলো কৃতপাপের জন্য অনুশোচনা, কিন্তু যারা এই পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের জন্য তওবা হলো আল্লাহকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য অনুশোচনা। এই অর্থে তওবা হলো প্রেমময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব বস্তু থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। শুধু অমঙ্গল থেকে বিরত হওয়াই তওবা নয় বরং জগতের সমুদয় বস্তু থেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতাই হলো তওবা। সাধনার উচ্চ স্তরে সূফী সাধক তার পাপকেও বিস্মৃত হন, কেননা পাপের চিন্তা সাধক ও আল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৩৫২. আল-কুরআন, ৮৯;২৭-৩০

Dhaka University Institutional Repository

২. তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) :

সব অবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নাম তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল তৌহিদের ধারণা থেকেই আসে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কাল্পনিক বা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরতা ইসলামবিরোধী। আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই সূফীর লক্ষ্য। এটিই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু কোনো কোনো সূফী তাওয়াক্কুলকে চরমভাবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ধ্যান ব্যতীত জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটানোর জন্যও কোনো চেষ্টা করেন না, কিংবা কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন না।

৩. পরিবর্জন :

সূফী সাধক পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করেন এবং আল্লাহর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করেন। পরিবর্জন দ্বিবিধ : বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য পরিবর্জনের মাধ্যমে সূফীগণ তার দৈহিক প্রয়োজন হ্রাস করেন। আন্তর পরিবর্জনের মাধ্যমে সূফীগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আবেদন থেকে আত্মাকে মুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে সূফী সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়ার উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "স্বল্প আহার, স্বল্প কথন, স্বল্প মেলামেশা ও স্বল্প নিদ্রার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের পূর্ণতা। পরিবর্জনের নীতির ব্যাপারে দেখা যায় কোনো কোনো সূফী সাধক পার্থিব সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন, আবার কেউ কেউ জীবনের মামুলী প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সবই পরিবর্জন করতেন। তাপসী রাবেয়া বসরি বলতেন, "সর্বোত্তম কাজ যা মানুষকে আল্লাহর নিকট পৌছায় তা হলো, সে আল্লাহ ব্যতীত ইহজগৎ বা পরজগতের কোনো বস্তুর প্রতি তোয়াক্কা রাখবে না।

৪. সবর ধৈর্য) :

দুঃখ, বিপদ ও আল্লাহর পরীক্ষায় মনের ভারসাম্য রক্ষা করাই সবর বা ধৈর্য। কোনো কোনো ব্যক্তি সময়ে সময়ে ধৈর্য ধারণ করে, কিন্তু মাঝে মাঝে ধৈর্য হারায়, আবার কেউ কেউ আছেন যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন এবং কোনো অবস্থায় তাদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন না। আবার একদল লোক আছেন যারা জীবনের কোনোরূপ দুর্ঘটনায় বিচলিত হতে জানেন না। সূফীদের মধ্যে সাধনার স্তরের তারতম্যের জন্য সবরের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে, কিন্তু সূফী সাধকরা জীবনের মূলনীতি হিসেবে সবরের অনুশীলন করে থাকেন। ইমাম গাজালি বলেন যে, "ধৈর্য শয়তানের প্ররোচনা ও আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারিতে পূর্ণ বিশ্বাস। প্রলোভন জয় করে আল্লাহর প্রেমের পথে টিকে থাকার এক পরম টনিক হলো সবর।

৫. আত্মসমর্পণ :

সূফী সাধকের আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার প্রারম্ভে মুর্শিদের প্রতি আত্মসমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন। ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশ ব্যতীত যেমন কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হতে পারে না, তেমনিভাবে সূফী সাধকের পক্ষেও মুর্শিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত না হলে ইলমে মারেফাত অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই মুরিদকে মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সাধনার উচ্চস্তরে সূফী সাধক নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে বিলিন করে দেন, তার অন্তর মথিয়া ধ্বনিত হয়। "তোমারি ইচ্ছা করহ পূর্ণ আমারই জীবন মাঝে।

৬. এখলাস (পবিত্রতা) :

সূফী সাধকরা হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করেন। কারণ, সূফীদের মতে, একমাত্র পূত-পবিত্র অন্তঃকরণে আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হয়। সূফীরা সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

মনে স্থান পায় না। সন্দেহাত্মক কাজ পরিত্যাগ করা, বিবেকের বিরোধী কাজ বর্জন করা এবং যে কাজ আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায় এমন কাজ পরিবর্জন করা পবিত্রতা অর্জনের সহায়ক। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন এবং পার্থিব বস্তুর মোহপাশ এড়ানোর মাধ্যমে সূফী অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করে।

৭. ইশকে আল্লাহ (আল্লাহপ্রেম) :

আল্লাহপ্রেমই সূফীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। সূফীদের আত্মা সর্বদা আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকে। পার্থিব কোনো বিষয়ই সূফীকে আল্লাহর চিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারে না। এই কারণে সূফীবাদ প্রেমধর্ম নামে পরিচিত।

বিশ্ববিখ্যাত সূফী সাধক কবি জালাল উদ্দিন রুমিও বিশ্বের নর-নারীর হৃদয়ে সেই পরম সুন্দর আল্লাহর বিরহব্যাকুল ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন :

"বেশনো আজ নায়া চুহেকায়েত মিকুনাদ
আজ জুদায়িহা শেকায়েত মিকুনাদ
কেয্ নায়েস্তান তাবুরা বুরিদা আন্দ
আয্ নফিরাম মারদ ও যন্ নালিদা আন্দ।"

কবি রবীন্দ্রনাথের কথায়ও সেই একই স্বীকৃতি :

"দুঃখের বেশে এসেছো বলে তোমারে
নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমায় নিবিড়
করে ধরিব হে।"[৩৫৩]

আল্লাহর সঙ্গে সাধক ভক্তের প্রেমের রসঘন বহু উদ্ধৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেয়া চলে। সূফীদের ইশকের ধারণা এতই সার্বজনীন যে পৃথিবীর বড় বড় চিন্তাবিদও এই ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত নন।

৮. জিকর (স্মরণ) :

আল্লাহর কোনো নাম বা কোরআনের কোনো আয়াত বারংবার আবৃত্তি করার নাম জিকর। ফানা ফিল্লাহ অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য সাধক জিকরের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোরআনে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীরা, যত বেশি সম্ভব আল্লাহর জিকর কর, আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা কীর্তন কর"।(সূ : ৩৩, আ. ৪১-৪২)

সূফীরা কোরআনের এই আয়াতের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জিকরকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথে এক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। বস্তুত কোরআনের অন্যত্রও আল্লাহর জিকরকারীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। জিকর দুই প্রকারের : জিকরে জলি (উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম আবৃত্তি করা) এবং জিকরে খফি (নীরবে আল্লাহর নাম আবৃত্তি করা)। জিকরের মূল সূত্র হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। নিজ সত্তা বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াই জিকরের উদ্দেশ্য।

৯. শোকর (কৃতজ্ঞতা) :

সব অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফী সাধনার অন্যতম মূলনীতি। ইমাম আল-গাজালির মতে, ঈমানই কৃতজ্ঞতার উৎস। সমুদয় কল্যাণ আল্লাহর অসীম করুণা থেকে নিঃসৃত। কাজেই যে কোনো প্রকার ফায়দা

৩৫৩. মাওলানা জালালউদ্দীন রুমি: অনুবাদ- মাওলানা শামসুল হক, *মসনবি শরীফ* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস) তা.বি. স.বি. খ.-১, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

(উপকার) আল্লাহর দান। এই ঐশী কল্যাণের ধারণাই সূফীকে সর্বোতভাবে আল্লাহর শোকর গোজারি করতে প্রেরণা দান করে। সূফী তার সমগ্র জীবন সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাঁর হৃদয় সিঞ্চিত আল্লাহপ্রেমকেও তিনি আল্লাহর দান হিসেবে মনে করেন। বাংলার মাটিতেও সূফীবাদের কৃতজ্ঞতার সুর অবিকৃত রয়েগেছে।

"প্রেম তোমারই দান, তুমি ধন্য ধন্য হে।"

১০. কাশফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) :

সূফীবাদের মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সাধক আল্লাহর সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারেন, প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি এ ব্যাপারে সূফীকে আল্লাহর জ্ঞান দিতে পারে না। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আসে সূফীরতন্ময়তা বা ফানাফিল্লাহ অবস্থায়। সাধনার উত্তুঙ্গস্তরে উন্নীত হয়ে সূফী যখন কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, এক অপরিসীম শক্তির প্রাবল্যের স্পর্শে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি বিস্মৃত হন, অনুভূতির এমন নিবিড় মুহূর্তে তিনি আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সূফী অভিজ্ঞতার এহেন নিবিড় মুহূর্তের নাম হাল। এই অবস্থায় ঐশী জগতের অপার রহস্যের দ্বার সূফীর অন্তর চক্ষুর সামনে খুলে যায়, চাওয়ার চরম প্রাপ্তি মুহূর্তে সূফী পরম আনন্দে নিজেকে বিস্মৃত হন- তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়।

১১. সঙ্গীত :

কোনো কোনো সুফী সঙ্গীতপ্রিয়। তারা মনে করেন যে, সঙ্গীতের মূর্ছনা অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং মনকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। চিশতিয়া তরিকার সূফীরা সঙ্গীত শ্রবণ সমর্থন করেন। তাঁরা তাম্বুরা বাজিয়ে সামা গেয়ে আধ্যাত্মিক প্রবণতা জাগিয়ে তোলেন। সঙ্গীত তাদেরকে জজবার পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিন্তু নিম্নস্তরের সঙ্গীত মনে পঙ্কিলতা আনয়ন করে, এই ধরনের সঙ্গীত নিষিদ্ধ। অন্যান্য তরিকার সূফীরা সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, আল্লাহর জিকরই তন্ময়তা প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট বলে তারা মনে করেন।

১২. আধ্যাত্মিক জ্ঞান :

আল্লাহর জ্ঞানই সূফীবাদের লক্ষ্য। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। পরম সত্তার জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। এই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে ধ্যান, প্রেম, পবিত্রতার সাহায্যে বুদ্ধি ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে পারলে ঐশী জ্ঞান লাভ করা যায়। কোরআন শরীফের মধ্যে সত্যজ্ঞান লাভের তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছে: ইলমুল ইয়াকিন (অনুমানলব্ধ জ্ঞান), আয়নুল ইয়াকিন (প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞান) এবং হাক্কুল ইয়াকিন (উপলব্ধিজাত জ্ঞান)।[৩৫৪] সূফী যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন তা এই তিন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ইলমুল ইয়াকীন বা অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূফী বুদ্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জ্ঞান বুদ্ধির নির্ভর। আয়নুল ইয়াকীন বা প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি তন্ময়তা বা হাল অবস্থায় আধ্যাত্মিক গোপনীয়তা বিষয়সমূহ অবগত হয়ে থাকেন। হাক্কুল ইয়াকিন বা উপলব্ধি জাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূফী দরবেশ পরম সত্তার সঙ্গে মিলন অনুভব করেন।

৩৫৪. আল-কুরআন, ১০২;০৫, ০৭

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ফানা ও বাক্কা :

সূফী সাধনার পূর্ণতা ঘটে ফানা ফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ-এ উপনীত হওয়ার মধ্যে। ফানা ও বাক্কা সূফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। ফানা মানে আত্মবিনাশ, এই স্তরে সূফী তন্ময়তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে মুছে দিয়ে ঐশী চেতনায় উন্নীত হন। এই স্তরে সাধক প্রবৃত্তি ও কামনার মায়াজাল ছিন্ন করে ঐশী সত্তায় প্রদীপ্ত হন। তাঁর ব্যক্তিগত চৈতন্য আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমে সমাহিত হয়, সর্বশেষ স্তর হলো বাক্কা। বাক্কা মানে ঐশী সত্তায় স্থায়িত্ব লাভ করা। এই স্তরে সূফী সাধক আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন। বাক্কা বিল্লাহ অবস্থায় সাধক ঐশী গুণে গুণান্বিত হন এবং তার সমুদয় ইচ্ছা খোদার ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হয়।

অনুচ্ছেদ-৪

তাসাউফের প্রমাণ

কোন বিষয়ের ফয়সালা (মীমাংসা) কুরআনের দ্বারা হইয়া গেলে পরে আর হাদীছ, ইজমা বা কিয়াসের প্রমাণ তালাশ করার দরকার করে না। এই রূপে কোন বিষয়ের ফয়সালা সহীহ হাদীছের দ্বারা হইয়া গেলে তারপর আর কোন ইজমা, কিয়াসের প্রমাণ তালাশ করার দরকার করে না। যদি কোন বিষয়ের ফয়সালা (পরিস্কার মীমাংসা) কুরআনে না পাওয়া যায় তবে হাদীছের মধ্যে তাহার মীমাংসা তালাশ করিতে হয়। যদি হাদীছের মধ্যেও পরিষ্কার মীমাংসা না পাওয়া যায় তারপর তালাশ করিতে হয় যে, সাহাবা, তাবেয়ীন বা আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কাহারও বিরুদ্ধাচরণ ব্যতিরেকে একমত হইয়া ইজমা করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআন-হাদীছের সনদসহ কোন মীমাংসা দিয়াছেন কি না? যদি এইরূপ ইজমাও না পাওয়া যায় তারপর আশ্রয় নিতে হয় কুরআন-হাদীছের অনুরূপ ইজতিহাদের এবং কিয়াসের। উপরিউক্ত চারিটি দলিলই ইসলামের । এই চারি দলিলের যে কোন একটি দলিলের দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হইলেই যথেষ্ট হইবে, এক দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হইলে অন্য দলিলের দরকার করে না। কিন্তু হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে হাদীস সহীহ কিনা তাহা দেখিতে হইবে এবং ইজমার দ্বারা প্রমাণিত হইলে ইজমার সনদ আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে এবং ইজতিহাদ ও কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত হইলে কুরআনের কোন আয়াত হইতে বা কোন সহীহ হাদীস হইতে ইজতিহাদ ও কিয়াস করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইজতিহাদ দ্বারা কুরআনের আয়াতের এবং হাদীছের অর্ন্তনিহিত সুক্ষ্মতত্ত্ব ও সূক্ষ্মবস্তু কুরআন-হাদীছের অনুরূপ বস্তু বাহির করা হইয়াছে না পরানুকরণ করিয়া ইসলামের মধ্যে পরগাছার আমদানী করা হইয়াছে । যদি প্রকৃত ইজতিহাদ ও সত্যিকার কিয়াস হয় তবে তাহা মানিতে হইবে, আর যদি পরগাছা হয় তবে তাহা কাটিয়া ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। হক্কানী উলামা ও হক্কানী মাশাইখগণ সর্বযুগে এইরূপই করিয়াছেন।[৩৫৫]

দ্বিতীয়ত এক হইয়াছে (تصوف) তাছাওওফ শব্দ, আর এক হইয়াছে ইলমে তাছাওওফের হকীকত অর্থাৎ তাছাওওফের আসল বিষয়বস্তগুলি। তাছাওওফ (تصوف) শব্দটি কুরআনে বা হাদীছে নাই বা সাহাবাদের যামানতেও এই শব্দের এবংএই পরিভাষার প্রচলন হয় নাই, অবশ্য তাবেয়ীদের এবং তাবেতাবেয়ীনদের যুগ হইতে এই শব্দ এবং এই পরিভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাছাওওফের হাকীকত অর্থাৎ তাছাওওফের আসল বিষয়-বস্তগুলি কুরানের দ্বারা, সহীহ হাদীছের দ্বারা, ইজমার দ্বারা এবং ইজতিহাদ ও কিয়াসের দ্বারা প্রামণিত আছে।[৩৫৬]

---

৩৫৫. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ): প্রাগুক্ত
৩৫৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এখানে জানিয়া রাখা দরকার যে, এক হইয়াছে সহীহ (বিশুদ্ধ) তাছাওওফ, যাহা ইল্‌মে তাছওওফের ইমামগণ (যেমন হাসান বসরী, হারিস মুহাসীবী, জুনায়দ বোগদাদী, মারূফ কারখী, ফুযাইল ইবনে আয়ায, ইমাম গাজালি, সায়্যেদোনা আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, খাজা শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দী, সায়্যেদোনা আহমাদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী, ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, সায়্যিদ আহমদ বেরেলবী রহমতুল্লাহে আলায়হিম প্রমুখ বুযুর্গানে দীন) কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আর এক হইয়াছে গলত ও কৃত্রিম তাছাওওফ। ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্টগণ গলত তাছাওওফকে Sufism বলিয়া তা ভারতীয় যোগীদের নিকট হইতে ধার করা বলিয়া শত শত বই লিখিয়া সহীহ তাছাওওফের অফুরন্ত বরকত ও ফয়েয হইতে মানুষকে মাহরূম করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে একদল ভন্ড তপস্বী তাছাওওফের নামে পেট পালিবার জন্য, নাম করিবার জন্য, কবর পূজা, পীর পূজা, পয়গাম্বর পূজা ইত্যাদি করিয়া, মাযারে টাকা দিলে সকলের সকল মকসুদ হাসিল হইয়া যাইবে, পীরকে জাহিরী আল্লাহ্ মানিয়া সিজদা করিলে দোষ নাই; বরং সব মকছুদ হাসিল হইয়া যাইবে, বাতিন ঠিক থাকিলে তরীকত পন্থীদের আর জাহিরী শরীয়তের ইলম হাসিল করার বা শরীয়ত পালনের দরকার হয় না, ইত্যাদি বাতিল কাজ করিয়া এবং বাতিল কথা বলিয়া এবং খৃষ্টানগণ আধ্যাত্মিকতার (তাছাওওফের) দোহাই দিয়া, ঈসা পয়গাম্বরকে আল্লাহর পুত্র মানিয়া, মিথ্যা আল্লাহর পুত্রকে মিথ্যা শূলিতে বধ করা হইয়াছে মানিলে সব পাপ মোচন হইয়া যাইবে, এই মিথ্যা প্রচার করিয়া দুনিয়ার মানুষকে পাপে ডুবাইবার ব্যবস্থা চালু করিয়া আল্লাহর প্রেরিত আল্লাহর রসূলগণের প্রচারিত খাঁটি ধর্মকে, খাঁটি ইসলামকে এবং খাটি আধ্যাত্মিকতাকে নষ্ট করিতেছে।

তৃতীয় আর এক প্রকার লোক আছে তাহারা ভন্ড বা ধোকাবাজ নহে। কিন্তু প্রকৃত তাছাওওফকে তাহারা বুঝে নাই, তাহাদের রূহানী তরক্কী বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের খাঁটি তাছাওওফের ইলম হাসিল করিয়া নিজেদের সংশোধন করা এবং রূহানী তরক্কী করা দরকার।[৩৫৭] নিম্নে তাসাউফের সপক্ষে কুরআন হাদিস থেকে কিছু প্রমান উপস্থাপন করা হলো-

<u>কুরআনের প্রমাণঃ</u>

কোরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আয়াতসমূহ হযরতের নিকট নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সূফীবাদের সূত্রপাত।

১."هوالاول والاخر والظاهر والباطن- و هو بكل شيء عليم " "তিনি (আল্লাহ) আদি ও অন্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাত"।[৩৫৮]

২." يد الله فوق ايديهم " "আল্লাহর ক্ষমতা তাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে" (৪৮-১০)।

৩." و لله المشرق والمغرب – فاينما تولوا فثم وجه الله – ان الله واسع عليم " "আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমে আছেন, কাজেই যেখানে তোমাদের মুখমণ্ডল ফিরাও না কেন সেখানেই আল্লাহ আছেন" (২-১১৫)।

৪. " و هو معكم اين ما كنتم " "তোমরা যেখানেই যাও না কেন সেখানেই আল্লাহ আছেন" (৫৭-৪)।

৫." و نحن اقرب اليه من حبل الوريد " "আল্লাহ মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী"(৫০-১৬)।

৬."وسع كرسيه السموت والارض " "দ্যুলাক-ভূলাকব্যাপী তাঁর সিংহাসন বিরাজমান" (সূ. ২, আ. ২৫

৩৫৭. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯-১১

৩৫৮. আল-কুরআন, ৫৮;০৩

Dhaka University Institutional Repository

৭."و هو معكم اين ما كنتم" "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।" (সূ. ৫৭, আ. 8)

৮."و اذا سالك عبادي عني فاني قريب – اجيب دعوة الداع اذا دعان" "আমি নিশ্চয়ই তাদের অতি সন্নিকটে আছি। কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বান সাড়া দিয়ে থাকি।" (সূ. ২, আ. ১৮৫)

৯."الله نورالسموت والارض" "আল্লাহ ভূলোক-দ্যুলোক বিশ্বভুবনের জ্যোতি। (সূ. ২৪- আ. ৩৫)

১০ "و نفخت فيه من روحي" "আমি তার মধ্যে আমার রুহু প্রবিষ্ট করেছি।"(সূ, ১৫ আ, ২৯)।

১১."يحبهم و يحبونه" "তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাকে ভালোবাসে।"[৩৫৯]

১২. "فاذكروني اذكركم" "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[৩৬০]

এই সমস্ত আয়াত ও অনুরূপ আয়াতসমূহ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করে যে, বিশ্বজাহান ঐশী শক্তির মূর্ত প্রকাশ, সৃষ্টি আল্লাহর শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। আল্লাহ মানুষের ধমনিতে বিরাজিত। মানুষ আল্লাহর হাতের ক্রীড়নকমাত্র।

হাদিসের প্রমাণঃ

১."الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هي القلب"

"তোমরা জেনে রাখো,মানুষ সৃষ্টি হয়েছে দু' প্রকার জিনিষের দ্বারা। তার একটি দৃশ্য,অন্যটি অদৃশ্য। অদৃশ্য অংশটির নাম ক্বলব,দিল,বিবেক,বুদ্ধি,রুহ ইত্যাদি। যখন মানুষের দিল ও বুদ্ধি সোজা পথে আসে তখন গোটা মানুষটাই সোজাপথে আসে,আর যখন বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে,বুদ্ধি টেড়া পথে যায়,তখন গোটা মানুষটাই বিকৃত হয়ে যায়।"

২. "الا احسان ان تعبد الله كانك تراه"

"অল্লাহর বন্দেগী এমনভাবে করো,যেনো তুমি আল্লাহর সামনে আছো, তুমি আল্লাহকে দেখছো। কমসে কম এতটুকু মনে করো, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"

৩. "انما الاعمال بالنيات"

"জাহেরী আমলের মূল্য নিরূপিত হয় নিয়্যতরে দ্বারা"[৩৬১]

৪. "من لم يرحم لا يرحم"

"যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়াবান না হয়, তারা আল্লাহর দয়া পায় না।"

৫. "عليكم باالصدق و اياكم والكذب"

"তোমরা অবশ্য অবশ্য সত্য কথা বলবে এবং খবরদার! খবরদার! মিথ্যা আচরণ করবে না, মিথ্যা কথা বলবেনা।"

৬. "لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهد له"

"যে ব্যক্তি আমানত খেয়ানতকারী হবে,তার ইমান নেই এবং ওয়াদা .অঙ্গীকার,মুখের যবান ঠিক নেই তার ধর্ম নেই"

৭. "اطيبوا الكلام" "তোমরা মিষ্টভাষী হও,কর্কশভাষী হয়ো না।"

---

৩৫৯. আল-কুরআন, ০৫;৫৪

৩৬০. আল-কুরআন, ০২;১৫২

৩৬১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল: প্রাগুক্ত, *খ.১, হাদিস নং-১*

Dhaka University Institutional Repository

৮. "ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب "

"আগুন যেমন লাকড়ীকে জ্বালিয়ে দেয় তেমনি হিংসা নেক আমল গুলোকে জ্বালিয়ে ফেলে"[৩৬২]

৯. "من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه " "ইসলামে একজন মানুষের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ ছেড়ে দেয়া।"

১০. "لا يدخل الجنة قتات "

"চোগলখোর,পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"[৩৬৩]

১১."আমার আসমান অথবা আমার জমিন আমায় ধারণ করতে পারে না, কিন্তু সে সব বান্দার দিলে হয় আমার স্থান, যারা মোমিন।"

১২."আমি ছিলাম গোপন সম্পদ এবং আমার ভেতরে জাগল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা, তাই আমি গড়ে তুললাম এ সৃষ্টি, যাতে তারা আমায় জানতে পারে।"

১৩."যে ব্যক্তি নিজেকে জেনেছে সে তার খোদাকেও জেনেছে।"

১৪."যে ব্যক্তির মধ্যে কোনো প্রেম নেই সে বিশ্বাসী নয়।"

এই সমস্ত আয়াত ও হাদিসসমূহ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করে যে, বিশ্বজাহান ঐশী শক্তির মূর্ত প্রকাশ, সৃষ্টি আল্লাহর শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। আল্লাহ মানুষের ধমনিতে বিরাজিত। মানুষ আল্লাহর হাতের ক্রীড়নকমাত্র।আর এটাই হচ্ছে তাসাউফ বা সূফীবাদ।

অনুচ্ছেদ-৫

তাসাউফ শাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান

তাসাউফের ময়দানে ইমাম গাজালি অনেক বড় অবদান রেখে গেছেন। বর্তমান সময়েও যার প্রভাব যথারীতি অক্ষুন্ন রয়েছে। তিনি তাসাউফের ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতি নিরূপণের অনেকগুলো রূপরেখা এবং মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছেন। এই বিষয়টি পরবর্তী সংস্কারমূলক কাজে তাকে সহযোগিতা করেছে। সংস্কারের দুর্গম পথকে কণ্টকমুক্ত করেছে। তাসাউফের সংস্কারে ইমাম গাজালির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. শরয়ি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা:

ইমাম গাজালি আখিরাতের পথের পথিকের জন্য শরিয়তের জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তখনকার সময়ে অধিকাংশ সুফি জ্ঞানার্জনকে তাসাউফের প্রতিবন্ধক মনে করত। তিনি তাঁর লিখিত ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থের ৪০ অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়টি শুরু করেছেন কিতাবুল ইলম বা জ্ঞানের অধ্যায় দিয়ে। মিনহাজুল আবিদিন গ্রন্থে উল্লেখ করেন, একজন ইবাদতগুজার বান্দাকে সর্বপ্রথম যে বাধাটি অতিক্রম করতে হয়, তা হলো ইলম। অগণিত স্থানে তিনি লিখেছেন, ইলম এবং আমল ব্যতীত সৌভাগ্য লাভের আশা করা যায় না।

আইয়ুহাল ওয়ালাদ গ্রন্থে তিনি লেখেন, আমলহীন ইলম উন্মত্ততাসদৃশ। আর ইলমহীন আমল শূন্যতাসদৃশ। ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকদের জন্য রচিত অমূল্য সম্পদ। উক্ত গ্রন্থে তিনি ইলম অর্জন ছাড়া রিয়াজত-মুজাহাদার তীব্র নিন্দা করেছেন। গাজালির মতে, একজন আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি সুফির দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় অধিক সূক্ষ্মদর্শী এবং সঠিকতর। এ জন্য তিনি বলেন, ইলমের আলো যখন প্রজ্বলিত হয়, চতুর্দিক আলো-ঝলমল হয়ে ওঠে। দূরীভূত হয় আঁধারের কালিমা, ঘুঁচে যায় দ্বিধাদ্বন্দ্বের সব রূপ।[৩৬৪]

---

৩৬২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী: *সুনানে আবু দাউদ* (বৈরুত: দারুল ফিকরম তা.বি. স.বি. হাদিস নং- ৪৯০৩, দুর্বল হাদিস)

৩৬৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল: প্রাগুক্ত, *খ.২, হাদিস নং-৬০৫৬ (সাহিহ হাদিস)*

৩৬৪. আল-গাজালি: *বাইনামাদিহিহি ওয়ানাকিদিহি*, তা.বি.পৃ.১২১-১২২

Dhaka University Institutional Repository

২. বাতিনি ব্যাখ্যাসমূহ প্রত্যাখ্যানঃ

ইমাম গাজালি শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো দলিল বা প্রয়োজন ব্যতীত শব্দ থেকে বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে, উপকারহীন গোপন অর্থ উদ্ভাবন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন, বাতিনি ফিরকার লোকেরা কুরআন মাজিদের ভিন্ন অর্থ বের করে। এটি হারাম এবং এর ক্ষতি অনেক বেশি। কেননা, শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো দলিল ও প্রয়োজন ছাড়াই যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ বাদ দেওয়া হবে, তখন শব্দের ওপর কোনো আস্থা থাকবে না। ফলে আল্লাহ ও রাসুলের কালামের উপকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, সকলের বাতিন (অভ্যন্তরীণ অর্থ বের করার বোধ) এক রকম হয় না। তাতে পরস্পর বিরোধিতার আশঙ্কা থাকে। এ ফিরকার লোকেরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের যে বাতিনি অর্থ করে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক : আল্লাহ তাআলা বলেন,

"اذهب إلى فرعون انه طغى"

অর্থাৎ :"ফিরআউনের কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"[৩৬৫] । তারা এখানে ফিরআউনের অর্থ করে কলব দিয়ে। আবার-

وأن ألق عصاك

অর্থাৎ "আর তুমি তোমার লাঠি ফেলে দাও।"[৩৬৬] এই আয়াতে তারা লাঠির অর্থ করেছে আল্লাহ ব্যতীত যেসব বস্তুর ওপর ভরসা করা হয় সেগুলো দ্বারা। অর্থাৎ, সেগুলো নিক্ষেপ করা উচিত। হাদিসে আছে,

"تسحرو ا فان في السحوربركة"

অর্থাৎ "তোমরা সাহরি (ভোর-রাতের খাবার) খাও। কেননা, সাহরিতে বরকত রয়েছে।"[৩৬৭] তারা এ হাদিসের অর্থ করে, "তোমরা সাহরির সময় ইসতিগফার করো।" এ ধরনের অবাঞ্ছিত ব্যাখ্যা দ্বারা তারা গোটা শরিয়তকে ধ্বংস করেছে।[৩৬৮]

৩. তাসাউফকে একটি প্র্যাক্টিক্যাল চারিত্রিক সংশোধনের শাস্ত্রে রূপদান :

ইমাম গাজালি তাসাউফশাস্ত্রকে বল্গাহীনতা, শিথিলতা, ভয়াবহতা এবং বিপদসংকুলতা থেকে মুক্ত করেছেন। কেবল ঝোক এবং শখের বশে তাসাউফে দীক্ষিত হওয়ার ধারণা পালটে দিয়েছেন। তাসাউফকে অন্তরের ব্যাধি নিরাময় করে চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের একটি উপযুক্ত শাস্ত্রে রূপদান করেছেন। কোনো উৎসাহী পাঠক তাঁর রচিত ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন তিনি এই গ্রন্থের শেষার্ধকে দুটি অংশে ভাগ করেছেন। এক অংশে ধ্বংসকারী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্য অংশে মুক্তিদানকারী বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি অংশে আবার ১০টি করে দফা উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি দফা মানবপ্রকৃতির আচার-আচরণ সম্পর্কিত। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন, ধ্বংসকারী বিষয়াদির অংশে সেসব বিষয় চিহ্নিত করব, যেগুলো থেকে অন্তর পরিশুদ্ধ রাখার ব্যাপারে কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। আর মুক্তিদানকারী বিষয়াদির অংশে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সত্যবাদী বান্দাদের সেসব উন্নত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলোর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর

৩৬৫. আল-কুরআন, ৭৯;১৭
৩৬৬. আল-কুরআন, ২৮;৩১
৩৬৭. আহমাদ ইবনে সুয়াইব: *সুনানুন নাসায়ি*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ-১৯৯১ খ্রি., হাদিস নং-২১৪৪
৩৬৮. ইমাম গাজালি: প্রাগুক্ত, খ.১,পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। আত্মগত মনোভাব ও ভাবাবেগের প্রভাবে সুফিরা অন্তরের আমলসমূহের সংজ্ঞায় অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ইমাম গাজালি জ্ঞানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের এ দুর্বলতা শনাক্ত করেছেন। তাঁর ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন বা অন্যান্য গ্রন্থ কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে দেখবে, তিনি তাসাউফপন্থিদের বল্গাহীনতাকে লাগাম পরানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। শরিয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে তাদের সমর্থন দিয়েছেন। তাদের লাগামহীন কথা ও কাজ শরিয়তের লাগাম টেনে রুখে দিয়েছেন। তাদের অবোধ্য কার্যক্রম বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন। এসবের গ্রহণযোগ্য অর্থ দিয়েছেন এবং এতে তিনি সুদূরপ্রসারী সফলতা লাভ করেছেন।[৩৬৯]

৪. জুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতার সংজ্ঞা সংশোধনঃ

জুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের একটি উৎকৃষ্ট মাকাম। এর মাধ্যমে দুনিয়া থেকে সমূলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এই স্তরে পৌঁছতে সুফিরা অনেক চেষ্টা-মুজাহাদা করে থাকে। একে তারা তাদের তরিকার প্রথম সিঁড়ি মনে করে। তবে কোনো কোনো ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হওয়ার ক্ষেত্রে সীমাহীন অতিরঞ্জন করে ফেলে। ইমাম গাজালির ভাষায়, বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান দুনিয়াবিমুখতার ব্যাপারে তাদের মনে নানাবিধ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের পথভ্রষ্ট করে দেয়। দুনিয়াবিমুখতা বা সংসার অনাসক্তির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কিছু নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন। তাদের ভুলভ্রান্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার সঠিক পদ্ধতি বাতলে দিয়ে বলেছেন, তাদের মধ্যে একটি দল মুক্তি পাবে। এই দলটিতে তারাই রয়েছে, যারা রাসুল এ ও তার সাহাবিগণের তরিকা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, যাদের বিশ্বাস হলো দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় নয়; বরং দুনিয়া থেকে প্রয়োজনীয় পাথেয় গ্রহণ করা উচিত এবং খাহেশের মূলোৎপাটন ততটুকুই দরকার, যতটুকুর ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ রয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য তারা অনুধাবন করে এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সদা আকুল থাকে। ফলে ইবাদতের জন্য শক্তি-সঞ্চয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। চোরের উপদ্রব, ঠান্ডা ও তাপ থেকে রক্ষার্থে পরিমিত বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। একান্ত প্রয়োজনীয় দৈহিক চাহিদা পূরণ করে পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। সারা জীবন আল্লাহর জিকির-ফিকিরে লীন হয়ে। যায়। তাকওয়া ও খোদাভীতির সীমায় থেকে খাহেশাত পূরণ করে। চিরমুক্তিপ্রাপ্ত দল সাহাবিগণের জামাআতকে সর্বদা অনুসরণ করে চলে, যারা ছিলেন মধ্যপন্থি এবং শুভ্র-সরল পথের অধিকারী-পার্থিব স্বার্থে দুনিয়াদারি করতেন না; বরং দীনি স্বার্থে দুনিয়া কামাই করতেন। সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াবিমুখ ও সংসারবিরাগী হয়ে থাকতেন না। বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি না করে যাবতীয় কাজে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। বস্তুত এটাই ইনসাফপূর্ণ পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয় বিষয়।[৩৭০]

সারকথা, নিঃসন্দেহে তাসাওউফের ময়দানে ইমাম গাজালির অবদান চিরস্মরণীয় এবং অনস্বীকার্য। তিনি তাসাউফকে জুনায়েদ বাগদাদির তরিকা অনুসারে সুন্নি মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। এ যাত্রায় তিনি অনেকাংশে সফলতাও লাভ করেন। তার আগে ও পরের তাসাউফের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা ব্যতীত তাসাউফশাস্ত্রে তার অবদান মূল্যায়ন করা অসম্ভব।[৩৭১]

---

৩৬৯. আল-গাজালি: প্রাগুক্ত, তা.বি.পৃ.১২৩-১২৪

৩৭০. ইমাম গাজালি: প্রাগুক্ত, খ. ৩ ,পৃ.২৩০।

৩৭১. ইমাম গাজালি: প্রাগুক্ত, পৃ-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

গাজালির আগের ও পরের তাসাউফের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অতি সহজে তাসাউফশাস্ত্রে তাঁর অবদান আঁচ করতেন পারবেন। ইসলামি জীবন ও কৃষ্টি-কালচারের অন্যতম শাখা তাসাউফ। এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তাসাউফশাস্ত্রে ইমাম গাজালির অবদান বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।[৩৭২] তাসাউফের অধ্যায় যতই নাজুক ও সংবেদনশীল হোক না কেন, ইমাম গাজালিকে এর ইমাম হিসেবে মানতেই হবে। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো আলিম ভুলের ঊর্ধ্বে নন, সুতরাং তিনিও ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।[৩৭৩] নিম্নে তাঁর অবদানের আরও কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

সূফীবাদঃ

আল-গাজালি দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ আলোচনার মাধ্যমে সত্য লাভ সম্ভব নয়। তিনি সূফীবাদের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি আল-হারিছ, আল-মুহাসিবি, আল-শিবলি, আবু ইয়াজিদ আল-বিস্তামির এবং জুনাইদ বোগদাদির লেখার অংশ বিশেষ- এসব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি বলেন, "আমি স্পষ্টত দেখেছি সূফীদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট বিদ্যমান তা কোনো গ্রন্থ পাঠে শিক্ষা করা যেতে পারে না; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তন্ময় এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই তা লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং আল-গাজালি আধ্যাত্মিক অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন এবং তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ, ইহইয়া উল-উলুম আদ্দীন রচিত হয়। তাঁর সাধনার ফলেই সূফীবাদ ইসলামে তার যথোপযুক্ত স্থান লাভ করে। আল-গাজালির মতে, ওহি বা প্রত্যাদেশ জ্ঞানের উৎস। এই প্রত্যাদেশ মুখ্য ও গৌণ উভয় প্রকার হতে পারে। ওহি বা মুখ প্রত্যাদেশ নবীদের নিকট প্রকাশিত হয় এবং ইলহাম' বা গৌণ প্রত্যাদেশ পবিত্র আত্মা সাধক বা সূফী দরবেশরা পেয়ে থাকেন এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে খোদার জ্ঞান লাভ করে থাকেন। সূফী জাগতিক আড়ম্বর ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বর্জন করে খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আল-গাজালির মতে, হাল বা তন্ময়তা এক ধরনের প্রত্যাদেশ বিশেষ। আম্বিয়া ও আওলিয়ারা সাধনার মাধ্যমে এমন স্তরে উপনীত হন, যখন নিজ নিজ আত্মার মধ্যে খোদার দর্শন লাভ করেন, তাঁকে উপলব্ধি করেন। আল-গাজালির এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন,"তিনি জ্ঞাত হলেন যে, সূফীরাই সত্য এবং একমাত্র ঐশী জ্ঞানের পথ বিচরণশীল বুদ্ধি বা জ্ঞান বা বিজ্ঞান তাদের মতবাদ বা নীতির কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করতে পারে না; তারা যে আলোকে বিচরণ করেন তা প্রত্যাদেশের আলোকের সঙ্গে অভিন্ন। প্রেরিত পুরুষ হওয়ার আগে মুহাম্মদ একজন সূফী ছিলেন, এই জগতে মানুষকে আলোকের পথে পরিচালিত করার অন্য কোনো আলোক নেই। খোদা ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে হৃদয়কে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই তাদের (সূফী) পথ, সম্পূর্ণভাবে খোদার চিন্তায় হৃদয়-মন নিবেদন করাই এই পথের প্রারম্ভ এবং তার মধ্যে পরিপূর্ণ সমাহিত চিত্ত হওয়াই এই পথের শেষ।[৩৭৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আল-গাজালি পরম সত্তার নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, সে যুগের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর সেই গভীর অধ্যয়ন ও অক্লান্ত, অশ্রান্ত চিন্তার মাধ্যমে জন্মলাভ করল এক সমন্বয়ধর্মী জীবনদর্শন, যে দর্শন ইহজীবন ও পরজীবনের মিতালী স্থাপন করে ইসলামের পরিপূর্ণ ব্যপ্তি সুস্পষ্ট করে তুলল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে সূফী দর্শন সর্বসাধারণের মধ্যে ন্যায্য স্থান লাভ

৩৭২. ইমাম গাজালি: প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩৭৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা: প্রাগুক্ত, খ.১৯, পৃ.৩৩৯।

৩৭৪. Macdonald, *Muslim Theology* p.227

Dhaka University Institutional Repository

করল। তার লেখনীর মুখে ইসলামের বস্তুধর্মিতা ও আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাহাত্মে বিকশিত হয়ে ওঠে। ইসলামের জাহেরি ও বাতেনি দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইসলামের পূর্ণ জীবন দর্শন মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা ও প্রকৃত পথনির্দেশ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আল-গাজালির বিরাট অবদান।[৩৭৫]

আল্লাহ:

দার্শনিকরা বিশেষভাবে আল্লাহর পরম ঐক্যের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনো সদর্থক গুণ আল্লাহর প্রতি আরোপিত হতে পারে না। ফলে উদ্দেশ্য বিধেয় দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়। শুধু অস্তিত্ব তার প্রতি আরোপিত হতে পারে। তিনি সব পার্থক্য এবং চিন্তার যাবতীয় প্রকারের ঊর্ধ্বে। সমুদয় গুণবর্জিত ঐক্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ আল্লাহকে আধেয়বিহীন শূন্যতায় পরিণত করে। তিনি বর্ণনাতীত বিষয়ে পরিণত হন। এটা দার্শনিকদের অদ্বৈতবাদী রূপান্তরের যৌক্তিক ফলশ্রুতি। অ্যারিস্টটলের মতে, আল্লাহ চিরন্তন-তিনি যা জানেন তা তার সত্তা থেকে আসে-তা তার পরিপূর্ণতা থেকে নির্গত হয়। তিনি কিছুই ইচ্ছা করেন না, কেননা ইচ্ছা করা অভাবসূচক। তিনি শুধু আল্লাহকে বা তার প্রথম নির্গমন প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করেন। সুতরাং তিনি নিছক অতীন্দ্রিয় সত্তা তিনি জাগতিক পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে। দার্শনিকদের মতো আল-গাযালিও আল্লাহর ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ একমাত্র অস্তিত্বশীল। তিনি সমুদয় সত্তার পরম কারণ ও ভিত্তি একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর সত্তা। তিনি সত্তার পরিপূর্ণতার অধিকারী, কোরআনের বর্ণিত সমুদয় গুণের অধিকারী তিনি। বৌদ্ধিকভাবে এটা জানা সম্ভব নয়। তাঁর সমুদয় গুণ আধ্যাত্মিক। তিনি পরম কল্যাণ ও পরম সুন্দর তিনি পরম প্রেমাস্পদ। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি পরম জ্ঞানী। তিনি সৃষ্টিশীল সত্য, কিন্তু সর্বোপরি তিনি চিরন্তন ইচ্ছা। দেখা যাচ্ছে যে, দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ মুখ্যত চিন্তন, কিন্তু আল-গাযালির মতে, তিনি মুখ্যত পরম ইচ্ছা আর এই ইচ্ছাই সৃষ্টির কারণ, তিনি বলেন, "আদিনীতি সর্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় কর্তা। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যাবতীয় সদৃশ ও বিসদৃশ জিনিস তৈরি করেছেন, যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেছেন।"[৩৭৬] কাজেই পরম সত্তা মূলত ইচ্ছাশক্তি। সমগ্র স্বর্গ-মর্তে যা কিছু বিদ্যমান তা আল্লাহর হও অনুজ্ঞার প্রকাশ। তিনি ইচ্ছার বলেই সৃষ্টি করেছেন ইচ্ছার বলেই সৃষ্টি ধারণ করে আছেন এবং তার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ চিন্তা করেন বলেই জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। আর আল-গাজালির মতে, আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং এই ইচ্ছা করার জন্য তিনি জগৎ সম্পর্কে অবহিত হন। এটা ছাড়াও দার্শনিকদের মত আল-গাজালি আল্লাহর অতিবর্তী অতীন্দ্রিয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেশ-কালের সীমাবদ্ধতার বহু ঊর্ধ্বে, কেননা তিনি দেশ-কাল সৃষ্টি করেছেন। দেশ ও কাল সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন। কিন্তু এ দৈশিক কালিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুসৃত হয়ে আছেন। তাঁর চিরন্তন জ্ঞান ও সৌন্দর্য তার সৃষ্টির বিস্ময় ও মহিমার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে চলেছে। সমগ্র বিশ্বজগতের মধ্যে তার চিরন্তন ইচ্ছা কাজ করে চলছে। সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে তাঁরই ইচ্ছা সক্রিয়। সর্বত্র তাঁর শক্তির প্রকাশ। আল-গালির আল্লাহ নিষ্ক্রিয়, ও নিরাসক্ত নন, তিনি ব্যক্তিক প্রাণবন্ত। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে মিলনে আগ্রহী, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মিলনেচ্ছাকে তিনি সম্ভবপর করে তোলেন, এই মিলন সাধিত হয়। প্রার্থনা, ধ্যান ও মরমী তন্ময়তার মধ্য দিয়ে।[৩৭৭]

---

৩৭৫. রশীদুল আলম: প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬।
৩৭৬. *Tahfatul Falasifa,p.*88
৩৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা:

আল-গাজালির মতে, মানবাত্মা পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট জীবন বা বস্তু থেকে স্বতন্ত্র । দৈহিক গুণাবলির মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আত্মা আধ্যাত্মিক । (জাওহার রুহানী) দেশ-কালের ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। আত্মার অবস্থান দেহের মধ্যেও না আবার দেহের বাইরে নয় অর্থাৎ আত্মা দেহধারী মানুষের দেহস্থিত হয়েও দেহাতীত আত্মা বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই বস্তুর সংজ্ঞা ও স্বরূপের মাধ্যমে আত্মার জ্ঞাত হওয়া যায় না। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আত্মাও খোদার সৃষ্টি। তবে স্বরূপের দিক দিয়ে আত্মার সাদৃশ্য রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে নয়। কোরআনে বলা হয়েছে যে, "খোদ মানুষের মধ্যে তার শক্তি প্রবিষ্ট করিয়েছেন। (সূ. ১৫, আ., ২১২), এতে অন্তত এটা বুঝা যায় যে, মানুষের আত্মা ঐশীশক্তির অধিকারী; মানুষের মধ্যে এমন শক্তি দেয়া হয়েছে যার বলে সে খোদার খেলাফত কায়েম করতে সমর্থ । হাদিসেও বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার নিজের সরাতে (রূপে) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৩৭৮]

আল গাজালি এই হাদিসের তাৎপর্য এভাবে নির্দেশ করেছেন, "মানবাত্মা ও খোদার সত্তা অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্যের বলেই মানুষ খোদার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য ইচ্ছাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তিই দৈহিক ক্রিয়াবলির নিয়ামক। আল-গালির মতে, এই ইচ্ছাশক্তিই মানুষের সব জ্ঞান, সব কর্ম, সব অনুভূতির মূল। আধুনিক দর্শনের জনক ডেকার্তে যেখানে চিন্তার মধ্যে মানবজ্ঞানের নিশ্চিয়তা খুঁজে পেয়েছিলেন, মধ্যযুগের চিন্তানায়ক আল-গাজালি সেখানে ইচ্ছার মধ্যেই মানবজ্ঞানের নিশ্চিত অবলম্বন আবিষ্কার করেছিলেন। আমি আছি, কারণ আমি চিন্তা করি, (Cogito ergo sum) ডেকার্তের এই নীতির পরিবর্তে আল-গাজালি ঘোষণা করেছেন আমি আছি কারণ আমি ইচ্ছা করি (Volo ergo sum)। জগতের উদ্ভব বা বিকাশের ব্যাখ্যায় ডেকার্তের চেষ্টা আল-গাজালির মতোই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে চিন্তাশক্তি থাকলেও ইচ্ছাই যে এই বিশ্বজনীন প্রক্রিয়াকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পার করে দিচ্ছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্ব চরাচরের মধ্যে যে প্রকাশের ব্যাকুলতা পরিদৃশ্যমান তা চিন্তা নয় ইচ্ছা। কাজেই আল-গাজালি বলতে চান যে, সৃষ্টির স্বরূপ ব্যাখ্যায় চিন্তা অপেক্ষা ইচ্ছাই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানানসই। খোদার উপলব্ধি মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে মানুষের জানা চাই নিজের আত্মাকে। যে নিজের আত্মাকে চিনেছে সে তার খোদাকে জেনেছে (মান আরাফা নাফছাহু ফাক্কাদ আরাফা রাবাহু)। মানুষ তার আত্মার শক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির রহস্যকে জানতে পারে, চিন্তার অতীত বিষয়সমূহের রহস্য ভেদ করতে পারে। যদিও আত্মা স্বরূপত আধ্যাত্মিক শক্তি এবং খোদার সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি মানবাত্মা প্রবৃত্তির হাজার আকৃতির অধীন। আত্মাকে প্রবৃত্তির মোহপাশ থেকে র্নিমূল করে তাকে স্বাভাবিক রাখতে পারলে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারলে মানুষ খোদার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। নৈতিক বাধ্যতাবোধ প্রভৃতি মানুষের নৈতিক জীবনের ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ধারণের ব্যাপারেও নিছক চিন্তা-শক্তি যথেষ্ট নয়। মানুষ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিশেষ হাল বা তন্ময়তা অবস্থায়ই ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রভেদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। মানুষের চিন্তাশক্তি রহস্যের জাল ছিন্ন করতে পারে না, রহস্যের স্পর্শ লাভ করে মাত্র।

---

৩৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

আল-গাজালির মতে, সব মানুষের বিকাশ একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষকে আবার আত্মিক বিকাশের বিভিন্ন ধাপে অবস্থান করতে দেখি। প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করতে পারে না। তাদের আত্মিক বিকাশ অতি সামান্যই ঘটেছে বলতে হবে। এই সমস্ত লোক কোরআন ও হাদিসের বাহ্য অর্থেই পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত মানুষ শক্তির বিকাশে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে। তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে আদর্শের কল্পলোকে বিচরণ করে। শেষ স্তরে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ও কল্পনাসঞ্জাত চিন্তালোকে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। এই স্তরে মানবাত্মার সব বন্ধন মুক্ত হয় এবং ঐশী আলোকে তার সমস্ত রহস্যের আধার যবনিকা সরিয়ে দেয়। প্রেরিত পুরুষ ও সূফীরাই এই স্তরের অধিবাসী, অবশ্য হে পুরুষরা ইলহাম ছাড়া ওহি (প্রত্যাদেশ) লাভ করে থাকেন। কিন্তু সূফীরা শুধু ই (প্রেরণা) লাভ করে থাকেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মিক বিকাশের যে ব্যক্তি এই ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সমর্থ হয়, সে সৃষ্টির সর্বত্র খোদার মজা অভিব্যক্তি দর্শনে এবং খোদার চিন্তায় মশগুল হয়ে কাল যাপন করে। আধ্যাত্মিক ও আম বিধানে প্রতিশ্রুত মানুষ পরম স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে থাকে। একমাত্র খোদার মহব্বতই তার সমগ্র সত্তা অধিকার করে থাকে, পুরস্কার ও শাস্তির চিন্তা তার মনে মোটেই ছায়াপাত করতে পারে না। আল-গাজালি সর্বখোদাবাদ (Pentheism)[৩৭৯] অথার্ৎ এই সবই খোদা এবং খোদাই সব এই মতবাদ বর্জন করেছিলেন। এই মতবাদ ধর্ম ও নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে। আত্মার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে আল-গাজালি সমগ্র অস্তিত্বকে (Existence)তিনভাগে বিভক্ত করেন; এই তিনটি ভাগকে তিনটি লোক বা সৃষ্টি স্তর বলা যায়। যেমন-

(১) আলামুল মুলক (পার্থিব জগৎ বা স্তর),

(২) আলামুল মালাকুত (ঐশী জগৎ বা স্তর) এবং

(৩) আলামুল জাবারুত (মধ্যবর্তী জগৎ বা স্তর)।

১. আলামুল মুলক :

এই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ রূপ-রস-শব্দ-গন্ধস্পর্শময় জগৎ। এই জগৎ চিরন্তন পরিবর্তনের অধীন, তথা পরিদৃশ্যমান জগৎ খোদার শক্তিতে সক্রিয় চলমান। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আল-গাজালি ও দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য খুব এক সুস্পষ্ট নয়। তিনি যে বিষয়ের ওপর জোর দেন তা হলো দার্শনিকরা তাদের বৌধিক যুক্তির সাহায্যে মানব আত্মার আধ্যাত্মিকতা, দ্রব্যত্ব, ঐক্য, অমরতা ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপন করতে পারেননি। এ বিষয়ে দার্শনিকদের ওপর আল গাজালির আক্রমণ কান্টের তীক্ষ্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পর্যায়ভুক্ত। বরং কান্টের চেয়েও প্রচণ্ডতর।[৩৮০] আল-গাজালি দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের অনুকূলে যে দশটি যুক্তি খাড়া করেছিলেন তা একে একে নির্মুল করে ফেলেন। কান্টের মতো তিনি এ বিষয়ে দার্শনিক মৌলিক অবস্থান সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেননি। ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে।[৩৮১] আল-গাজালির মানবাত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ কোরআন ও হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার আল্লাহ সম্পর্কীয় মতবাদ এবং মানবাত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। আল্লাহ যেমনি অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী, মানুষের আত্মা ও তেমনি অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী। আল্লাহর ন্যায় মানবাত্মাও একটি ঐক্য, মুখ্যত ও স্বভাবত ঐচ্ছিক শক্তি বা ইচ্ছা।

৩৭৯. মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ এর প্রবক্তা

৩৮০. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

৩৮১. প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষ আল্লাহর সুরতে সৃষ্ট (হাদিস) এবং কোরআনে একাধিক বার উচ্চারিত হয়েছে, "আত্মা মানুষের মধ্যে আমার রুহ (শক্তি) ফুৎকার করে দিয়েছি"। আত্মা একটি আয়না যা ঐশী স্ফুলিঙ্গ দ্বারা আলোকিত এবং যাতে আল্লাহর গুণাবলি, এমনকি তার সারসত্তা প্রতিফলিত। এ সম্পর্কে আল-গাজালির উক্তি, "মানুষের গুণাবলি শুধু আল্লাহর গুণাবলিরই প্রতিফলন নয়, বরং মানুষের আত্মার অস্তিত্বের প্রক্রিয়া আল্লাহর অস্তিত্বেও প্রক্রিয়া(mode) সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।[৩৮২] এই দুইয়ের সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে আল- গাযালি আরও বলেন যে,আল্লাহ ওআত্মা অদৃশ্য,অবিভাজ্য, দেশ ও কালের প্রভাবমুক্ত,পরিমান গুণের প্রকার-বহির্ভূতঃআকৃতি বর্ণ বা আকারের ধারণা এদও সঙ্গে যুক্ত নয়।[৩৮৩]

আত্মা আল্লাহর অনুজ্ঞা- তার আদেশ হতে আগত। এই অনুজ্ঞা বা আদেশের জগৎ সৃষ্ট জগৎকে পরিচালিত করে। আত্মা আধ্যাত্মিক নীতি এবং তা দেহকে প্রাণবন্ত করে, নিয়ন্ত্রিত করে। দেহ আত্মার হাতিয়ার ও বাহক। আল্লাহ মুখ্যত ইচ্ছা এবং ইচ্ছার দিক দিয়ে মানুষ আল্লাহর অত্যন্ত নিকটবর্তী। "আমি ইচ্ছা করি কাজেই আমি আছি" (Volo ergo sum)- এই নীতির ওপরই আল-গাজালি তার মরমীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আত্মার আবশ্যকীয় উপাদান চিন্তন নয় যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দৈহিক প্রত্যক্ষণ এবং চিন্তনের প্রকারের ওপর নির্ভরশীল, বরং ইচ্ছা যা প্রত্যক্ষণ ও প্রচারসমূহ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করে। মানুষ এক সীমাহীন আধ্যাত্মিকতার সম্ভাবনা এবং সে তার ইচ্ছার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে ও আল্লাহর ইচ্ছার সন্নিকটবর্তী হয়। এই স্তরে আল্লাহ বলেন, "হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকদের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর" (৮৯ : ২৭, ৩০)। আল্লাহর সঙ্গে মানবাত্মার এই চূড়ান্ত সাক্ষাৎ মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নের এবং দিব্যজ্ঞানী মুর্শিদের নির্দেশানুযায়ী জীবন-যাপনের ওপর নির্ভরশীল। এটাই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারসত্তা ও পরশপাথর।

২. আলামুল মালাকুত :

এটা জ্যোতির্ময় ঐশী জগৎ। এটা চিরন্তন। এই জগৎ চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। এই জগতের কোনো বস্তুই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনো বস্তুর মতো পরিবর্তন বা বিকৃতির অধীন নয়। লওহে মাহফুজ, কলম প্রভৃতি সুরক্ষিত বস্তুসমূহ এই জগতের অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদয় বস্তু ইন্দ্রিগ্রাহ্য কিংবা রূপক নয়।

৩. আলামুল জাবারুত :

উপরিউক্ত দুই জগতের মধ্যবর্তী আলামুল জাবারুত। এটা ঐশী জগতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বাহ্যত মনে হয় এই জগৎ পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আত্মার বাস এই আলামুল জাবারুতে সাধকরা স্বপ্নে এবং তন্ময়তার মধ্যে আত্মার বলে আলামুল মালাকুতে উপনীত হয়ে থাকেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও হাল অবস্থায় খোদার নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করেন। আল-গাযালির এই ত্রিবিধ জগৎ দেশ কিংবা কালের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র নয়, একই সত্তার বিভিন্ন স্তর। কোরআন ও হাদিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকারীদের মতে (সপ্ত বেহেশত ও সপ্ত জগৎ যেন এক তলার ওপর অন্য তলার মতো বিন্যস্ত) আল-গাযালির এই তিনটি আলম বা লোকও অস্তিত্বের তিনটি স্তর মাত্র। আলমের

---

৩৮২. "Not only a man attrivutes a reflection of God's attrivutes but the mode of existence of man"s soul affords an insight into God"s mode of existence….."M.M.Sharif, *A history of Muslim Philosophy,* p.620

৩৮৩. "Both God and soul are invisible, indivisible, unconfined by space and time and outside the categories of quantity and quality and can the ideas of shape, colour or size attach to them."Kimiya-i-Sa'adat(Tr.byClaud Field)the Al-Chemy of Happiness, p.19

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে আমরা। রূপকের সাহায্য ছাড়াই কোরআনের বর্ণিত লওহ কলম' প্রভৃতি বিষয় ব্যাহত হয় পারে। এই সমস্ত বিষয় ঐশী জগতের অন্তর্ভুক্ত, অবভাসিক জগতের কোনো দ্রব্যের সঙ্গে এগুলো কোনো সামঞ্জস্য নেই। এভাবে আল-গাজালি সর্বখোদাবাদের সম্ভাবনাকে চিরতরে ধূলিসাৎ করেন।

সর্বখোদাবাদঃ(Pentheism)

আমরা আল-গাজালির মতবাদের সঙ্গে যতদূর পরিচিত হয়েছি তাতে তাকে কোনোভাবেই খোদাবাদী বা প্যানথিস্ট বলা চলে না। তাঁর মতে, আল্লাহ অতিবর্তী ও অন্তর্বাপী, তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন- তাঁর সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট জীব যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তিনি এক বিশেষ মুহূর্তে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগৎ তার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। আল-গাজালির এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্যানথিজমের কোনো সাদৃশ্য নেই। আল্লাহর সঙ্গে একীভূত হওয়া, তার সঙ্গে একাত্মবোধ এবং তার মধ্যেঅবলুপ্ত হওয়া- এ ধরনের বর্ণনা আল-গাজালি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সূফীরা আল্লাহর নৈকট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এম. সাঈদ শাইখ উল্লেখ করেন যে, আল-গাজালির আত্মার সঙ্গে আল্লাহর জাত ও সিফাত-সত্তাসার ও গুণাবলি উভয় দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য- এত ঘনিষ্ঠ যে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সুকঠিন। এ ধরণের, সিদ্ধান্তের বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে আল-গাযালি সচেতন ছিলেন। তিনি সর্বাধিক জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহর এমন একটি গুণ রয়েছে যা তার সৃষ্টির কোনো কিছুতে নেই। এ গুণটি হলো আল্লাহ স্বয়ংম্ভু, তিনি নিজগুণে অস্তিত্বশীল, আর অন্যসব কিছুই তাঁর বলেই অস্তিত্বশীল। অবশ্য এই মতবাদের কঠোর যৌক্তিক প্রয়োগ আবার বস্তুর অস্তিত্বকে আল্লাহর মধ্যে নিঃশেষ করে দেয় এবং প্যানথিজমে পর্যবসিত হয়। এই বিপদ সম্পর্কে আল-গাজালি সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। কাজেই এ বিষয়ে তার সাবধানী বাণী হলো "তিনি যা আর কেউই তা নয় এবং তার মতও নয়। মনসুর হাল্লাজ ও বায়জিদ বোস্তামির "আমি সত্য" এবং "আমার কী মহিমা"ইত্যাদি উচ্চারণকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর প্রেমে তন্ময় , আশিকদেরকে এই ধরনের বাণী তিনি সবাইকে গোপন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। সূফী সাধকদেরকেও একই উপদেশ দিয়েছেন।[৩৮৪]

নৈতিকতার ধারণঃ

আল-গাজালি মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ। ইসলামের মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে তাঁর চিন্তাসৌধ গড়ে উঠেছে। তিনি যাচাই-বাছাই বিচার-বিশ্লেষণ না করে কোনো বিষয় গ্রহণ করেননি। এতদসত্ত্বেও মার্গারেট স্মিথ, ড. জাকি মুবারক প্রমুখ অভিযোগ করেছেন যে, আল-গাজালি অ্যারিস্টটলীয় ও পুটিনীয় মতবাদসমূহ থেকে তাঁর নৈতিক মতবাদ সংগ্রহ করেছেন। আল-গাজালির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ নিতান্তই অসঙ্গত, উদ্ভট ও অবাস্তব। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আল-গাজালি বিনা বিচারবিশ্লেষণে, খুটিনাটি বিষয় যাচাই না করে কোনো মতবাদ গ্রহণ করেননি। চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়ের গভীরে প্রবেশের প্রাণবন্ত প্রয়াস তাঁর চিন্তার সার্বিক বৈশিষ্ট্য।তিনি মানবমনের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর তার নৈতিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। আল-কোরআনে মানবজীবনের যে সূক্ষ্ম ও বাস্তব বিচার-বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে তাকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর নৈতিক মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। আল-গাযালির মতে, সর্ববিধ মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার উৎপত্তি মনে। মনের স্বরূপ কি? এর উদ্দেশ্য কি? কিসে নিহিত রয়েছে এর সুখাবস্থা বা দুঃখাবস্থা? ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে আল-গাজালি গভীরভাবে

৩৮৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করেছেন। ক্বলবকে তিনি মানুষের সারসত্তা বলে অভিহিত করেছেন। এটা আধ্যাত্মিক সত্তা, মানুষের দেহের মধ্যে অবস্থান করে এবং তার সর্বপ্রকার জৈবিক ও মানসিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে হৃদয় ও অন্তঃকরণ বলা হয়। এটা দৈহিক হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তবে এটা ইন্দ্রিয়াতীত। আল-গাজালির মতে, আমি/অহম আরবি ভাষায় চারটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়; ক্বলব বা অন্তঃকরণ রুহ বা আত্মা ,নফস বা কামনা প্রকৃতি এবং আক্বল বা প্রজ্ঞা এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক সত্তা বুঝায়। তিনি তাঁর সমুদয় রচনায় আমি বা অহম বুঝাতে ক্বলব শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই ক্বলব-এর জ্ঞান পরম সত্তার জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য। । এই আমি বা অহমের মধ্যে একটি আদর্শ অর্জনের জন্য প্রবল ইচ্ছা বিদ্যমান। দেহস্থিত আমির মধ্যে দেহের চাহিদা পূরণের জন্য এবং আদর্শ অর্জনের জন্য গুণাবলি প্রদত্ত হয়েছে। অহম কর্মবাহী ও সংবেদনবাহী শক্তির মাধ্যমে দৈহিক চাহিদা পূরণ করে। কর্মবাহী শক্তি হলো প্রবণতা ও তাড়না। দুই ধরনের বিশেষ প্রবণতা হলো ক্ষুধা ও ক্রোধ। ক্ষুধা দেহের কল্যাণকর বস্তুর জন্য দেহকে প্ররোচিত করে। এই ক্ষুধা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে খাদ্যের জন্য চাহিদা, পিপাসা, যৌন কামনা ইত্যাদি। আর তাড়না দেহের জন্য ক্ষতিকর বস্তুকে এড়িয়ে চলতে বা প্রতিরোধ করতে প্ররোচিত করে। ক্রোধ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন- প্রবল রাগ, ঘৃণামিশ্রিত রাগ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি। তাড়না মাংসপেশি, স্নায়ু ও অন্যান্য বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি যা ক্ষুধা ও ক্রোধের নির্দেশে অঙ্গসমূহকে সঞ্চালিত করে।[৩৮৫]

সংবেদনবাহী শক্তি অনুধাবন করার ক্ষমতা যা প্রত্যক্ষণ করে এবং দেহের পক্ষে কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এই সংবেদনবাহী শক্তি ছাড়া প্রবণতা সঠিকভাবে কাজ করতে পারত না। অনুধাবন করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যেমন- দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণগ্রহণ, স্পর্শ এবং অভ্যন্তরীণ অনুভূতি। যেমন- কাণ্ডজ্ঞান, কল্পনা, চিন্তন, স্মরণক্রিয়া ও স্মৃতি। ইতর প্রাণীর মানুষের মতোে পঞ্চেন্দ্রিয় থাকলেও চিন্তন ক্ষমতার অভাবে এটা জটিল বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না।

আল-গাজালির মতে, অভ্যন্তরীণ অনুভূতির জন্য কোনো বিশেষ অঙ্গ নেই । রয়েছে বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির। অভ্যন্তরীণ অনুভূতিসমূহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে হয়। আধুনিককালের মনোবিজ্ঞানীদের মতো আল-গাজালি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে মানসিক শক্তিসমূহ স্থাপিত বলে বিশ্বাস করেন। এই মতানুসারে প্রত্যেকটি মানসিক শক্তি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত, যেমনড় স্মৃতি মস্তিষ্কের পেছনের অংশে, কল্পনাশক্তি মস্তিষ্কের সম্মুখবর্তী অংশে এবং চিন্তনশক্তি মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী অংশে/ভাঁজে অবস্থিত। বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন দেহকে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করার জন্য তৈরি করে। তেমনি পাঁচটি অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান এবং ভারী পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি লাভে সহায়তা করে। এসব শক্তি দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর ক্বলব এসব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং এদেরকে শাসন করে। এভাবে আল-গাজালি প্রতিপপন্ন করতে চান যে, জড়ের ওপর মনের প্রভুত্ব রয়েছে। তাঁর মতে, মন/অন্তঃকরণ যাবতীয় ক্রিয়ার উৎস। এটা গতিশীল শক্তি যা নিজের প্রয়োজন অনুসারে জড়ের রূপ প্রদান করে। এমনকি দৈহিক অঙ্গসমূহ আত্মার আন্তর প্রবল ইচ্ছা অনুযায়ী বিকাশপ্রাপ্ত হয়।[৩৮৬]

ক্ষুধা, ক্রোধ ও বোধ মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত। মানুষের এগুলোর অতিরিক্ত আরও দুটি গুণ রয়েছে। প্রজ্ঞা (আক্বল) এবং ইচ্ছা (ইরাদা)। প্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষ বস্তুর ধারণা গঠন করে। প্রজ্ঞা জ্ঞানের

৩৮৫. রশীদুল আলম: প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩২।
৩৮৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি। ইহজগতের ও পরজগতের যাবতীয় বিষয়বস্তু জ্ঞানের বৌদ্ধিক নীতিসমূহ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। স্বতঃসন্ধি সত্যও এই জ্ঞানের আওতাভুক্ত। জ্ঞান/ইলম প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত হয়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয়। যখন কোনো ব্যক্তি এই বস্তুর পুরো তাৎপর্য এবং এর অন্বেষণ কাম্যতা অনুধাবন করে তখন তার মধ্যে ঐ বস্তুটি পাওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা জাগরিত হয়। এই ইচ্ছাকে আরবি ভাষায় ইরাদা বলা হয়। মানুষের মধ্যকার ইচ্ছা ইতর প্রাণীর মধ্যকার ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের মধ্যকার ইচ্ছা প্রজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞানের বিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পক্ষান্তরে ইতর প্রাণীর মধ্যকার ইচ্ছা ক্ষুধা ও ক্রোধে গুণান্বিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মনে/অহমের মধ্যে ছয়টি শক্তি বিদ্যমান, যথা-ক্ষুধা, ক্রোধ, তাড়না, অনুধাবন, প্রজ্ঞা এবং ইচ্ছা। তাড়না, অনুধাবন ও ইচ্ছা সংঘটিত হয় না যদি ক্ষুধা, ক্রোধ ও প্রজ্ঞা সক্রিয় না হয়। অর্থাৎ ক্ষুধা, ক্রোধ ও প্রজ্ঞা সহ হলে তাড়না, অনুধাবন ও ইচ্ছা সংঘটিত হয়। ক্ষুধা, ক্রোধ ও প্রজ্ঞা মনের অন্যান্য। শক্তির তুলনায় মৌলিক। এগুলো মনুষ্য প্রকৃতির কতিপয় নীতি থেকে উৎপন্ন হয়। পাশবিকতা, ক্রোধ হিংস্রতা এবং প্রজ্ঞা ঐশীশক্তি থেকে এসেছে। প্রজ্ঞা শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যে সাধু, শূকর, কুকুর ও শয়তান। আক্বল মানুষের মধ্যকার সাধু পুরুষ, "আশকাওয়া" তার মধ্যকার শূকর, গজব তার মধ্যকার কুকুর। যে পশু তার মধ্যকার দুই পশুকে জাগ্রত করে সেই হলো শয়তান। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিমাণে এসব শক্তির অধিকারী হয়। প্রজ্ঞা ও শয়তানি শক্তি মানুষের মধ্যে বিরাজমান থেকে যথাক্রমে গঠন ও ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে অবস্থিত পশুশক্তিসমূহ শয়তানের প্ররোচনায় প্রজ্ঞা বা আকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে পর্যুদস্ত করতে প্রয়াস পায়। আকুল ঐশী ক্ষমতার বলে পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ও তাকে বশীভূত করে স্ব-স্ব কর্মে নিয়োজিত রাখে। ফলে আদর্শ অর্জনের স্বাভাবিক পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকে। তখন আকুলের সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয় না। এক শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মানুষের অহম বা আমিকে পরিতুষ্ট আত্মা/শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা/নফস-ই মোত্বমায়িন্না বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মানুষের মধ্যকার পশুশক্তিসমূহ শয়তানের প্ররোচনায় আকূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে পরাভূত করে, তাহলে অনিষ্টের সার্বভৌমত্বের শিকারে পরিণত হয়ে আল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রবৃত্তিসমূহের অধীন হয়ে পড়ে। তখন নফস-ই আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য আক্বলকে সম্পূর্ণ পরাভূত হতে দেখা যায় না। সে অনিষ্টের ডামাডোলের মধ্যেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করে। সে অনুতপ্ত হয় নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায়। এই অবস্থায় অহমকে বলা হয় নফস-ই-লওয়ামা। আত্মা দেহরাজ্যের রাজা, আকুল তার পরামর্শদাতা বা উজির। প্রবৃত্তিসমূহ তার ভৃত্য। যদি সে সবাইকে যথাযোগ্য কাজে নিয়োজিত রাখতে পারে, তবে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয়। আত্মার শক্তিসমূহের মধ্যে তখনই ভারসাম্য রক্ষিত হয় যখন ক্রোধ তার অধীনে থাকে, প্রজ্ঞা কামনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে । মানুষ ফেরেশতা ও ইতর প্রাণীর মধ্যবর্তী স্থান দখল করেছে। তাঁর বিশেষত্ব হলো জ্ঞান। জ্ঞানের সহায়তায় সে ফেরেশতার স্তরে উন্নীত হতে পারে, আবার ক্রোধ ও লোভ-লালসার অধীনে হয়ে পশুস্তরে অবনমিত হয়।[৩৮৭]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আল-গাজালির মতে, যাবতীয় দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ সৃষ্ট হয়েছে মানুষের নৈতিক আদর্শ অর্জনে সাহায্য করার জন্য। একমাত্র জ্ঞানই মানুষের এই সমুদয় গুণাবলির বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। মানুষের সমুদয় ক্রিয়া বিশেষ লক্ষ্যে নিয়োজিত। সব কালে, সব যুগে দার্শনিক ও

৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মতত্ত্ববিদেরা প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছেন এমন লক্ষ্য বা লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যা মানুষকে সর্বাধিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। এই ঈপ্সিত শান্তি/লক্ষ্যকে অবশ্যই পরম হতে হবে, যার বাইরে আর কিছু কামনার থাকবে না। এটা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির নির্দেশ করবে যার সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে আল-গাজালি এই লক্ষ্যকে সাআদা বা পরমানন্দ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি একে উপায় ও উদ্দেশ্য উভয় রূপেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, যা পরম আদেশ অর্জনে সহায়ক তা উদ্দেশ্যের অংশ। তবে উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি আস্ সা'দ আলউখরাইয়্যা ও সা'আদা আল-হাকিকিয়া' শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩৮৮] পরমকল্যাণ/ পরমানন্দ লাভের উপায়কে তিনি বিভিন্ন স্তর ভাগ করেছেন।

(১) উভয় জগতে হিতকর, যথা- জ্ঞান

(২) এ জগতে দুঃখদায়ক, কিন্তুপরজগতে সুখদায়ক, যথা- প্রবৃত্তি দমন,

(৩) এ জগতে সুখদায়ক, পরজগতে দুঃখদায়ক যথা- অত্যধিক সম্পদ এবং

(৪) উভয় জগতে ক্ষতিকর, যথা- মূর্খতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব।

দার্শনিকরা যাকে পরমকল্যাণ (Summum bonum) বলে অভিহিত করেছেন, আল-গাজালি তাকে বলেছেন, "আস্ সাআদা আল-হাক্কিক্বিয়া। পরকালের আল্লাহর দিদারকে তিনি "আস সা আতা আল-হাক্কিক্বিয়া বলেছেন। এর মধ্যে সাতটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত; মৃত্যুবিহীন জীবন, দুঃখবর্জিত সুখ, দারিদ্র বর্জিত সম্পদ, দোষশূন্য পূর্ণতা, বিপদবিহীন হর্ষ, অসম্মান বর্জিত সম্মান এবং অজ্ঞতাবিহীন জ্ঞান। এই গুণগুলো নিত্য এবং এগুলো কখনও হ্রাস পাবে না। এই চিরস্থায়ী শান্তি এই জগতে ব্যক্তির আচরণের প্রতিফলিত আল্লাহর প্রতি তার প্রেমের মাধ্যমে অর্জিত হবে। কিন্তু ব্যক্তির আল্লাহ প্রেমের তীব্রতা তার আল্লাহবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় যে, এই জগতে জ্ঞান হলো প্রধানতম কল্যাণ এবং এই জ্ঞান যথার্থ প্রেমলাভে সহায়তা করে। জ্ঞান উদ্দেশ্য হিসেবে অথবা উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হিসেবে অনিষ্ট হতে পারে। যখন জ্ঞানের উদ্দেশ্য হিসেবে অনুসন্ধান করা হয় তখন তা সম্পূর্ণ কল্যাণকর, কিন্তু এটা যখন উপায় হিসেবে অন্বেষণ করা হয় তা কল্যাণকরও হতে পারে আবার অকল্যাণকরও হতে পারে। যখন জ্ঞান সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ আনয়ন করে তখন তা কল্যাণকর আবার যখন জ্ঞান সমাজ ও ব্যক্তির অকল্যাণ আনয়ন করে তখন তা অকল্যাণকর। এইভাবে জ্ঞান পরম কল্যাণের পক্ষে অনুকূল হতে হতে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হয়ে যায়। যখন জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর হয় তখন তা বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন করে এবং এই হলো মনুষ্য সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। জ্ঞানকে আবার দুই ভাগে দেশ যেতে পারে; ইলম আল-মুয়ামিলা এবং ইলম আল-মুখাশাফা'। ইলম আল মুয়ামিলা বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলির অর্জন ও অনুশীলন। আমাদের মধ্যে এই জ্ঞানের অনুশীলনের চূড়ান্ত কোনো সীমারেখা নেই। ইলমুল মুখাশাফা (স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান) ইলমুল মুয়ামিলার ফলশ্রুতি। এটাই এ জগতে পরমকল্যাণ যা আল্লাহর প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে এবং পরজগতে খোদার দিদার ঘটায়। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ প্রেম সর্বাপেক্ষা প্রবল সেই ব্যক্তি পরজগতে সর্বাপেক্ষা অধিক সফল। শান্তি বা সুখের তীব্রতা আল্লাহর প্রেমের তীব্রতার ওপর নির্ভরশীল। আর এই ভালোবাসা ঐশী জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। একমাত্র পঙ্কিলতামুক্ত মনেই আল্লাহর জ্ঞান প্রবেশ লাভ করতে পারে। আমালে সালিহ আল্লাহর জ্ঞান লাভের সহায়ক এবং এর অধীন।

---

৩৮৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ প্রেম ইসলামের সারসত্তা। আল-গাজালি একেই এই জগতে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছেন। কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেননা তাদের যুক্তি হলো একই জাতীয় প্রজাতির মধ্যেই প্রেম হতে পারে, যেহেতু আল্লাহ এবং মানুষ একই জাতীয় নয় কাজেই তাদের মধ্যে প্রেম থাকতে পারে না। এখানে ভালোবাসা শুধু আল্লাহর আনুগত্যকে ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না। আল-গাজালি এর জবাবে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার প্রেম ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোরআন ও হাদিসের আলোকে এর প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কোরআনে উক্ত হয়েছে, "মানুষের মধ্যে যারা ইমানদার তারা তো আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে।[৩৮৯] "তোমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তার রাসূলই। আর যারা ঈমান এনেছে, জামাতের সঙ্গে নামাজ কায়েম রাখে, জাকাত আদায় করে ও আল্লাহর সামনে মস্তিষ্ক অবনত করে দেয়। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সঙ্গেও তারাই তো আল্লাহর দল।[৩৯০] আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণই ভালোবাসা এবং ভালোবাসা সুখ দেয়। আবার ঘৃণা বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, যা দুঃখ দেয়। ভালোবাসা ও ঘৃণা উভয়ই বস্তুর জ্ঞান বুঝায়, যা সুখ ও দুঃখ দেয়। যদি বস্তু অপরিচিত হয় তবে তার প্রতি আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণের প্রশ্ন ওঠে না। আল-গাজালির মতে, আল্লাহর জ্ঞান মানুষের পরিপূর্ণতার অন্যতম শর্ত। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহর প্রেম সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহর প্রেম নিছক আল্লাহর জ্ঞান থেকে উচ্চতর আদর্শ।

আল্লাহর জ্ঞান লাভে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর উচ্চতম স্তর আল্লাহপ্রেমের উচ্চতম স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রত্যক্ষণজাত এবং প্রত্যক্ষণাতিরিক্ত (perceptual and Super perceptual) থেকে পারে। প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুর অনুমান। এই প্রত্যক্ষণ নির্ভর বস্তুর জ্ঞান এবং সেই বস্তুর প্রেমের জ্ঞান মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে সাধারণ । আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারা যায় না। আল্লাহর জ্ঞান প্রত্যক্ষণাতিরিক্ত, একমাত্র মানুষ এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। এই জ্ঞান আসে বিশ্বাস, চিন্তন ও স্বজ্ঞা (ইলমুল মুখাশাফা)-এর মাধ্যমে। জ্ঞানান্বেষণকারীর অন্তরে আল্লাহর প্রেম বিরাজমান এবং প্রত্যক্ষণাতিরিক্ত জ্ঞানের পথে তা সঞ্চারিত। উচ্চতম ও পূর্ণাঙ্গ প্রেম সর্বোচ্চ জ্ঞান, স্বজ্ঞার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেন মানুষ আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুখানুভব করে এবং তাঁর প্রতি তার অনুরাগ নিয়োজিত করে এই প্রশ্নের উত্তরে আল-গাজালি বলেন, আল্লাহপ্রেমের পরম বস্তু। কেননা তিনি আমাদের প্রেমের বস্তুসমূহের যাবতীয় কারণসমূহের পরম ও নিরপেক্ষ উৎস। প্রেমের অতি আবেগ তা তাড়নার প্রধান চারটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে :

(১) আত্মপ্রেম,

(২) উপকারীর প্রতি প্রেম,

(৩) সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম এবং

(৪) স্বাধর্মের ভিত্তিতে দুটি আত্মার মধ্যে প্রেম।

প্রথমত: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে। মৃত্যুর ভয়ে কিংবা পরকালে ঐশী শাস্তির ভয়ে সে সংগ্রাম করে না, সে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। সে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই সংগ্রাম করে না, পূর্ণতা লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে। এই জন্য সে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার দেহ, শক্তি, সম্পদ, বংশধর, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, গোত্র, জাতি ইত্যাদিকে ভালোবাসে।

৩৮৯. আল-কুরআন, ০২;১৬৫

৩৯০. আল-কুরআন, ০৫;৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ উপকারীর প্রতি প্রেম ব্যক্তির হিতাকারীদের সংরক্ষণের কামনা। তবে উপকারীর উপকার করা থেকে বিরত থাকলে তার প্রতি প্রেম অন্তর্হিত হতে পারে। এই প্রেম উপকারের সমানুপাত।

তৃতীয়তঃ সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম কোনো শর্তাধীন বিষয় নয়, এটা কোনো লোকসানের সঙ্গে জড়িত নয়। সৌন্দর্য নান্দনিক অনুভূতির জন্ম দেয়, এটা কে উদ্দেশ্যের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় না। এটা নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে বস্তুর সামঞ্জস্য ও পরিপূর্ণতার মধ্যে নিহিত। সুন্দর বস্তু শুধু দৈহিক আকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না, ধারণাগত আকারও অন্তর্ভুক্ত করে। সৌন্দর্য প্রেম মানুষের তিরোধানের ফলে তিরোহিত হয় না।

চতুর্থতঃ দুটি আত্মার মধ্যে গুণগত সাদৃশ্য থাকলে উভয়েরই উভয়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তক আকর্ষণ অনুভব করে।[৩৯১] আল-গাজালি মনে করেন যেসব কারণ মানুষকে প্রেমে অনুপ্রাণিত করে সেগুলো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই তিনিই একমাত্র ভালোবাসার যোগ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাও উত্তম, কেননা এটা মানুষকে আল্লাহর প্রেমে পরিচালিত করে। আল-গাজালি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু মানুষ নিজেকে ভালোবাসে, কাজেই সে তার স্রষ্টাকে ভালোবাসতে বাধ্য। সে তার সংরক্ষণ ও পরিপূর্ণতার জন্য কামনা করে। এটা দেন আল্লাহ। মানুষ তার করুণা ছাড়া এটা অর্জন করতে পারে না, কাজেই মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কাকে ভালোবাসবে? এটা ছাড়া, মানুষ যত দিক থেকে যতটুকু উপকার আহরণ করে তা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ থেকে আসে-প্রাকৃতিক বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি, তন্মধ্যে সামান্য অংশেই আমাদের কিছু তদারকি ভূমিকা রাখে। আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত দান আমরা ভোগ করি, তাঁকে প্রতিদান দেই না, দেয়ার প্রয়োজন হয় না, শুধু এই উপভোগের স্বীকৃতির প্রকাশ করতে হয় এর নাম কৃতজ্ঞতা স্বীকার । কাজেই এই দিক দিয়ে আল্লাহর প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম উৎসারিত হয় নিজেদেরই অজ্ঞাতে। অধিকন্তু আল্লাহ সর্বাধিক শক্তি, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের অধিকারী। মানুষ এসব গুণের কিঞ্চিৎ প্রতিফলন ঘটাতে পারে তার জীবনে এবং তার আল্লাহরই করুণা। আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন, তার জ্ঞান অনন্ত ও তার সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গ। মানুষ ক্ষমতা চায়, জ্ঞান চায়, মানুষ সুন্দর হতে চায়। এসব পেতে হলে এই সবের উৎসস্থলে যেতে হবে। কাজেই একমাত্র আল্লাহ পরিপূর্ণ ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। আরও বলা যায় যে, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে গভীর স্বাধর্ম্য রয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও। অর্থাৎ আল্লাহর বিভিন্ন নামের মাধ্যমে যেসব গুণ ব্যক্ত হয়, সে গুণগুলোর যথাসম্ভব প্রতিফলন আমাদের জীবনে ঘটাতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের বিষয় কোরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে। "মানবাত্মা আল্লাহর অনুজ্ঞা" "মানুষ আল্লাহর খলিফা/প্রতিনিধি" "আমি তার মধ্যে আমার রুহ থেকে ফুকার করে দিয়েছি"।[৩৯২]

আল-গাজালির মতে, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এটা শুধু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিষয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইলমুল মুয়ামিলার সাহায্যে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারলেন ইলমুল মুখাশিফায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তখন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে অবাধ ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে, তখন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার পর্দা/যবনিকার অপমৃত হয়। মানুষের চরিত্রের ক্রমবিকাশ নির্ভর করে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রবণতা, অসচেতন অনুকরণ ও ঐচ্ছিক প্রচেষ্টার ওপর। কোনো কোনো ব্যক্তি এমন মানসিক প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তার প্রবৃত্তিসমূহকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। আবার অনেকের মধ্যে প্রবৃত্তিসমূহ খুবই শক্তিশালী। এ ছাড়া ব্যক্তি যার সঙ্গে মেলামেশা করে তার আচরণ দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত বা

৩৯১. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩২
৩৯২. রশীদুল আলম: প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩২

Dhaka University Institutional Repository

স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে, তাদের পিতা-মাতাই তাদেরকে ইহুদি, খ্রিস্টান তৈরি করে। আবার ইচ্ছাশক্তির যথাযথ অনুশীলনের ফলে মানুষের সচ্চরিত্র গঠিত হয়। ইচ্ছার শক্তিই মানুষের কাজের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে। প্রথম প্রথম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, অস্বস্তি ও বেদনা অনুভূত হয়, পরে কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়। এ অবস্থায় কোনোরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। পরিশেষে ব্যক্তির জীবনে এমন অবস্থা আসে যে, ভালো কাজ করতে পারলে সে আনন্দিত হয় আর তার দ্বারা কোনো মন্দ কাজ সংঘটিত হলে সে দুঃখিত হয়। এটা চরিত্রের পূর্ণতার নির্দেশক।[৩৯৩]

আল-গাজালি চরিত্র গঠনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের মধ্যে যেসব প্রবণতা রয়েছে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই তার চরিত্র। মানুষের মধ্যে যেসব প্রবণতা বিদ্যমান সেগুলোর সুসঙ্গত বিকাশ অপরিহার্য। মানুষের মধ্যে যেসব প্রবৃত্তি বা শক্তি রয়েছে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত বিকাশ সাধিত হয়। চরিত্র ক্রিয়া, বৃত্তি বা জ্ঞান কোনোটারই সঙ্গে সমার্থক নয়, কেননা এদের কোনোটি নিজে থেকে ভালো বা মন্দ নয়। চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে এরা ভালো বা মন্দ বলে বিবেচিত হয়। চরিত্রের কার্যকারিতার জন্য ক্রিয়া, বৃত্তি ও জ্ঞান অপরিহার্য। চরিত্র সর্বদা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায় না, কেননা বহু মানুষ দানশীল চরিত্রের হলেও দারিদ্র্যের জন্য এই গুণটির বাস্তবায়নে পরান্মুখ হয়। আবার লোভী লোকেরা প্রতারণামূলক অর্থ খরচ করতে পারে। আবার বৃত্তিও চরিত্র নয়, কেননা এটা অনৈতিক, এটা দানশীলতা ও লোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; এই দুটির মধ্যে কোনো একটিকে নির্বাচিত করার শক্তি মানুষের রয়েছে। জ্ঞানও চরিত্র নয়, কেননা এটা ভালো ও মন্দ উভয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কাজেই চরিত্র ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্থায়ী অবস্থা, যা সব সময়েই সক্রিয়। দেহ যেমন ব্যক্তির দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সুসঙ্গত ও আনুপাতিক বিকাশ, চরিত্র তেমনি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রবণতা ও শক্তিসমূহের সুসঙ্গত ও আনুপাতিক বিকাশ। আল-গাজালির নৈতিক দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত স্বরূপ অবহিত হওয়া এবং পাপ পরিহার করার ও পুণ্য অর্জন করার উপায় অবগত হওয়া। তিনি নানাভাবে পাপ-পুণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণিবিন্যাস-সমূহের প্রধান ভিত্তি দুটি বলে মনে হয়;

এক, কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পাপপুণ্য।

দুই. হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আল্লাহর প্রতি আত্মার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত পাপপুণ্য।

এই জগতের কিংবা নিজের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভীতির অভাব হৃদয়ের সমুদয় পাপের মূল। আর আচরণের যাবতীয় পাপের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হলো হৃদয়ের পাপ। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা ভীতি, জগৎ ও নিজের প্রতি ভালোবাসার অনুপস্থিতি যাবতীয় পুণ্যের উৎস। আল-গাজালির সমগ্র নৈতিক দর্শনের চালিকাশক্তি হলো আল্লাহ। এই চালকশক্তি শুধু ব্যক্তির চিরন্তন মুক্তিই নিশ্চিত করে না, বরং সর্বোত্তম সামাজিক ও নৈতিক পুণ্যের ফসল উৎপন্ন করে।[৩৯৪] আল-গাজালির মতে, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি জ্ঞানী, সাহসী ও সংযত সর্বোচ্চ মাত্রায় ও মহত্তম অর্থে। এই ধরনের ব্যক্তি শুধু আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করেই ক্ষান্ত হয় হন না, তিনি পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সর্ববিধ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। অন্য কথায় তিনি প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বের প্রতি তার কর্তব্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেন এবং বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তার হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আল গাজালির সর্বোত্তম নৈতিক ব্যক্তিত্ব ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিবেচনায় সর্বোত্তম ব্যক্তি।

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত

৩৯৪. Umaruddin, *The Ethical Philosophy of Al-Ghazali.* p.153

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। পাপ-পুণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আল গাযালির রচনায় স্থান পেয়েছে।কারণ তার মতে পরিপূর্ণ অর্থ খাটি মানুষ হওয়ার জন্য এই দ্বৈত ধারণার সম্যক জ্ঞান ও সেই ধারণা থেকে উৎসারিত নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালিত করে মানবজীবন সর্বোচ্চ সলফতায় পৌঁছা মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ- "এহইয়াউ উলুম-উদ্‌দীন" -এ তিনি পাপপুণ্যের যে শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সদগুণের অনুশীলন এবং অসদগুণের পরিহার মানুষের সুষম বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আলগাজালির বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত তার বিশাল কলেবর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ইহইয়া-উনউলুমুদ্দিন-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে কম পড়ে বিশদ জানতে ইচ্ছা করলে সাধারণের জন্য লিখিত আল-গাজালির মিনহাযুল আবেদীন গ্রন্থখানি পাঠ করলে চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

বিশ্বের অন্যতম মৌলিক চিন্তাবিদ আল-গাজালি মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তিনি শুধু সমকালীন চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে মুসলিমজাতিকে শ্রেষ্ঠ পথের নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি মানুষের চিন্তা-জগতে কতগুলো নতুন ধারণা এনেছেন। তিনি যুগাতিক্রমী চিন্তানায়ক; তাঁর ছয়শত বছর পরে মানুষের চিন্তার ইতিহাসে যেসব ধারণা ও চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে আল-গাজালি মানব দর্শনে তাঁর অনেকগুলোর পরিবর্তন আনয়ন করেছেন। ডেকার্তের সংশয় পদ্ধতি (Method of Doubt) হিউমের কার্যকারণতত্ত্ব, কান্টের দেশ-কালের অস্তিত্ব এবং ব্রাডলির বিরোধ নিয়মের ব্যবহার আল-গাজালির দর্শনে এক অতুলনীয় মহিমায় ভাস্বর। এসব দার্শনিক সমস্যার ক্ষেত্রে আল-গাজালির পূর্বসূরিত্ব তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব প্রমাণ করে।

ইমাম গাজালি ধর্মবিষয়ক নিষ্প্রাণ যুক্তিসর্বস্বতা থেকে কোরআন-হাদিসের প্রাণবন্ত কার্যকরী ও বাস্তবভিত্তিক অনুশীলনের দিকে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনেন। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার অপসারণের দিনে ইউরোপে যা ঘটেছিল আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামে তাই ঘটেছিল। তিনি ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন সত্য কিন্তু কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে ধর্মতত্ত্বের বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য। আল-গাজালি তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলিতে ভীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর 'আল-মুনকিজ মিনাদ দালাল' গ্রন্থে এবং অন্যত্রও মানুষের মনে আল্লাহর ভীতি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেছেন যে, তার যুগ আশাবাদ প্রচার কিংবা কোমল বিষয় প্রচার উপযোগী ছিল না। তিনি নিজেও দোজখের বিভীষিকা অনুভব করতেন এবং অন্যকেও সে বিভীষিকার চৌহদ্দি থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দান করতেন। খোদার ভীতি মানুষকে সংহত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। আল-গাজালির প্রভাবেই সূফীবাদ ইসলামে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আসন লাভ করে। তাঁর আবির্ভাবের আগে সূফীবাদ অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখতো। তিনি সূফীবাদের ইসলামের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করেন। তিনি দেখালেন যে, সূফীবাদ বা তাসাউফ ইসলামের বাতেনি (গূঢ়) দিক। ইমাম-গাজালি দর্শনশাস্ত্রকে সাধারণের নাগালের ভেতর আনয়ন করেন। তিনি সে রহস্যজাল ছিন্ন করে সাধারণ্যে দর্শনের স্বরূপ উদঘাটিত করেন এবং ভাষার মারপ্যাচ থেকে দর্শনকে দূরে এনে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তা ব্যক্ত করেন। সাধারণ লোকদের সম্মুখে দার্শনিকদের মতবাদ যুক্তিপদ্ধতি অনুপপত্তিকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করার জন্য তিনি তাঁর 'তহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থ রচনা করেন।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই আল-গাজালির গ্রন্থাবলির লাতিন ও হিব্রু তর্জমা আরম্ভ হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সব খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতদের প্রিয় ছিল। আল-গাজালির 'মাকাসিদুল ফালাসিফা' গ্রন্থখানি অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এই গ্রন্থখানির বিভিন্ন অনুবাদ ও ভাষ্য একথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। অধিকন্তু গ্রন্থখানি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল। আনুমানিক ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে আইজাক আল-বালাগ (Isaac Al-balag) এই গ্রন্থের প্রথম হিব্রু অনুবাদ বের করেন; আল-গাজালিকে খ্রিস্টান ইউরোপে পরিচিত ও সমাদৃত করার ক্ষেত্রে ডি রেমন্ড মার্টিনের (D.Ramand Martin) জুড়ি নেই। তাঁর আরবি ও হিব্রুতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আসিন পালাকিওস (Asin Palacios) এর মতে, রেমণ্ড মার্টিন আল-গাজালির মিজানুল আলম, ইহইয়া, তহাফাত, মাকাসিদুল ফালাসিফা, মাকাসাদ আল-আসমা, মশিকাতুল তহাফাত -এর যুক্তি পদ্ধতি এবং ইহইয়া, মীজান আল-আমল ও তহাফ থেকে বহু উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শূন্যতা থেকে সৃষ্টি, বিশেষ সম্পর্কে খোদার জ্ঞান,আত্মার অমরতা ও তার পরম সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ে আল-গাজালির সঙ্গে রেমন্ড মার্টিনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এহইয়াই উলুম আদ্দীন' তাঁকে অমর করে রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেন্ট টমাস একুইনাস, আল-গাজালি ও অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদের ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর Summa contra Gentiles আল-গাজালির তাহফাতুল ফালাসিফাকে স্মরণ করে দেয়। আর তার (SummaTheologica)) ও ইহইয়ার সঙ্গে আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে গভীরভাবে অন্তরঙ্গ। পরবর্তী কালের ফরাসি দার্শনিক, গাণিতিক ও বিজ্ঞানী ব্লেজ প্যাস্কালের (BlaisePascal ১৬২৩-১৬৬২) লেখায়ও আল-গাজালির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্যাস্কালের "pensees sura la religion" আল-গাজালির আল-মুনকিজ-এ প্রদত্ত জ্ঞান তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

এবার আমরা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে আল-গাজালির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ডেকার্তের পদ্ধতির (Method) সঙ্গে আল গাজালির পদ্ধতির গভীর সাদৃশ্য বর্তমান। আল-গাজালির আল-মানকিজ' এবং ডেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) ডিসকোর্স ডিলা মেথডে যে সংশয় পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তা প্রায় একরূপ। ডেকার্ত তাঁর পদ্ধতির পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর অনুসৃত পরিকল্পনা আরও অনেক সূক্ষ্ম মগজে স্থান পেয়েছিল। অবশ্য আল-গাজালি ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তাবিদের লেখায় অনুরূপ পদ্ধতি স্থান পায়নি। আল-মানকিজএ অবলম্বিত পদ্ধতির সঙ্গে ডেকার্তের পদ্ধতির গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করে জি. এইচ. লিউস (G.H.Lewes) বলেন যে, ডেকার্তের সময় উক্ত গ্রন্থের অনূদিত কোনো কপি পাওয়া গেলে সবাই-ই ডেকার্তের পদ্ধতিকে অপহরণ (Plagiarism) বলে চিৎকার করতেন। উভয়ই জ্ঞানের সুনিশ্চিত নির্ভরতা লাভ করার জন্য ইন্দ্রিয় সংবেদনকে জ্ঞানের নিশ্চিত উৎস হিসেবে বর্জন করেছিলেন, নিশ্চিত জ্ঞান লাভের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। এক কথায়, উভয়েই গতানুগতিক পথ বর্জন করে জ্ঞান লাভের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের অন্যতম যুগান্তকারী চিন্তাবিদ কান্টের দর্শন সাধনা ও অনেকাংশে আল-গাজালির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। হিউমের সংশয়বাদ কান্টকে নির্বিচারবাদের মোহপাশ থেকে মুক্তিদান করেছিল। কিন্তু আল-গাজালির নিজস্ব সংশয়বাদের দ্বারা প্রপীড়িত হয়েছিলেন। আল-গাজালির তাহফাতুল ফালাসিফা এবং কান্টের ক্রিটিক আর পিউর রিজন মেজাজের দিক দিয়ে তুলনীয়। কান্ট তার এই গ্রন্থে মানুষের প্রজ্ঞার সীমা নির্দেশ করে দর্শনের অসম্ভাব্যতার বিষয় ঘোষণা করেছিলেন। আল-গাজালিও ঐশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার অক্ষমতার বিষয় ঘোষণা করেছিলেন। আল-গাজালি সূফী তন্ময়তার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান লাভ করেছিলেন। আর কান্ট কার্যকারী প্রজ্ঞার practical reason এর মধ্যে পেয়েছিলেন জ্ঞানের নিশ্চয়তা। উভয়ের চিন্তা গভীরে উপলব্দির অন্তস্থলে লুক্কায়িত ছিল ধর্মের গভীর তাৎপর্য।

আধুনিক বিশ্বে অভিজ্ঞতাবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আল-গাজালির দর্শন মতবাদ পীড়িত বিশ্বকে এক নতুন আশার বাণী শোনাতেই পারে, এক নতুন সমন্বয়কারী দর্শনের ইঙ্গিত দান করতেই পারে। কাজেই আজকের দিনে বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম জাহানে আল-গাজালির গ্রন্থাবলির সম্যক আলোচনা একান্ত আবশ্যক এবং তাঁর প্রবর্তিত তাসাউফ বা আধ্যাত মতবাদ একান্ত প্রয়োজন। যাঁরা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান, ইমাম গাজালি তাঁদের জন্য আদর্শ।

----------0----------

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুর'আন

২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল: *বুখারি শরীফ* (সম্পাদনা: ড. মুস্তাফা আদীব আল-বাগা, বৈরুত: দারু ইবনি কাসীর আল-ইয়ামামাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ ইং)

৩. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি: *মুসলিম শরীফ* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, স.বি. তা.বি.)

৪. আবু ইসা মুহাম্মদ: *জামিঈ তিরমিযি* (মিশর: শারিকাতু মুস্তাফা আল-বাবী, ১ম সংস্করণ ১৯৬২)

৫. আবু দাউদ সুলাইমান: *সুনানি আবু দাউদ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.)

৬. আহম্মদ ইবনে শুয়াইব: *সুনানি নাসায়ি* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯১ খ্রি.)

৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ: *সুনানি ইবনে মাজাহ* (ইস্তাম্বুল: মাকতাবাহ ইসলামিয়্যাহ, স.বি. তা.বি.)

৮. আব্দুল কাদের জিলানী: *সিররুল আসরার* (ঢাকা:সনজরী পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ-২০১২ ইং)

৯. আব্দুল কাদের জিলানী:*আল- গুনিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি)

১০. আবু ইয়ালা: *আল-মুসনাদ* (দামেশক:দারুল মামুন লিত তুরাছ, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৪ ইং)

১১. ড. রশীদুল আলম: মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, অষ্টাদশ সংস্করণ-২০১৬ ইং)

১২. নূরনবী: *ইমাম গাযালীর জীবন-চিত্র ও দর্শন (*ঢাকা:বাংলাবাজার প্রকাশনী,ঢাকা। তা.বি.)

১৩. মুফতি মাহমূদ আশরাফ উসমানী: *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*(ঢাকা:মাকতাবাতুল আশরাফ, শাবান-১৪২১হি.

১৪. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা,নবম-দশম শ্রেণি,এন সি টি বি ঢাকা-২০২০ইং

১৫. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ):*তাসাওউফ্ তত্ত্ব* (ঢাকা: আল-আশরাফ প্রকাশনী,এপ্রিল-২০০৩ইং

১৬. মাওলানা মো.মোহিবুল্লাহ আজাদ:*ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ*(ঢাকা:আল-ফাতাহ পাবলিকেশন্স,-২০১৭ইং

১৭. আল্লামা শিবলী নোমানী:*ইমাম গাজালির জীবন ও দর্শন*(ঢাকা:কোহীনূর লাইব্রেরী,ষষ্ঠপ্রকাশ,২০১২ইং)

১৮. মরহুম হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল:*ইমাম গায্যালী(রহ)জীবনচরিত* (ঢাকা: সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স-২০০৬ইং)

১৯. চৌধুরী শামসুর রহমান: *সুফিদর্শন* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ,ফেব্রুয়ারি-২০০২ইং)

২০. মুহিউদ্দীন খান:*মাকতুবাত ইমাম গাজালি* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স,৩০সে.২০১৪ইং)

২১. হাসান মাহরাম: *আত তাসাওফুল ইসলামী আত তরীক ওয়াররিজাল* (জামেয়তুল আযহার আলকায়রো তা.বি.)

২২. আমজাদ হুসাইন: *মিনহাজুল উসূল* (অনুদিত) (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী)।

২৩. আবু সাদ আব্দুল মালিক : *তাহযীবুল আসরার,* (বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)।

২৪. আবু ইউসুফ শরীফ : আউলিয়াই কেরামের চরিত্র (ঢাকা: সনজরী পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১১ইং)

২৫. আবু জাফর মুহাম্মদ ত্বাবারী : *তাহযীবুল আছার* (বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)

২৬. মাহমুদ আল কারদি : *ইহয়াউল কুলব* (বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)

২৭. আব্দুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা: ই.ফা.বা. মার্চ, ১৯৮০ খ্রি.)।

২৮. আব্দুল বাকী মিফতাহ : *আদওয়াউন আলাত তরীকতির রহমানিয়া আল খাল- ওয়াতিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ২০০৯ইং)

Dhaka University Institutional Repository

২৯. আহমদ কবীর রেফায়ী: *আল বুরহানুল মুআইয়াদ (অনু.)* (ঢাকা: মাকতাবাহ আবরার, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৬ইং)।
৩০. আবু বকর আহমদ আল বারহাকী : *সুনান* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)।
৩১. আব্দুর রউফ আল মানভী : *আল জাওহারুতুল ফাখেরাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.)
৩২. যায়নুদ্দিন মুহাম্মদ আব্দুর রউফ আল মানাভী: *আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ,* বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা. বি.)
৩৩. আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী : *কানযুল উম্মাল* (দামেশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তা. বি.)
৩৪. ইমাম বায়হাকী : *শুআবুল ঈমান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)
৩৫. ইমাম বায়হাকী: *আস-সুনানুল কুবরা* (ভারত: মাজালিসু দা-ইরাতিল মা'আরিফ, প্রথম ১৩৪৪ হি.)।
৩৬. ইবনুল কায়্যিম : *আররুহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.)।
৩৭. ইবনু হাজার আসকালানী: *ফাতহুল বারী,* (মিশর: দারুল ফিকর, তা. বি.)।
৩৮. ইমাম বাগভী : *শরহুস সুন্নাহ* (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ)।
৩৯. ইবনূল আছির: *জামেউল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল,* (মাকতাবাতুল হালওয়ানী, তা. বি.)
৪০. ইবনুল মনজুর : *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারুস সাদের, তা. বি.)
৪১. ইমাম মহিউদ্দিন আন্নববী : *আল আরবাউন* (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ)
৪২. ইমাম হুমায়দী : *আল জামউল বাইনাস সহীহাইন* (বৈরূত: দারু ইবনু হাজাম, তা. বি.)
৪৩. ইবনু তাইমিয়া: *মুখতাছার মিনহাজিস সুন্নাহ* (সংক্ষিপ্তকারী আব্দুলাহ আল গুনাইমান, আলমাকতাবাতুশ শামেলাহ)
৪৪. ইবনু তাইমিয়া: *দাক্বাইকুত তাফসীর,* (দামেশক: মু'আসসাসাতু উলুমিল কুরআন, ১৪০০ হি.)
৪৫. ইদরীস কান্দলভী: *সীরাতে মুস্তফা* ,(স.) অনু (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, তা. বি.)।
৪৬. ওয়ালী উদ্দীন আল খতীব আত তিবরিযি : *মিশকাতুল মাসাবীহ* ,(ভারত, দেওবন্দ: আশ্রাফিয়া বুক ডিপো, তা.বি.)
৪৭. আব্দুল কাবীর কাত্তানী : *কিতাবু যুব্বি আনিত তাসাউফ* ,(বৈরূত: দারু কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)
৪৮. জালাল উদ্দীন সুয়ুতী : *জামেউল আহাদীস* ,(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ)
৪৯. যিয়া উদ্দীন আহমদ : *জামেউল উসূল ফিল আওলিয়া* , (বৈরূত: দারুল ফিকর ওয়াল ইলমিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭ইং
৫০. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : *তাদরীবুর রাবী,* (রিয়াদ: আল মাকতাবাতুর রিয়াদিল হাদীছিয়্যা, তা. বি.)
৫১. ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফি : বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম প্রকাশ ২০১৩ ইং)।
৫২. ইমাম তাবরানী : *আল মুজামুস সগীর* (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল ইসলামী, তা. বি.)
৫৩. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী : *তাসাওফ তত্ত্ব* (ঢাকা: বিশ্ব কল্যাণ পাবলিকেশন, তা, বি.)
৫৪. ফকরুদ্দীন রাযী : *তাফসিরে কাবীর* (মাওকিউত তাফাসির, তা. বি.)
৫৫. মুহাম্মদ হামেদ ইব্রাহিম সালিম : *আল কওলুল ফাছল ফি কাযিয়াতিল হাম্মি,* (আল মাকতাবাতুশ শামেলা)
৫৬. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল : *আল আদাবুল মুফরাদ* (বৈরূত: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯ইং)।
৫৭. মুহাম্মদ আল কাসান্যান : *মাওসূআতুল কাসান্যান* (বৈরূত: দারু আয়াত, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ইং)
৫৮. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মদ : *তাজুল আরুস,* (দারুল হিদায়াত, তা. বি.)
৫৯. মাওলানা আযীযুর রহমান : *ইসলাম ও তাসাউফ* (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ, দারুত তাসনীফ, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১২ইং)।

Dhaka University Institutional Repository

৬০. মালেক ইবনু আনাস: *মুআত্তা,* (দামেশক: দারুল কলম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ইং)

৬১. মোল্লা আলী কারী : *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাসাবীহ* ,(মাওকিউল মিশকাতুল মাসাবীহ, তা.বি.)

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর খান: *শয়তানের মোকাবেলা এবং আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়,* (ঢাকা: সিরাজাম মুনীরা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১২ইং)

৬৩. মাওলানা নূরুর রাহমান: *তাযকেরাতুল আওলিয়া,* (ঢাকা: এমদাদীয়া পুস্তাকালয়, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭ইং)

৬৪. মুফতি মাহমুদ আশ্রাফ উসমানী ও মাওলানা আব্দুল মালেক : তাসাওফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশ্রাফ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.)।

৬৫. শিহাবউদ্দিন মাহমুদ আলুসি : *রুহুল মাআনী* (বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা. বি.)

৬৬. শায়খ মুহাম্মদ হাসান : তাযকিয়াতুন নাফস (www. tajkia.com)

৬৭. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জেবখশ হাজবেরী : *কাশফুল মাহযুব (অনু),* (ঢাকা: রশিদ বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ, ২০১২ইং)

৬৮. লাভলী আখতার ডলী : *বাংলাদেশে সূফীদর্শনের রূপরেখা,* (ঢাকা: সাফা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ইং)।

৬৯. মুহাম্মদ এনামুল হক :বঙ্গে সূফী প্রভাব (অনু) (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, চতুর্থ সং. ২০১৫ইং)

৭০. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক : বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.) (ঢাকা: খানকাহ-ই-খাস মুজাদ্দিদীয়া, দ্বিতীয় সং. ২০১১ইং)

৭১. গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশে সূফী-সাধক (ঢাকা: ই.ফা.বা. সপ্তম সং. ২০১১ইং)

৭২. নুরুদ্দীন আহমদ : *ছীরাতে নেছারিয়া,* (পিরোজপুর: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী)

৭৩. সৈয়দ ইউসুফ হাশেম আর রেফায়ী: *কুরআন-হাদীসের আলোকে সূফীতত্ত্ব ও সূফী বাদ,* (ঢাকা: সনজরী পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১১ইং)

৭৪. পাক্ষিক তাবলীগ (স্মৃতিসংখ্যা ১৯৮০ইং, ৩১ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা)

৭৫. মাওলানা নুরুদ্দীন আহম্মাদ ঃ *সৃষ্টি দর্শন* (আল হিমাতু ফী মাখলুকাতিল্লাহ-এর বাংলা অনুবাদ), ঢাকা ও হাবিবিয়া বুক ডিপো, ৪র্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ইং।

৭৬. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), প্রথম প্রকাশ, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ইং।

৭৭. *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* সম্পাদিত (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২য় সংস্করণ, ২০০১ইং)।

৭৮. মফিজুল্লাহ্ কবীর: *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮৭ইং।

৭৯. মহিউদ্দীন খান: *কোরআনের সার-সংক্ষেপ।* (ঢাকা:মদিনা পাবলিকেশান্স,তা.বি.)

৮০. আবু জাফর: *রাষ্ট্রদর্শনে মুসলিম মনীষা,(* ঢাকা, ১৯৭০ইং)।

৮১. আবুল ফজল: *কোরানের বাণী:* তা.বি.

৮২. ফরীদউদ্দীন আত্তার, *তাজকেরাতুল আউলিয়া,* দ্বিতীয় খণ্ড-অনুবাদ: নূর মোহাম্মদ, (ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি), প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৫ বাংলা।

৮৩. আ. ন. ম.বজলুর রশীদ: *আমাদের সুফী-সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন), প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৭৭ইং।

৮৪. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ: *পারস্য প্রতিভা* ,তা.বি.

৮৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী: *মুসলিম দর্শন পরিচিতি* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০২ইং), প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ইং।

৮৬. আব্দুল হালিম: *মুসলিম দর্শন:*চেতনা ও প্রবাহ, ঢাকা ১৯৯৮ইং।

৮৭. এম. এ.হাশেম: *মুসলিম দর্শনের মূলকথা,* (চুয়াডাঙ্গা: টিপটপ স্টেশনার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স), দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৭৫ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. এম. হুদা: *মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব* (ঢাকা: ইউরেকা বুক হাউস, পুনর্মুদ্রণ) মে, ১৯৯১ইং।

৮৯. হারেস মুহাছেবী:*রিসালাতুল মুসতারশিদীন* (বৈরুত,লেবানন: দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়া, অষ্টম ১৪১৬হিঃ), ১৯৯৫ইং

৯০. আবু হামেদ গাজালি *: ইহয়াউ উলুমিদ্দীন,* (মিশর:মাকতাবাতুল ঈমান,মনসূরা, প্রথম সংস্করণ-১৪১৭হিঃ), ১৯৯৬ ইং

৯১. সোহরাওয়ারদী:*আওয়ারিফুল মাআরিফ,* ইহয়াউ উলুমিদ্দীন-এর সাথে সংযোজিত,(বৈরুত:দারু ইহয়াইত তুরাস.তা.বি.

৯২. মুরতাযা যাবীদী: *ইতহাস সাদাতিল মুত্তাকীন* : দারুল ফিকর (কায়রো:,১৩১১হিঃ সংস্করণের ফটোকপি)।

৯৩. মুজাদ্দেদে আলফে সানী:ইরশাদাত (ইদারায়ে ইসলামিয়াত, ১৪১৭হিঃ,১৯৯৬ইং)

৯৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী *: আল্ কাওলুল জামীল* (মঞ্জুর বুকডিপু, দিল্লী: ভারত,তা.বি.)

৯৫. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী: *কুল্লিয়্যাতে ইমদাদিয়া* ঃ (দেওবন্দ ভারত :মাকতাবায়ে থানভী, তা.বি.)

৯৬. ইমামুল আরেফীন আহমাদ ইবনে সিদ্দীক আল্ গুমারী: *আলী ইবনু আবী তালেব* , (১৩৮০হিঃ)

৯৭. আব্দুল হাই আরেফী: *বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত* ঃ সাঈদ কোম্পানী, ১৪০৯হিঃ,১৯৮৯ইং

৯৮. আশরাফ আলী থানভী: *আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ* (ইদারায়ে তালিকাতে আশরাফিয়া, তা.বি.)

৯৯. আশরাফ আলী থানভী:*শরীয়ত ও তরীকত* , (দেওবন্দ: ভারত, মাসউদ পাবলিশিং হাউস, তা.বি.)

১০০. আবুল ফযল:*হাক্কুল ইয়াকীন*,(চন্দ্র পাড়া:,২য় সংস্করণ-১৯৭৮ইং)

১০১. ড. শেখ মোঃ ইউসুফ: সুন্নত ও প্রচলিত বিদ'আত (ঢাকা: মাকতাবাতুল আখতার, ১ম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৪ ঈ.)

১০২. ড.আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি:*ইমাম গাজালি(রহ.)জীবন ও কর্ম*(অনূদিত) (সিলেট: কালান্তরপ্রকাশনী. সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং)

১০৩. এম.এ খালেক:*মুসলিম দর্শনের সমস্যাবলী*,(ঢাকা:আজিজিয়া বুক ডিপো,প্রথম সংস্করণ,মে-১৯৯৪ইং

104. Muainuddin Ahmed Khan: *Mazar of Dudu Miyan,* (Journal of the Asiatic society of Dacc, 1962)

105. James Taylor: *(A sketch of the Topogrphy and Statistics of Dhaka Calcatta, 1840)*

106. Journal of the Asiatic society of Bengal, Vo, LXIII.

107. M. M. Sharif: *A History of Muslim Philoso*phy, Philosophical Congrss OHo Harrassowrtz Wiesbaden, 1966.

108. R. W.Montogomery Watt: *Muslim Intellectual,* A study of Al-Ghazali, Edinburgh at the Universsity Press, 1963.

109. D. M Donaldson: *Studies in Muslim Ethics* S.P.C.K. London, 1963.

110. R A. Nicholson: *Studies in Islmic Mysticism,* Cambridge at theUniversity Press. 1921.

111. Sir Thomas Arnold: *The Legacy of Islam*, Oxford University Press.1931.

112. Prof M. Umaruddin: *The Ethical Philosophy of Al-Ghazali,* Aligar.1962.

113. M. Mizanur Rahman: *The Philosophy of Al-Ghazali,*International Islamic Philosophical Association, 1977.

114. D. B. Macdonald: *Development of Muslin Theology, Jursprudenceand Constitutional Theory,* London, 1962.

Dhaka University Institutional Repository

115. S.T. J. De Boer: *History of Philosophy in Islam*, London Luzac and Co. Ltd. 1961.
116. O'Leary, *Arabic Thought and Its Place in History*, London 1954.
117. Sayed Abdul Hai: *Muslim Philosophy*, Islamic Foundation, Dhaka,1985.
118. Shfih Ahmed Kamail: *Al-Ghazali's "Tahfatal-Falasifah*,philosophical congress, 1963.
119. M. Saeed Sheikh: *Studies in Muslim Philosophy*, Philosophical Congress, 1992.
120. S. M. Iqbal: *The Reconstruction of ReligiousThought in Islam*,
121. S. M. Iqbal: *The Development of Metaphysics in Persia*,
122. R. A. Nicholson: *A Literary History of the Arabs*, London, 1907.
123. M. M. Sharif: *Muslim Thought; It's Origian and Achievement*, Shah Muhammad Ashraf 1951.
124. C, Hartshorne and W. L. Resse, *Philosophers Speak of God*,Chicag, 1953.
125. Syed Abdul Hai: *Muslim Philosophy: A Short Survey* (Dhaka : Islamic Foundation, 1985).
126. Abdullah Yusu Ali : *The Meaning of the illustrious Quran.*
127. Arberry, A. j. :*An Introduction to the History of Suffism* (London : Logmans Green & Co. 1942).
128. Browne, E. G. : *A literary History of Persia* (Cambridge University Press).
129. De Boer. T.j : *The History of Philosophy in Islam.* (Trans.) jones, E. R. (London : 1961)
130. M. A.: Hashem:*Essentials of Muslim Philosophy.*
131. Mohammad Iqbal:*The Development of Metaphysics in Persia* (London : 1970).
132. Kh. Kamaluddin : *Sayings of the Holy Prophet (sm.)*
133. S. Khuda Baksh: *Islamic Civilization.*
134. F. A. Kuraishy: *Islam The Religion of Humanity.*
135. R. A. Nicholson:*The Mystics of Islam. (London : 1963).*
136. O'Leary, De Lacy : *Arabic Thought and Its Place in History* (London : 1945)
137. S. Rahman : *An Introduction of Islamic Culture and Philosophy.* (Dhaka : 1970, Revised Edition).
138. Saeed Sheik:*Studies in Muslim Philosophy.*
139. M. Watt: *The Faith and Practices of Al-Ghazali* (London : 1953).
140. P.K Hitti:*History of the Arabs*,London,1949.

----------0----------